CENTRAL LIBRARY

হরপ্রসাদ স্মরণে

সম্পাদক
বেলা ভট্টাচার্য
বিভাগীয় প্রধান, পালি বিভাগ

পালি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০৭

BCU 4112
GS5744

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ গৌতম চৌধুরী

মূল্য — ১০০ টাকা

© কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

PUBLISHED BY THE REGISTRAR, UNIVERSITY OF CALCUTTA,
87/1, COLLEGE STREET, KOLKATA - 700 073
AND
PRINTED BY SRI PRADIP KUMAR GHOSH,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, KOLKATA —700 019.

CENTRAL LIBRARY

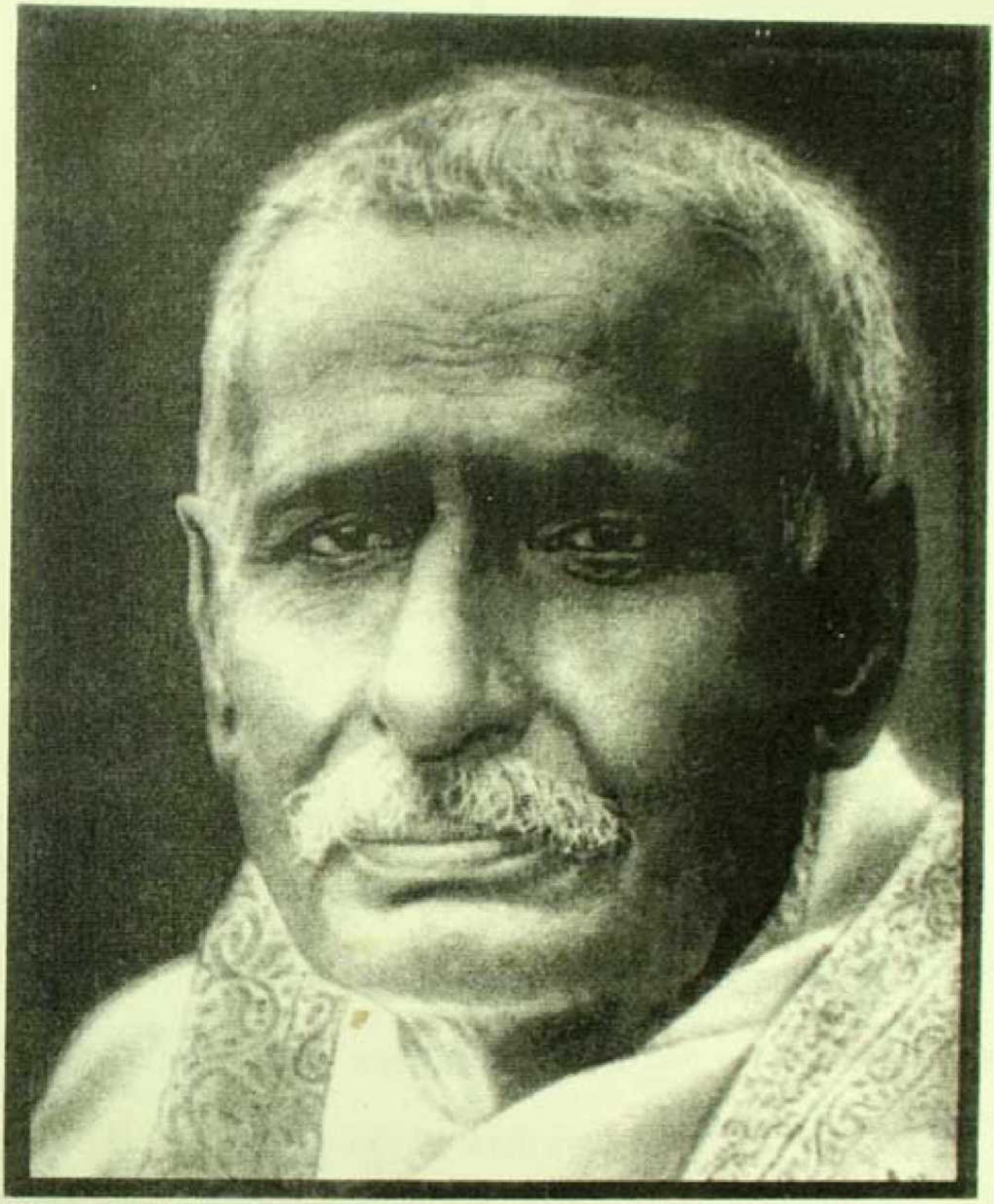

জন্ম
৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩

প্রয়াণ
১৭ নভেম্বর ১৯৩১

CENTRAL LIBRARY

রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

রাজভবন
কলকাতা - ৭০০ ০৬২

২৮ নভেম্বর, ২০০৬

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিষয়ক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনার উদ্যোগের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগকে আমি সাধুবাদ জানাই ।

আমি আশা করি বিভিন্ন গুণীজনের নিবন্ধ সম্বলিত এই স্মারক গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অবদানের বিষয়ে পূর্ণ আলোকপাত করবে এবং বাংলা প্রাচ্য-বিদ্যা ও ভাষাচর্চাকে ঋদ্ধ করবে ।

আমি এই মহতী প্রয়াসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি ।

গোপালকৃষ্ণ গান্ধী

CENTRAL LIBRARY

SUDARSAN RAYCHAUDHURI
MINISTER-IN-CHARGE
HIGHER EDUCATION
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
BIKASH BHAWAN, BIDHANNAGAR
KOLKATA-700 091
Office - 033 2334 6181
Residence - 033 2674 0744

সত্যমেব জয়তে

সুদর্শন রায়চৌধুরী
মন্ত্রী
উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, বিধাননগর
কলকাতা-৭০০ ০৯১

নং- এইচ.ই. এম.এস./ ১২১৮/২০০৬

Dated, Kolkata, the 200

তারিখ ২. ১১. ২০০৬.

শুভেচ্ছা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে শিল্প, সাহিত্য এবং সংগীতের জগতে যে রেনেশাঁসের সূচনা হয়েছিল পরবর্তিকালে নানা সত্যসন্ধানী মনীষীর জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রতিভার আলোকে তা হয়ে উঠেছিল আরো সমৃদ্ধ এবং প্রসারিত। বাংলা ভাষা , সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং সামগ্রিকভাবে বাংলা জনজীবনে আজ আমরা যে উজ্জ্বলতা ও সমৃদ্ধির প্রকাশ দেখছি, প্রাচ্য তত্ত্ববিদ সত্যসন্ধানী মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই নবজাগরণের সার্থক ধারক এবং বাহক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিষয়ক একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে এই মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

(সুদর্শন রায়চৌধুরী)

অধ্যাপিকা বেলা ভট্টাচার্য
পালি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Professor Asis Kumar Banerjee
VICE-CHANCELLOR
University of Calcutta

87/1, College Street
Senate House
Kolkata-700 073
Telephone Nos. 2241-3288/0071/4984
Fax No. 91-33-2241-3288
E-mail : vc@caluniv.ac.in

November 8, 2006

Message

The teachers and students of the Department of Pali, University of Calcutta observed the Buddha Jayanti Celebration in 2003 and organised a National Seminar in which many learned scholars of our country participated and discussed the contributions of Mm. Haraprasad Shastri, a great Indologist, linguist and researcher of Buddhist studies. The Department has now decided to publish these contributions in the form of a Commemoration Volume, 'Haraprasad Smarane'. I offer my congratulations to the Department of Pali, University of Calcutta for taking this initiative. I am sure this set of essays will be a lasting contribution to the memory of Mm. Haraprasad Shastri.

A. K. Banerjee

(Asis Kumar Banerjee)

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকের নিবেদন

২৬ মে, ২০০৩ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা পালি বিভাগের সদস্যাগণ বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব পালন করি। এই উপলক্ষ্যে একটি সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মাননীয় উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, অধ্যাপক আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সভার উদ্বোধন করেন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপিকা বেলা ভট্টাচার্য স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। স্বামী ত্যাগরূপানন্দ মহাশয়, সহ-অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক উজ্জ্বল বসু, রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক স্বপন কুমার প্রামাণিক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্ট, কুটা (CUTA), বর্তমানে উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর; শ্রী জয়দীপ শীল, Development and Planning Officer, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ ধূর্জটি প্রসাদ দে, সেক্রেটারী, UCAC, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রমুখ উপস্থিত থেকে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানগম্ভীর ভাষণের দ্বারা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করেন। তারপর বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেড়শতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে "মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম" বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। তাতে অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্ট, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম; অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা; অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, প্রাক্তন বি. এম. বড়ুয়া গবেষণা অধ্যাপক, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা; অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা; প্রাক্তন অধ্যাপক দেবপ্রসাদ গুহ, রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়, মিয়ানমার প্রমুখ অংশগ্রহণ করে সেমিনারটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। অধ্যাপক রাখহরি চ্যাটার্জী মহাশয়, ডীন, কলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠানটির শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। পালি বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ, পালি বিভাগে গবেষণারত বিদেশী ছাত্রগণ ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীগণ উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। সেমিনারে পরিশেষে আনন্দ উৎসব হয় এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্য 'বাসবদত্তা' মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা করেন বিভাগীয় শিক্ষিকা ডঃ জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়। সভায় 'মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর' দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রস্তাব হয়। তদনুসারে আমি বিভিন্ন গণ্যমান্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে 'হরপ্রসাদ স্মরণে' স্মারকগ্রন্থটির জন্য তাঁদের রচনা পাঠানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাই এবং তাঁদের নিকট হতে আমি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। তারই ফলশ্রুতি আজকের এই স্মারকগ্রন্থের প্রকাশনা।

খুবই দুঃখের বিষয় অধ্যাপক দীপক ঘোষ, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। ডঃ নরেন্দ্রকুমার দাশ, Department of Indo-Tibetan Studies, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, তিনিও প্রয়াত। তাঁদের অকাল বিয়োগে আমরা মর্মাহত।

যে সকল লেখক-লেখিকাদের নিকট হতে তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণামূলক রচনা সংগ্রহ করতে পেরেছি তাঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

'হরপ্রসাদ স্মরণে' গ্রন্থটি প্রকাশে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে উপাচার্য অধ্যাপক আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় অগ্রগণ্য। অধ্যাপক সুরঞ্জন দাশ, সহ-উপাচার্য, শিক্ষা; অধ্যাপক তপন কুমার মুখোপাধ্যায়, সহ-উপাচার্য, অর্থ এবং শ্রী জয়দীপ শীল, Development and Planning Officer, এই স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশনার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশে অর্থ প্রদান করার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ডঃ চিত্তরঞ্জন পাত্র, Assistant Librarian and Information Officer, Indian Museum, Kolkata এবং শ্রী জগদীশ বসাক এই স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য সাহায্য করেছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। শাস্ত্রীমশায়ের এবং তাঁর বসতবাড়ির ফোটো দিয়ে সাহায্য করেছেন নৈহাটির বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র। শাস্ত্রীমশায়ের বাড়ির রেখাচিত্রটি মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন শিল্পী শ্রী রথীন মিত্র এবং দি টেলিগ্রাফ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। সর্বশেষে সাহায্য যার কাছ হতে আমি লাভ করেছি তিনি হলেন শ্রী প্রদীপ ঘোষ, প্রেস সুপারিনটেনডেন্ট্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রেসের অন্যান্য সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

২০০৫ সাল
আশুতোষ বিল্ডিং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা

বেলা ভট্টাচার্য
বিভাগীয় প্রধান
পালি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

কুলজি ১

জীবনপঞ্জি ২

নির্বাচিত রচনাপঞ্জি ৭

ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩

আচার্যমনীষি-হরপ্রসাদশাস্ত্রী স্মরণে
দীপক ঘোষ ২০

MAHĀMAHOPĀDHYĀY HARAPRASĀD SHĀSTRĪ
(06.12.1853 - 07.11.1931)
Sukomal Chaudhuri ২২

বুদ্ধচর্চায় যুগস্রষ্টা হরপ্রসাদ
বেলা ভট্টাচার্য ২৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জ্ঞানের পথে এক মহান অভিযাত্রী
আশা দাশ ৩৯

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম
বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী ৪৯

বাংলা দেশে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ
সত্যজিৎ চৌধুরী ৫৭

থেরবাদী দৃষ্টিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধচর্চার পর্যালোচনা
জিনবোধি ভিক্ষু ৭৩

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম
শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার ৮২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : আধুনিক মনন
সুমিতা চক্রবর্তী ৯৩

হরপ্রসাদনির্মিত বাঙালিজীবন
কবিতা চন্দ ১০২

বাল্মীকির জয়—সমকালীন ন্যারেটোলজির নিরিখে একটি আলোচনা
রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১১৫

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও পুরাতন বাংলা সাহিত্য
সত্যবতী গিরি ১২৬

CENTRAL LIBRARY

দুটি বই ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
নির্মল দাশ ১৩৮

শরৎনাথ ভট্টাচার্য ওরফে হরপ্রসাদ (শাস্ত্রী)
মনিরুজ্জামান ১৪৪

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃষ্টিতে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি
মণিকুন্তলা হালদার দে ১৪৭

हरप्रसादशास्त्री : कुमारसम्भवव्याख्यानम्
सीतानाथ आचार्य शास्त्री ১৭৫

BUDDHISM IN BENGAL SINCE THE MUHAMMADAN CONQUEST
Haraprasad Shastri ১৮৩

IN MEMORIAM
Biswanath Banerjee ১৮৯

ADVAYAVAJRA-SAMGRAHA—EDITED BY MM. HARAPRASAD BHATTACHARYA SHASTRI
Suniti Kumar Pathak ১৯৩

THE CARYĀPADAS : A SAGA OF DISCOVERIES FROM HARAPARASAD SASTRI TO SASIBHUSHAN DASGUPTA
Dipak Kumar Barua ১৯৮

A NOTE ON THE READING OF A CARYĀGĪTI
Satya Ranjan Banerjee ২০৪

BUDDHISM IN BENGAL–A BRIEF HISTORICAL SKETCH AFTER MM H.P. ŚĀSTRĪ
Devaprasad Guha ২০৬

HISTORY OF PRE-TURK BENGAL : HARAPRASD SHASTRI'S CONTRIBUTION
Bhabatosh Datta ২১০

HARAPRASAD SHASTRI : AN INDOLOGIST
Narendra Kumar Dash ২১৬

HARAPRASAD SASTRI AND SANSKRIT LITERATURE
Bijoya Goswami ২২০

MM HARAPRASĀDA ŚĀSTRĪ AND SANSKRITIC LEARNING
Karuna Sindhu Das ২২৬

CENTRAL LIBRARY

কুলজি

ক্ষিতীশ

ইনি কান্যকুব্জ থেকে বাংলাদেশে আসেন।

|

ভট্টনারায়ণ

এঁকে বংশের আদিপুরুষ মনে করা হয়।

সংস্কৃত নাটক বেণীসংহার সম্ভবত এঁর রচনা। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ

|

মহেশ্বর

|

ভট্টনারায়ণের পরের নবম পুরুষ। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন। এঁকে সভাতিলক বলা হত।

|

রাজেন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যালঙ্কার

মহেশ্বরের পরের দ্বাদশ পুরুষ। নলডাঙার রাজার সভাপতি ছিলেন।

|

রঘুনাথ চক্রবর্তী

|

রামনাথ

|

রামবল্লভ

|

মাণিক্য তর্কভূষণ

(১৭০৭-১৮০৬)

বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার কুমির গ্রাম থেকে মাণিক্য ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নৈহাটিতে এসে বসতি করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে ভূসম্পত্তি দিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

|

শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার (মৃত্যু ১৮০৮)

|

রামকমল ন্যায়রত্ন (১৮০১-১৮৬১)

|

নন্দকুমার | রঘুনাথ | যদুনাথ | হেমনাথ | শরৎনাথ (হরপ্রসাদ) | মেঘনাথ | দীনতারিণী

শরৎনাথ (হরপ্রসাদ)

|

মনোরমা | সুরবালা | সন্তোষ | আশুতোষ | পরিতোষ | বিনয়তোষ | সুষমা | কালীতোষ

CENTRAL LIBRARY

জীবনপঞ্জি

১৮৫৩ জন্ম ৬ ডিসেম্বর (২২ অগ্রহায়ণ, ১২৬০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার), বাবা-রামকমল লালরত্ন, মা চন্দ্রমণি। নাম রাখা হয় শরৎনাথ। কঠিন অসুখ করায় শিবের কাছে মানত করা হয়। 'হরে'র প্রসাদে ভালো হয়ে ওঠায় নতুন করে নাম রাখা হল হরপ্রসাদ।

১৮৬১ বাবার মৃত্যু। বড়ো দাদা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অ্যাংলো সংস্কৃত স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। দাদার কাছে গিয়ে হরপ্রসাদ কান্দি স্কুলে ভর্তি হন। এখানে এক বছর পড়েন, ইংরেজি শেখার সূচনা এই স্কুলে। নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য।

১৮৬২ বড়োদাদা নন্দকুমারের মৃত্যু হওয়ায় নৈহাটিতে ফিরে এসে কাঁটালপাড়ার টোলে কিছুদিন পড়েন।

১৮৬৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নন্দকুমারের এই ভাইটিকে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। থাকার ব্যবস্থা হয় বিদ্যাসাগরের বাড়ীর ছাত্রাবাসে। ছাত্রবাসটি উঠে যাওয়ায় বৌবাজার নেবুতলা নিবাসী গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় পান। বাড়ির ছেলেদের পড়াতেন, স্বপাকে খেতেন।

১৮৬৮ ডবল প্রমোশন পেয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলেন। আট টাকা করে বৃত্তি পেতেন।

১৮৭১ সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করলেন।

১৮৭৩ সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ১১শ স্থান পেয়ে ফাস্ট আর্টস পাশ করলেন।

১৮৭৬ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অষ্টম স্থান পেয়ে বি.এ. পাশ করলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের তখন সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সব বিষয় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে হত। বেশির ভাগ সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ায় তাঁকে এই কলেজের গ্রাজুয়েট ধরা হল। সংস্কৃতে প্রথম হওয়ায় প্রতি মাসে 'সংস্কৃত কলেজ গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ' এবং ২৫ টাকা 'লাহা স্কলারশিপ' পেলেন। আর পেলেন 'রাধাকান্ত দেব মেডেল'।

বি.এ. ক্লাসে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় 'ভারত-মহিলা' লিখে হোলকার পুরস্কার পেয়েছিলেন। রচনাটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তিনটি সংখ্যায় (মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র, ১২৮২) প্রকাশিত হয়। এই রচনা প্রকাশের সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহ-সান্নিধ্যে এলেন।

১৮৭৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এম.এ পরীক্ষায় ব্যবস্থা ছিলনা। অনার্স পরীক্ষায় পাশ করলে এম. এ. ডিগ্রি দিয়ে দেওয়া হত। হরপ্রসাদ ১৮৭৬-৭৭-এর সংস্কৃত অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়ে '৭৭-এ এম. এ. এবং শাস্ত্রী হন।

এই বৎসরে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত নৈহাটির অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল পরিচালক সমিতির সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাঁর চেষ্টায় স্কুলটি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায় এর নাম হয় নৈহাটি মহেন্দ্র হাই স্কুল। ১৮৯০-এ হরপ্রসাদ সম্পাদক হলেন। এক আমৃত্যু সম্পাদক ও সভাপতি রূপে প্রতিষ্ঠানটির বিকাশ সাধন ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। এর তাঁর সমাজ কল্যাণ মূলক উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রেরণায় চালিত হরপ্রসাদ নিজের জন্মস্থানে এইভাবে দেশের একটি প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র গড়ে রেখে গেছেন।

১৮৭৮ ১৬ ফেব্রুয়ারি হেয়ার স্কুলে ট্রান্স্লেশন মাষ্টার পদে যোগ দিলেন। ১৮৮৩-র ২৪ জানুয়ারি

CENTRAL LIBRARY

অবধি এই কাজ করেন, বেতন পেতেন ১০০ টাকা। রাজেন্দ্রলাল মিত্রর সঙ্গে যোগাযোগ হল এবং তাঁর গবেষণার কাজে সাহায্য করতে শুরু করলেন।

১৮ মার্চ কাটোয়ার কাছে দেয়াসিন গ্রাম নিবাসী রায় কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের মেয়ে হেমন্তকুমারীর সঙ্গে বিয়ে হয়।

চৈত্র মাসের বাসন্তী সপ্তমির দিন মা চন্দ্রমণির মৃত্যু হয়।

সেপ্টেম্বরে ১৩ মাসের ছুটি নিয়ে লখনৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়ে পড়াতে গেলেন।

১৮৮০ নৈহাটি পৌরসভার কমিশনার মনোনীত হন। দীর্ঘ দিন তিনি নৈহাটি পৌরসভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। মনোনীত ভাইস চেয়ারম্যান : ২১ মে ১৮৮২—৩ মে ১৮৮৪, নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান : ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫—৬ জানুয়ারি ১৮৮৮, নির্বাচিত চেয়ারম্যান : ৭ জানুয়ারি ১৯৮৮—২২ মার্চ ১৮৯১।

১৮৮২ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিখ্যাত The Sanskrit Buddhist Literature বইয়ের একটি বড়ো অংশ অনুবাদ ও সংকলনে সাহায্য করায় রাজেন্দ্রলাল ভূমিকায় লেখেন, 'Babu Haraparasad Shastri M.A., offered me his co-operation and translated the abstracts of 16 of the larger works'. রাজেন্দ্রলালের সহকারিতাসূত্রে হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

১৮৮৩ রাম নারায়ণ তর্করত্ন অবসর নিলে হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে ওই অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। হেয়ার স্কুল থেকে বদলি হয়ে ২৫ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজে এলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সরকারের সহকারী অনুবাদক নিযুক্ত হন।

১৮৮৪ নৈহাটি বেঞ্চের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, পরে এই বেঞ্চের সভাপতি।

১৮৮৫ ৪ ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে 'ভাষাতত্ত্ব-কমিটির সভ্য হন এবং বিবলিওথেকা ইন্ডিকা গ্রন্থমালা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পান। ঋগ্বেদ অনুবাদে রমেশচন্দ্র দত্তকে সাহায্য করেন। গ্রন্থ ভূমিকায় রমেশচন্দ্রের মন্তব্য, 'তিনি এই বৃহৎকার্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম না।

১৮৮৬ জানুয়ারি মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ অবধি এই পদে ছিলেন।

১৮৮৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (আজীবন) এবং সেন্ট্রাল টেক্স্ট বুক কমিটির সভ্য।

১৮৯১ জুলাই মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রর মৃত্যু হয় এবং তাঁর জায়গায় হরপ্রসাদ ডিরেক্টর অফ দি অপারেশন ইন সার্চ অফ স্যানসক্রিট ম্যানস্ক্রিপ্টস' এই পুথি সংগ্রহের পরিচালক পদ পান।

১৮৯২ এশিয়াটিক সোসাইটিতে জয়েন্ট ফিললজিক্যাল সেক্রেটারি এবং বিবলিওথেকা ইন্ডিকা গ্রন্থমালার সংস্কৃত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হলেন।

১৮৯৫ ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন। তাঁর চেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৯৬ থেকে সংস্কৃতে এম. এ. পড়াবার ব্যবস্থা হয়। বুদ্ধিস্ট টেক্স্ট অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির সম্পাদক।

১৮৯৭ ১৪ মার্চ (২ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দ)—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর সদস্য নির্বাচিত হন। মে মাসে পুথি সন্ধানের জন্য প্রথমবার নেপাল যাত্রা। রামচরিত আবিষ্কার। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)।

১৩০৪-০৯, ১৩১৮-১৯, ১৩২৩-২৬, ১৩৩১, ১৩৩৭-৩৮ তিনি পরিষৎ-এর সহকারী সভাপতি ছিলেন।

১৮৯৮ সরকার মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেন। ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার নেপাল যাত্রা। অধ্যাপক সিসিল বেন্ডের-এর সঙ্গে।

১৯০০ ৮ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বাংলাদেশে সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন।

১৯০৩ বুদ্ধগয়া মন্দির হিন্দু মোহন্তর তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা আর চলতে দেওয়া উচিত কিনা বিবেচনার জন্য গঠিত কমিশনের সদস্য। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রর সঙ্গে একত্রে এই বিষয়ে হরপ্রসাদ রিপোর্টটি প্রণয়ন করেন।

১৯০৪ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধিরূপে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৯০৬ এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯০৭ তৃতীয়বার নেপাল যাত্রা চর্যাপদ আবিস্কার।

১৯০৮ নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর নিলেন। সরকার তাঁকে 'ব্যুরো অফ ইনফরমেশন' প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, 'for the benefit of Civil Officers in Bengal in history, religion, customs and folklore of Bengal.......' নালন্দা পরিদর্শন। সরকারের অনুরোধে অক্সফোর্ড-এর বোডেন অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলকে পুথি সংগ্রহে সাহায্য করেন এবং ম্যাক্সম্যুলার স্মৃতিভবনের জন্য দুষ্প্রাপ্য বৈদিক পুথি সংগ্রহ করে দেন। এজন্য লর্ড কার্জন তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন, ...I should like both as a formar Viceroy and as chancellor of the University (Oxford) to send you a most sincere link of thanks for the great service which your erudition, goodwill and indefatigable exertion have enabled you to render to us. (চিঠি তারিখ ৫ জানুয়ারি ১৯১০, স্মারকগ্রন্থ পৃঃ ৪৩। স্ত্রী হেমন্তকুমারীর মৃত্যু)।

১৯০৯ এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজপুতানা ও গুজরাটে ভাট-চারণদের পুথি সংগ্রহের দায়িত্ব নেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হলেন।

১৯১০ এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

১৯১১ সরকার সি-আই-ই (Companion of the Indian Empire) উপাধি দিলেন। সিমলায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্য বিদ্যা সম্মিলনীর সদস্য মনোনীত হন।

১৯১৩ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর সভাপতি (১৩২০ বঙ্গাব্দ)।

হরপ্রসাদ ১২ বৎসর পরিষৎ-এর সভাপতি ছিলেন—১৩২০-২২, ১৩২৬-৩০, ১৩৩২-৩৬ বঙ্গাব্দ।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

১৯১৪ বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে (১৩২১ বঙ্গাব্দ) মূল এবং সাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯১৬ মথুরায় অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় সংস্কৃত মহাসম্মিলন-এ সভাপতি। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সৌধের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে The Educative Influence of Sanskrit নামে ভাষণ দেন।

১৯১৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে (সাহিত্য-সম্মিলন) সভাপতি।

১৯১৯ এশিয়াটিক সোসাইটি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১৯, ১৯২০ দুই বৎসর এই পদে ছিলেন।

১৯২০ হেতমপুরে অনুষ্ঠিত বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতি।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেবার আমন্ত্রণ। এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি।

কমলা বুক ডিপো প্রকাশন সংস্থায় যুক্ত হন। আমৃত্যু এই সংস্থার বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্-এর সভাপতি ছিলেন।

১৯২১ ইংল্যান্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি মেম্বার। ১৮ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ৩০ জুন ১৯২৪ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ৬০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আশীর্বাণী রচনা করেন।

১৯২২ চতুর্থবার নেপাল যাত্রা।

রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য পদ পাওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এ সংবর্ধনা (১৩২৯ বঙ্গাব্দ)।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত বিভাগের সভাপতি।

১৯২৩ কলকাতায় অনুষ্ঠিত অখিল-ভারত-হিন্দুসভায় সভাপতিত্ব করেন। নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনের (৮ আষাঢ় ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, ২৩ জুন) আহ্বায়ক।

তার আমন্ত্রণে নৈহাটিতে এসে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান।

১৯২৪ রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে মূল সভাপতি।

৩০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেন। সংস্কৃত কলেজে গভর্নর লর্ড লিটন হরপ্রসাদের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি লিট উপাধি পান।

১৯২৮ কলকাতায় রাস্তায় পড়ে গিয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পান। অবশিষ্ট জীবন ক্রাচ এবং চাকা দেওয়া চেয়ারের সাহায্য নিয়ে চলাচল করতে হত। এই শারীরিক অসুবিধা নিয়েই লাহোরে গিয়ে ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩০ বৃহত্তর ভারত পরিষদের (Greater India Society) সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হরপ্রসাদ-বর্ধাপন-সমিতি তাঁকে সংবর্ধনা জানান। এই উপলক্ষে দুই খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা অনুযায়ী হরপ্রসাদসংবর্ধন লেখমালার মুদ্রিত প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে উপহার দেওয়া হয়। পরিষৎ সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁকে খদ্দরের কাপড়ে তৈরি মালা, ধুতি, চাদর উপহার দেন। ১৭ নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) রাত্রি ১১টায় কলকাতার পটলডাঙার বাড়িতে অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয়। রাত্রেই শবদেহ কলকাতা থেকে নৈহাটির বাড়িতে নিয়ে এসে পরদিন নৈহাটিতেই অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করা হয়। (বারাণসীর ভারতধর্ম মহামণ্ডল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে প্রত্নতত্ত্ব-রত্নাকর উপাধি দিয়েছিল। কোন সময়ে এই সম্মান দেওয়া হয় জানা সম্ভব হয়নি। তিনি মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৬) The Indian Association for The Cultivation of Science-এরও সদস্য ছিলেন।)

CENTRAL LIBRARY

নির্বাচিত রচনাপঞ্জি

গ্রন্থ

১। ভারত মহিলা, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ (২০ জুন, ১৮৮১)

২। বাল্মীকির জয়, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ (২৯ ডিসেম্বর, ১৮৮১)

৩। মেঘদূত ব্যাখ্যা, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ (২৫ জুন, ১৯০২)

৪। কাঞ্চনমালা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬)

৫। বেনের মেয়ে, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ (২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০)

৬। বাঙ্গালা প্রথম ব্যাকরণ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ (৫ এপ্রিল, ১৮৮২)

৭। ভারতবর্ষের ইতিহাস/প্রাচীন আর্য্য হইতে লর্ড ল্যান্সডাউন পর্যন্ত, ১৩০১ বঙ্গাব্দ (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫)

৮। প্রাচীন বাংলার গৌরব, (বিশ্বভারতী প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—৫৪ সংখ্যক, ১৩৫৩ (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)

৯। বৌদ্ধধর্ম্ম। ১৩৫৫ (২৩ জুলাই, ১৯৪৮)

১০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, কলকাতা প্রথম খণ্ড ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮০

সূচি ঃ ১. বাল্মীকির জয়, ২. কাঞ্চনমালা, ৩. বেনের মেয়ে, ৪. মোহিনী, ৫. বামুনের দুর্গোৎসব, ৬. পাঁচ ছেলের গল্প, ৭. যৌবনে সন্ন্যাসী, ৮. প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ, ৯. একজন বাঙালি গবর্নরের অদ্ভুত বীরত্ব, ১০. তৈল, ১১. হৃদয় উদাস, ১২. স্ত্রী বিপ্লব, ১৩. দুর্গাপূজা, ১৪. ব্যনোগী টিব্বা, ১৫. ঝিল্পী, ১৬. এস এস বঁধু এস—আধ আঁচরে ব'স।

১১। দ্বিতীয় খণ্ড, ডিসেম্বর, ১৯৮১

সূচি ঃ ১. রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবনী, ২. বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়, ৩. বঙ্কিমচন্দ্র-১, ৪. বঙ্কিমচন্দ্র-২, ৫. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৬. রামেন্দ্রবাবু, ৭. পুরানো বাংলার একটা খণ্ড, ৮. অর্দ্ধেন্দু কথা, ৯. অর্দ্ধেন্দু-শেখর-১, ১০. অর্দ্ধেন্দুশেখর-২, ১১. আশীর্বচন, ১২. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ১৩. দেবেন্দ্র বিজয় বসু, ১৪. প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৫. বাংলা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন, ১৮. নারায়ণের প্রথম সংখ্যা, ১৭. রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৮. জগদিন্দ্রনাথ রায়, ১৯. গুরুদাস স্মৃতি, ২০. অধরলাল সেন, ২১. মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারদান, ২২. সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ২৩. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ : ১৩২১, ২৪. অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতির সম্বোধন, ২৫. সম্বোধন : সাহিত্য-পরিষৎ ১৩২২, ২৬. সভাপতির অভিভাষণ : সাহিত্য-পরিষৎ ১৩২৯, ২৭. সভাপতির অভিভাষণ : সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৩৭, ২৮. বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি, ২৯. বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর, ৩০. নূতন কথা গড়া, ৩১. বাংলা ভাষা, ৩২. মুসলমানি বাংলা, ৩৩. গুজ্জু উজাল বিবির কেচ্ছা, ৩৪. কবি কৃষ্ণরাম, ৩৫. বাংলা ব্যাকরণ, ৩৬. রাধামাধবোদয়, ৩৭. চণ্ডীদাস-১, ৩৮. চণ্ডীদাস-২, ৩৯. বাংলার পুরানো অক্ষর, ৪০. বাংলা সাহিত্য, ৪১. ডাক ও খনা, ৪২. বিদ্যাপতি, ৪৩. এখনকার থিয়েটার, ৪৪. The Late Bankim Chandra Chatterjee, ৪৫. Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English

CENTRAL LIBRARY

Education, ৪৬. Ancient Bengali Literature Under Muhammadan Patronage. ৪৭. Bengal Buddhist Literature।

১২। তৃতীয় খণ্ড : ডিসেম্বর, ১৯৮৪

সূচী : ১. শঙ্করাচার্য কী ছিলেন, ২. শঙ্করাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ৩. ভরত মল্লিক, ৪. চিরঞ্জীব শর্মা, ৫. কাশীনাথ বিদ্যানিবাস, ৬. রত্নাকর শান্তি, ৭. বৃহস্পতি রায়মুকুট, ৮. বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, ৯. রামমণিকা বিদ্যালংকার, ১০. পুরুষোত্তমদেব, ১১. ব্রাহ্মণ ও শ্রবণ, ১২. ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার, ১৩. রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল, ১৪. বৌদ্ধ ঘন্টা ও তাম্রমুকুট, ১৫. বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে? ১৬. নির্বাণ, ১৭. নির্বাণ কয় রকম? ১৮. কোথা হইতে আসিল? ১৯. হীনযান ও মহাযান, ২০. মহাযান কোথা হইতে আসিল, ২১. সহজযান, ২২. বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত, ২৩. বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল? ২৪. এখনো একটু আছে, ২৫. উড়িষ্যার জঙ্গলে, ২৬. জাতক ও অবদান, ২৭. দলাদলি, ২৮. মহাসাংঘিক মত, ২৯. থেরবাদ ও মহাসাংঘিক, ৩০. মানুষ ও রাজা, ৩১. বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম, ৩২. হিন্দু বৌদ্ধে তফাত, ৩৩. বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, ৩৪. বাংলায় বৌদ্ধ সমাজ : হিন্দু ও বৌদ্ধ, ৩৫. ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব, ৩৬. Buddism in Bengal Since the Muhammadan Conquest.

১৩. চতুর্থ খণ্ড : ডিসেম্বর, ১৯৮৯

সূচি : ১. আমাদের গৌরবের দুই সময়, ২. সমাজের পরিবর্ত কয় রূপ, ৩. মহারাজা নন্দকুমার, ৪. কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে, ৫. জাতিভেদ, ৬. কুশীনগর, ৭. কাঁটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তল-ফলক, ৮. রংপুর সাহিত্য-পরিষদের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ, ৯. অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির সম্বোধন, ১০. হিন্দুর মুখে আরঙ্গজেবের কথা, ১১. মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা, ১২. পালবংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা, ১৩. খানাকুল-কৃষ্ণনগর (পঞ্চদশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর মূল সভাপতির সম্বোধন), ১৪. আমাদের ইতিহাস, ১৫. কয়েকটি তারিখ, ১৬. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সভাপতির অভিভাষণ : ১৩৩৫, ১৭. ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস, ১৮. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের মূলসূত্র, ১৯. ইক্ষু, ২০. এক্সচেঞ্জ, ২১. স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষাকর, ২২. খাজনা কেন দিই, ২৩. নূতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউ-এর মত, ২৪. মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, ২৫. শিক্ষা, ২৬. কালেজি শিক্ষা, ২৭. ভট্টাচার্য বিদায় প্রণালী, ২৮. সংস্কৃত শিক্ষা, ২৯. মুসলমানগণের সংস্কৃত চর্চা, ৩০. লাইব্রেরি, ৩১. যার কাজ সেই করুক, ৩২. সাবেক মনুষ্যত্ব ও হালের সাইন করা, ৩৩. জয়দেব চরিত্র, ৩৪. রাধিকার মানভঞ্জন, ৩৫. পাষাণের কথা, ৩৬. বঙ্গবীরাঙ্গনা রায় বাঘিনী, ৩৭. বংশ পরিচয়, ৩৮. পাখীর কথা, ৩৯. সৌন্দরনন্দ কাব্য, ৪০. কালিকা পুরাণীয় দুর্গাপূজা পদ্ধতি, ৪১. লিচ্ছবি জাতি, ৪২. কীর্তিলতা, ৪৩. শকুন্তলায় নাট্যকলা, ৪৪. রামায়ণের সমাজ, ৪৫. বীরভূম বিবরণ (তৃতীয় খণ্ড), ৪৬. পরিমল, ৪৭. মহাভারত-আদিপর্ব, ৪৮. শান্তিপুর স্মৃতি : অদ্বৈত খণ্ড, ৪৯. লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার, ৫০. মেঘদূত, ৫১. গোগৃহ, ৫২. কালিকামঙ্গল, ৫৩. বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, ৫৪. সিংহল দ্বীপ, ৫৫. মেঘদূত, ৫৬. টুকটুকে রামায়ণ, ৫৭. ডাহির-সেনাপতি নাটক, ৫৮. তীর্থ-ভ্রমণ : খানাকুল হইতে হরিদ্বার। ১৮৫৩ অব্দ। ৫৯. কান্ত কবি রজনীকান্ত, ৬০. শ্রীকৃষ্ণ, ৬১. ঋষির মেয়ে, ৬২. কর্ম্মরহস্য, ৬৩. কামন্দকীয় নীতিসার, ৬৪. অভিধান।

[রচনা-সংগ্রহ পঞ্চম খণ্ড যন্ত্রস্থ]

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ

১৪. শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল : মাণিক গাঙ্গুলি বিরচিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩১২

১৫. হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা'। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শ্রাবণ, ১৩২৩বঙ্গাব্দ(১৯১৬)।

১৬. কাশীরাম দাসের মহাভারত : আদিপর্ব। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৩৫ (২৫ জুলাই, ১৯২৮)।

১৭. কীর্ত্তিলতা : মহাকবি বিদ্যাপতি-বিরচিত, ১০ জানুয়ারি, ১৯২৫

১৮. বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, বিবলিওথেকা ইন্ডিকা ১২০ সংখ্যক। ১৮৮৮-৯৭

১৯. আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিত, বিবলিওথেকা ইন্ডিকা ১৬৪ সংখ্যক। ১৯০৪

২০. সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত। এশিয়াটিক সোসাইটি মেমোয়ার, তৃতীয় খণ্ড, সংখ্যা ১, ১৯১০

২১. রত্নকীর্ত্তি। পণ্ডিত অশোক ও রত্নাকর শান্তির লেখা ৬ খানি বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের পুথি। বিবলিওথেকা ইন্ডিকা ১৮৫ সংখ্যক, ১৯১০

২২. সৌন্দরনন্দ, বিবলিওথেকা ইন্ডিকা ১৯২ সংখ্যক, ১৯১০

২৩. আর্য্যদেবের 'চতুঃশতিকা'। এশিয়াটিক সোসাইটি মেমোয়ার, তৃতীয় খণ্ড, সংখ্যা-৮, ১৯১৪

২৪. অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ, গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, সংখ্যা-৪০, ১৯২৭

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনা

নারায়ণ

২৫. কালিদাসের মেয়ে দেখান, ভাদ্র, ১৩২২

২৬. সীতার স্বপ্ন, আশ্বিন, ১৩২২

২৭. কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা, ফাল্গুন ১৩২২

২৮. ইরাবতী মালবিকাগ্নিমিত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

২৯. পার্বতীর প্রণয়, আষাঢ়, ১৩২৩

৩০. উর্বশী বিদায়, ফাল্গুন, ১৩২৩

৩১. মানুষ ও রাজা, বৈশাখ, ১৩২৪

৩২. বিরহে পাগল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

৩৩. কোমলে কঠোর, আষাঢ়, ১৩২৪

৩৪. কণ্বের কোমল মূর্তি, শ্রাবণ, ১৩২৪

৩৫. কণ্বের কঠোর, মূর্তি, আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২৪

৩৬. শকুন্তলার মা, কার্তিক ১৩২৪

৩৭. দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য, অগ্রহায়ণ ১৩২৪

৩৮. দুর্বাসার শাপ, পৌষ ১৩২৪

৩৯. শকুন্তলার হিঁদুয়ানী, মাঘ, ১৩২৪

৪০. এক এক রাজার তিন তিন রানী, ফাল্গুন, ১৩২৪

CENTRAL LIBRARY

৪১. অগ্নিমিত্রের ভাঁড়, বৈশাখ, ১৩২৫

৪২. কুমারসম্ভব—সাত না সতেরো সর্গ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

৪৩. রঘুবংশের গাঁথুনি, শ্রাবণ, ১৩২৫

৪৪. রঘুতে নারায়ণ, ভাদ্র, ১৩২৫

৪৫. রঘু আগে না কুমার আগে? আশ্বিন, ১৩২৫

৪৬. অজ বিলাপ ও রতি বিলাপ, কার্তিক, ১৩২৫

৪৭. রঘু কাব্য বড় কিসে, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

৪৮. রঘু বংশে বাল্যলীলা, পৌষ, ১৩২৫

৪৯. রামের ছেলেবেলা, ফাল্গুন, ১৩২৫

৫০. রঘুবংশে প্রেম, চৈত্র, ১৩২৫

৫১. রঘুবংশে প্রেম-বিরহ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

পঞ্চ পুষ্প

৫২. ভরতের নাট্যশাস্ত্র

প্রবাসী

৫৩. কালিদাসের অভিধান

প্রাচী

৫৪. ব্রাত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

৫৫. বেদ ও বেদব্যাখ্যা, পৌষ, ১২৮৪;

৫৬. কালিদাস ও সেক্ষপীয়র, বৈশাখ, ১২৮৫

৫৭. রঘুবংশ, কার্তিক, ১২৯০

বঙ্গদর্শন

৫৮. ভারত মহিলা, মাঘ-চৈত্র, ১২৮২

৫৯. রঘুবংশ, কার্তিক, পৌষ ১২৯০

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬০. ব্রহ্মা প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৮

৬১. মহাদেব, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩২৮

ইংরেজি

1. Discovery of Living Buddism in Bengal, 1897
2. Malabikagnimitra, 1907
3. The Educative Influence of Sanskrit, 1916
4. Bird's eye-view of Sanskrit Literature, 1917
5. Magadhan Literature, 1923

CENTRAL LIBRARY

6. Lokayata, 1925
7. Adsorption of the Vratyas, 1926
8. Sanskrit Culture in Modern India, 1928
9. History of India, 1895

Descriptive Catalogues of Mss. & Report on Search for Mss.

10. Catalogue of Palm-leaf and Selected paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal, Vol. I-1905, Vol. II-1915.
11. Catalogue of Manuscripts in the Bishop College Library, Calcutta, 1915.
12. A descriptive catalogue of Sanskrit manuscripts in the Government collection under the care of the Asiatic Society of Bengal. Vol. I-Buddhist Mss. 1917. Vol. II-Vedic Mss. 1923, Vol. II-Smriti Mass 1925, Vol. IV-History & Geography Mss. 1923.
13. A descriptive catalogue of Sanskrit Mss. in the collection of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V— Purana Mss. 1928, Vol. VI—Vyakarana Mass. 1931, Vol. VII—Kavya Mss. Vol. VIII—Philosophy, Vol. IX—Tantra, Vol. X—Jyotisa, Vol. XI—Jaina, Vol. XII—Vernacular, Vol. XIII—Miscellaneous, Vol. XIV—Addenda, Supplement.
14. Notices of Sanskrit Manuscripts, 1st Series, Vol. X-1890-92, Vol. X 1895.
15. Notices of Sanskrit Manuseripts, 2nd Series, Vol. I, 1898-90, Vol. II 1898-1904, Vol. III, 1904-07, Vol. IV, 1911.
16. Report on the Bodh Gava temple (written in collaboration with Mr. Justic Sarada Charan Mitra), 1903
17. Report on the search of Sanskrit Manuscripts for 1895-1900, 1901.
18. Report on the search of Sanskrit Manuscripts for 1901-02 to 1905-06, 1905.
19. Report on the search of Sanskrit Manuscripts for 1906-07 to 1910-11, 1911.
20. Report of a Tour in Western India in search of Mss. of Bardic Chronicle, 1909.
21. A Report on the Mss. of various languages of India, Tibet and Indo-China in the Bishop College Library, Calcutta, 1911.
22. Priliminary report on the operation in search of Mss. of Burdic Chronicle 1913, 1913.

Buddhisti Studies, The

23. Chips from a Buddhist workshop, 1913

Calcutta Review, The

24. The diary of Govinda dasa, January & April, 1898.
25. Topography of Govinda dasa's diary, July, 1898.

26. Sanskrit learning in India, July, 1903.
27. Bengali Buddist leterature, 1917.

Dacca Review, The

28. The Buddhists in Bengal, October, 1921.

Epigraphia India, The

29. Mandasore incription of the time of Naravarman. The Malaya year 461, 1913-14.

Indian Antiquary

30. Dakshini Pandits at Benares, 1912.
31. Santideva, 1913.
32. King Chandra of the Meherauli Iron Pillar incription, 1913.

Indian Historical Quarterly, The

33. The Northern Buddism, March, June, September 1925.
34. A copper-plate Grant of Viswarupa sena of Bengal, March, 1926.

Journal of the Asiatic Society of Bengal

35. Sri Dharmamngala : A distant Echo of the Lalitavisrtara, 1895.
36. History of Nyaya-Sastra from Japanese sources, NS : I. 1905.
37. An examination of the Nyaya-Sutras, NS : I, 1905.
38. The recovery of a lost Epic by Asvaghosa, NS : V. 1909.
39. The Origin of the Indian Drama, NS : V, 1909.
40. Causes of the dismemberment of the Maurya Empire, NS : VI, 1910.

CENTRAL LIBRARY

ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মানুষ ইচ্ছা করুক আর না-ই করুক, ত্রিবর্গ তাহাদের সাধন করিতেই হয়। এই ত্রিবর্গের নাম ধর্ম, অর্থ ও কাম অথবা দরকার দেখিয়া যদি বলিতে হয় অর্থ কাম ও ধর্ম—অর্থ সকলের চেয়ে দরকারি, কেননা, নহিলে শরীর ধারণ হয় না, আর শরীর নহিলে কোনো কাজই হয় না। তাহার পর কাম নহিলে বংশরক্ষা হয় না, জাতিরক্ষা হয় না। তাহার পর ধর্ম যাহাতে ধরিয়া রাখে বাঁধিয়া রাখে অর্থাৎ সমাজ বাঁধিয়া রাখে, বংশের ধারা ধরিয়া রাখে।

এই ত্রিবর্গ সাধনের প্রধান বই 'বৃহস্পতিসূত্র' তিনি বলেন তোমরা যদি অর্থ সঞ্চয়ে মনোযোগ করিতে চাও লোকায়তিকই তোমাদের একমাত্র শাস্ত্র। যদি কামসাধন করিতে চাও কাপালিকই তোমাদের একমাত্র শাস্ত্র, আর যদি ধর্ম উপার্জন করিতে চাও তাহা হইলে আর্হতই তোমাদের একমাত্র শাস্ত্র। তিনি এই ত্রিবর্গ সাধনের উপায় বলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে নাস্তিক পাষণ্ড প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া গাল দিয়া থাকি। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ত্রিবর্গ সাধন করিলেও সে আস্তিক হইবে না। আস্তিক হইতে গেলে আর একটি জিনিস চাই, সেটি পরলোকবিশ্বাস। চলিত কথায় ঈশ্বর না মানিলেই নাস্তিক হয়, মানিলেই আস্তিক হয়; কিন্তু কথাটা তা নয়, ঈশ্বর মানো আর না-ই মানো পরলোক মানিলেই আস্তিক, নহিলে নাস্তিক। সাংখ্যেরা নিরীশ্বরবাদী হইয়াও আস্তিক।

আস্তিক হইতে গেলেই, পরলোক মানিতে গেলেই, পরলোক যাহাতে ভালো হয় তাহার জন্য একটা সাধনা করিতে হয়। সে সাধনাও ত্রিবর্গ সাধনার মধ্যে পড়ে কি-না। অনেকে মনে করেন, ধর্ম সাধনার মধ্যে সেটাও পড়ে। দেবলোক, স্বর্গলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক পাইতে গেলে ধর্ম সাধনাই প্রধান অবলম্বন। সুতরাং অনেকে ত্রিবর্গ সাধনাই মনুষ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেকে মনে করেন ত্রিবর্গ সাধনা ছাড়া আরো একটা সাধনা আছে, উহা শুদ্ধ পরলোকের জন্য, উহার নাম মোক্ষ সাধনা। এইরূপে ত্রিবর্গ হইতে আমরা চতুর্বর্গে উঠিতে পারি। কিন্তু মোক্ষ সাধনা একেবারে তো অতীন্দ্রিয় সাধনা। পরকালের সকল কথাই অতীন্দ্রিয়, সুতরাং অতীন্দ্রিয় লইয়া জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়। স্বর্গবাসই কি পরলোক সাধনার চরম? পিতৃলোক বাসই কি পরলোক সাধনার চরম? আবার তো ফিরিয়া আসিতে হইবে? আবার তো সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে হইবে। তাহা হইলে উহা চরম হইতে পারে না। ঐ-সকল উচ্চলোক প্রাপ্তি তো ক্ষণস্থায়ী, যেমন পাপ বা পুণ্য করিবে তেমনই তাহার ফলভোগ করিবে—পরলোকে তা সুখই ভোগ করো আর দুঃখই ভোগ করো। সেইজন্য প্রথম হইতে লোকে জন্ম-জরা-মরণ —এ ত্রিতাপের হাত হইতে আত্যন্তিক এবং প্রকান্তিক মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন হইতেই মোক্ষ সাধনা জমিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহারা মনে করিলেন জন্ম, জরা ও মরণের হাত এড়াইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। নির্বাণলাভের পর কী থাকিবে একথা জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধদেব বলিতেন, সে কথায় তোমার কাজ কী? তোমায় আর জন্মাইতে হইবে না, বৃদ্ধ হইতে হইতে মরিতে হইবে না, এই হইলেই তোমার যথেষ্ট হইল, তুমি ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকো। সাংখ্যেরা বলিতেন, তুমি প্রকৃতির নাচ দেখিলে, তুমি প্রকৃতি হইতে পৃথক একথা বুঝিলে, তোমার বিবেকখ্যাতি হইলেই যথেষ্ট, আর সাধনার প্রয়োজন কী? কিন্তু কোনো বিষয়ে চিন্তাস্রোত একবার বহিতে থাকিলে তাহাকে রোধ করা অসম্ভব। উহাতে "যথেষ্ট" শব্দের প্রয়োগ আর চলে না। শুদ্ধ জন্ম-জরা মরণ রোধ করিয়া লোক ক্ষান্ত থাকিল না। ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল।

নির্বাণ তো শান্ত হইয়া যাওয়া। প্রদীপ নিবিলে যেমন ঠাণ্ডা হইয়া যায় তেমনি ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া। দীপো যথা।

সাংখ্যদের কৈবল্য তো কেবল হইয়া যাওয়া। আমি আছি, আমি জন্ম-জরা-মরণের হাত এড়াইয়াছি। কিন্তু আমার সঙ্গে জগতের কাহারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই।

পরকালের এইরূপ ধারণায় লোক বেশিদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না, সুতরাং পণ্ডিতেরা ইহার পর কী হইবে তাহার সন্ধান আরম্ভ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ ও কপিল যেখানে দাড়ি টানিয়া দিয়াছেন তাহা উঠাইয়া দিয়া তাহার বাহিরেও যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শৈবেরা স্থির-গণ-পদ-প্রাপ্তি ও শুদ্ধ-গণ-পদ-প্রাপ্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা সামীপ্য সারূপ্য সালোক্য ও সাযুজ্য চাহিতে লাগিলেন, জৈনেরা কেবলী শ্রুতকেবলী হইতে চাহিলেন। আস্তিকেরা পরব্রহ্মে লীন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধেরা নির্বাণ হইতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, তাহা হইতেও ধর্মকায় ও সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায় আকাঙ্ক্ষা করিয়া ধর্মকায়ই প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলেরই চেষ্টা হইল আর ফিরিতে না হয়, কিন্তু ফিরিলাম না তো সেখানে কী ভাবে থাকিব তাহাই লইয়া সকলেই মাথা ঘামাইতে লাগিলেন।

দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই যখনই মুক্তির লক্ষণ চরমে উঠে তখনই তখনই ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হন এবং মুক্তির তেজ কমাইয়া দেন। এ সম্বন্ধে 'মহাভারত' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' হইতে একটি উদাহরণ দিব। উদাহরণটির রস বড়োই করুণ। এত করুণরস মহাকাব্যেও দুর্লভ। উদাহরণটি এই—

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস সংসারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র শুকদেব কিন্তু সন্ন্যাসী এবং মুক্তিকামী। গর্ভাবস্থা হইতেই তিনি একরূপ মুক্ত পুরুষ। প্রবৃত্তি তাঁহার কিছুতেই ছিল না। একটু বয়স হইলেই শুকদেব মুক্তিলাভের জন্য সূর্যের দিকে যাত্রা করিলেন। আপনারা সকলেই জানেন, মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম-অবলম্বীদিগের আত্মা দুই পথে যাত্রা করেন, এক পিতৃযান ও আর-এক দেবযান। পিতৃযানে যাইতে হইলে চন্দ্রের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, দেবযানে যাইতে হইলে সূর্যের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। চন্দ্রলোকে যাইলে পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। সূর্যলোক দিয়া গেলে পুনরাবৃত্তি নাই। শুকদেব মুক্তিকামী, সুতরাং তিনি সূর্যমণ্ডলাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ব্যাসদেব পুত্রবিরহে কাতর হইয়া হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া করুণ ক্রন্দনে দিগন্ত ভরাইয়া দিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, যেও না, যেও না, ফিরে এসো, ফিরে এসো।" শুকদেবও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আর না, আর না"। দেবাসুর, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, কিন্নর স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল, শুকদেব নক্ষত্রবেগে সূর্যমণ্ডলে পতিত হইলেন—আর তাঁহার কিছুই দেখা গেল না। 'মহাভারতে' এই পর্যন্তই শেষ। শুকদেব মনুষ্যজীবনের চরম সীমা মুক্তিলাভ করিলেন। সকলেই ব্যাসদেবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রহিল।

'ভাগবতে'র প্রথম স্কন্ধে এই গল্পটি ঠিক আছে, কিন্তু ইহার পরে আরো অনেক কথা আছে—

শুকদেব সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া, লোকের পর লোক উঠিয়া, তথায় তিনি বিষ্ণুর সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুলোকেই থাকিতেন ও তিনি বিষ্ণুর সবই পাইয়াছিলেন, কেবল আধিপত্য পান নাই। একদিন ভগবান্ শ্বেতদ্বীপে গিয়া উপস্থিত, সঙ্গে শুকদেব আছেন। সেখানকার সব অধিবাসী ঐকান্তিক অর্থাৎ সব ছাড়িয়া আপনাদের মন-প্রাণ সমস্তই বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। আর-কিছুই ভাবনা নাই, আর-কিছুরই চিন্তা নাই। ইহাদিগকে দেখিয়া ভগবান্ শুকদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুকদেব, তুমি এখানে কী করিতেছ? তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরিয়া যাও, সেখানে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া পুরাণ লেখো, যাহাতে ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির প্রচার হয়।" শুকদেব আবার দ্বিভুজ কৌপীনধারী মূর্তি

CENTRAL LIBRARY

ধারণ করিয়া বদরিকাশ্রমে পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতাও বহুকাল পরে হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া স্নেহভরে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং ভগবানের আদেশ মতো তাঁহাকে 'শ্রীমদ্ভাগবত' রচনায় সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম ও প্রধান ভক্তিশাস্ত্রের আর্বিভাব হইল।

যখন শাক্যসিংহ ও মহাবীর জ্ঞানপ্রধান বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়েই ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের উৎপত্তি। আবার যখন বৌদ্ধগণ শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও মহাসুখবাদ লইয়া এবং শংকরাচার্য প্রভৃতি বেদান্তবাদীগণ সচ্চিদানন্দঘন মত লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন, তখনই দ্রাবিড় দেশে বিষ্ণুস্বামী আবির্ভূত হইয়া ভক্তিমার্গ প্রচলন করিলেন। ইনিই সর্ব প্রথম বলিয়া দিলেন, "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।" বিষ্ণুস্বামীর মত প্রায় ২০০ বৎসর খুব চলিয়াছিল। তারপর, রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বাদিত্য প্রবল হইয়া উঠিয়া তাঁহার মতকে চাপা দিলেন। সকলেই ভক্তিমার্গের উপাসক, কিন্তু ভক্তির সহিত দর্শনের অদ্বৈত মত চলিতে পারে না। তাই ভক্তিশাস্ত্র ক্রমে দ্বৈতভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মধ্বাচার্য ও নিম্বাদিত্য দুই জনেই পুরা মাত্রায় দ্বৈতবাদী ছিলেন। ইহাদের মত এখনো চলিতেছে, এবং কোটি কোটি লোক ইঁহাদের উপদেশ অনুসারে চরিত্র গঠন করিতেছে, সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেছে ও হৃদয়ের সান্ত্বনা লাভ করিতেছে। তাহারা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই বলে—

"লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব
শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় ভবৎ-প্রসাদাৎ
সংসারযাত্রামতিবর্ত্তয়িষ্যে।।"

বিষ্ণুস্বামীর মত দ্রাবিড়ে লোপ হইলেও, ৩০০ বৎসর পরে গোকুল বৃন্দাবনে আবার জাগিয়া উঠিল। বিষ্ণুস্বামীর মতাবলম্বী লক্ষণ আর্য নামক একজন লোক অন্ধ্র দেশ হইতে আসিয়া কাশীবাস করেন। তাঁহারই পুত্র বল্লভাচার্য গোকুল বৃন্দাবনে গিয়া বিষ্ণুস্বামীর মত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করেন, যাগ-যজ্ঞাদি করেন, অথচ বিষ্ণু সেবায়ই আত্মসমর্পণ করেন।

খৃষ্টের পর ১২ শতকে ভক্তিটা দক্ষিণ দেশেই খুবই প্রসার পাইয়াছিল, উত্তর-ভারতে ছিল না। সেই সময়ে একটা কথা উঠে—

"উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তিবৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা।"

কিন্তু ইহার পর হইতেই আর্যাবর্তে ভক্তির খুব প্রচলন হয়। গুজরাটেই প্রথম নরসিংহ ভক্তিধর্মের ধ্বজা তুলেন। তাহার পর যে কত বৈষ্ণব উত্তর-ভারতে ভক্তিধর্মের প্রচার করেন, তাহার সীমা নাই। বল্লভাচার্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। রামানন্দের মত এতদিন বড়ো জানা ছিল না, এখন তাঁহার মত লইয়া বেশ আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ ভক্তির স্রোতে ডুবাইয়া দেন। সে স্রোতে—

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।"

তাঁহার মত চারি শত বৎসর ধরিয়া ক্রমেই প্রবল হইতেছিল। এক-এক সময় মনে হয় যেন বাংলায় আর-সকল ধর্ম লোপ হইয়া চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত ধর্মই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু ভক্তিধর্মের কথা বলিতে বলিতে অনেক কথাই বলিলাম। কিন্তু জ্ঞানপ্রধান ধর্মে ভক্তি কোথা হইতে আসিবে? তখন আমার মনে হইল, আমার বাক্যকালের বন্ধু, গুরু ও দেবতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, "বুদ্ধদেব হইতেই ভক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, কারণ ভক্তি মানুষের উপরই হয়, দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার উপর হয় না। বুদ্ধের ন্যায় লোকোত্তর মনুষ্যের উপরই প্রথম ভক্তি হয়, এবং সেইখান হইতেই ভক্তির আরম্ভ।" কথাটা সত্য কি মিথ্যা জানি না, কিন্তু কথাটা মনে লাগিয়াছিল। মনে পড়িল, রামচন্দ্র কবিভারতী নামক একজন লোক গৌড় দেশে বারেন্দ্রভূমে বেরবতী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২২০ খৃষ্টাব্দে সিংহলে যান। তথায় পরাক্রমবাহু নামক রাজা তাঁহাকে "বুদ্ধাগমচক্রবর্তী" উপাধি প্রদান করেন। তিনি 'বুদ্ধশতক' বা 'ভক্তিশতক' নামক একখানি পুথি রচনা করেন। পুথিখানি পড়িয়া তখন রাজকৃষ্ণবাবুর কথাটা কতক সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। পুথিখানি খুঁজিয়া লইয়া পড়িলাম। উহা হইতে কয়েকটি ভক্তিরসের কবিতা আপনাদিগকে উপহার দিতেছি। ২৫নং কবিতাটি এই —

"ত্বদ্ বৈরাগ্য-সমস্ত-ভূত-করুণা-প্রজ্ঞাদি-নানা-গুণ—
স্ফূর্য্যচ্চন্দন-পঙ্ক-সিন্ধু-পতিতো গন্তুং ক্ষমো নান্যতঃ।
ভূপা বা যদি দণ্ডয়ন্তি বিবুধা নিন্দন্তি বা বান্ধবা
মুঞ্চন্তি ক্ষণমপাহং জিনপিতঃ জীবামি ন ত্বাং বিনা।।"

২৪নং কবিতাটি এই—

"নাহং লাভার্চনার্থী ন চ ভয়চকিতো নাপি সৎকীর্তিকামো
ন ত্বং ঘর্মাংশুপ্রভব ইতি মুনে নাপি বিদ্যাশয়া তে।
পারম্পর্য্যান্ ন চ ত্বাং শরণমুপগতঃ কিন্তু তে সার্বজনাং
সম্যগ্ জ্ঞানং সমীক্ষ্য ত্বয়ি ভবজলধিং সন্তরিতুং প্রবৃত্তঃ।।"

২২নং—

"মূর্দ্ধন্ বুদ্ধং নম ত্বং, শ্রবণ শৃণু সদা ধর্মমদ্বৈধবাদি
প্রোক্তং, সর্ব্বজ্ঞরূপং নয়ন নিরূপমং পশ্য জিহ্বাংঘ্রিপদ্মম্।
ঘ্রাণ ত্বং চ অর্কবন্ধোঃ, স্তুহি সখি রসনে, শ্রীঘনং পূজয়েথাঃ
সিদ্ধং পাণে ব্রজাংঘ্রে জিনসদনম্, অদঃ সদ্‌গুণং
চিত্ত চিন্তা।।"

১৩নং—

"পুনরপি শরণং ব্রজামি বুদ্ধং পুনরপি লোকগুরুং
গুরুং করোমি।
পুনরপি কথয়ামি নৌমি বন্দে ত্বয়ি মম গৌতম নৈব
তৃপ্তিমাস্তে।।"

২৭নং—

"তবৈবাহং দাসো গুণপণগৃহীতোঽস্মি ভবতা
তবৈবাহং শিষ্যঃ স্ববচনবিনীতোঽস্মি ভবতা।
তবৈবাহং পুত্রঃ স্মৃতিকৃতিসুখস্তদ্‌গতিগতো
গুরো, বুদ্ধ, স্বামিন্, মম জনক মাং পাহি ভবতঃ।।"

৩৩নং—

"জগদুপকৃতেরেব বুদ্ধপূজা তদপকৃতে স্তব লোকনাথ পীড়া।
জিন জগদপকৃৎ কথং ন লজ্জে গদিতুমহং তব
পাদপদ্মভক্তঃ।।"

৮৯নং—

"স্নানে, কর্মণি, ভোজনে, বিতরণে, ঘ্রাণে, কথাকর্ণনে,
ধ্যান-স্পর্শন-দর্শনাদিষু তথা, সম্ভাষণদাবপি।
প্রাতঃ, সায়মথ, দিবা চ, নিশি চ, তৎপাদপদ্মে প্রভো,
চিত্তং মে রমতাং, মুনীন্দ্র, সততং, যূনাং যুবত্যাং ইব।।"

১০৪নং—

"অপি গগনমনন্তং সর্বসত্ত্বোপ্যনন্তঃ
সকলমিদম্ অনন্তং চক্রবালং বিশালম্।
বদসি জিন বিদিত্বানন্তয়া জ্ঞানগত্যা
তব চ গুণমনন্তং বেৎসি বুদ্ধ ত্বমেব।।"

বৌদ্ধধর্মে ভক্তি আর-একদিক হইতে আসিয়াছে। গোড়ায় বৌদ্ধরা গুরু বলিয়া একটা পদার্থ স্বীকারই করিত না। আমরা যাহাকে গুরু বলি তাহারা তাহাকে "কল্যাণমিত্র" বলিত। সকলেই যেখানে সমান, সেখানে একজন আর-একজনের গুরু হইবে কী করিয়া? কিন্তু মহাযানে যখন দার্শনিক মত এত গভীর হইয়া দাঁড়াইল যে, সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে না, তখন সেই মত যাহারা প্রচার করিত তাহাদের গুরু না বলিয়া পারা যাইত না। গুরুর তুলনায় শিষ্য আপনাকে যতই দীন বলিয়া মনে করিতে লাগিল—আপনার দৈন্য যতই তাহার নিকট প্রকট হইতে লাগিল, ততই সে গুরুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিল। তনু, মনু, গুরুকে অর্পণ করিতে লাগিল। ধন অর্পণ করা সোজা কথা, তনু অর্পণ করা অনেক কঠিন, মন অর্পণ করা আরো কঠিন। কিন্তু শিষ্যেরা গুরুকে সবই অর্পণ করে। আগে বৌদ্ধধর্মে এক গুরু ছিলেন—তিনি স্বয়ং শাক্যসিংহ; কিন্তু পরে অনেক গুরু হইতে লাগিল। যাহার নিকট সান্ত্বনা পাইত তাহাকেই গুরু বলিত। লামা শব্দের অর্থ গুরু। সে গুরু যদি, আবার সংসারী না হইয়া সন্ন্যাসী হন, তাঁহার উপর ভক্তি বাড়িবার ছাড়া কমিবার কথা নয়। এখন যে-সকল বৌদ্ধেরা দল বাঁধিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, প্রত্যেক দলে অনেকগুলি গুরু ও অনেকগুলি শিষ্য থাকে। তাহাদের মধ্যে একজন শিষ্যের সহিত ভাব করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "গুরু তোমাদের কী উপদেশ দেন?" সে বলিল, "কিছুই উপদেশ দেন না। কাছে থাকিতে দেন এই যথেষ্ট। আমরা বহুদিন মন-প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারি। আমরা যেসব বিষয়ে উপদেশ চাই, সে সকল উপদেশ কথায় দেওয়া যায় না। গুরুর কৃপা হইলে সে-সকল আপনিই মনে উদয় হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা এরূপ গুরুর সেবা করিতে পারি না?" সে বলিল, "একেবারেই পারেন না। সেরূপ ধ্যান দেওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব। এই যে ভক্তি ইহা সহজে লাভ করা যায় না।" শিষ্যের এইসব কথা শুনিয়া আমার কাহ্নপাদের চর্যা মনে পড়িল—

"ভণ কইসে সহজ বোলবা জায়
কাঅ বাক্ চিঅ জসু ণ সমাঅ।।
আলে গুরু উএসই সীস।

CENTRAL LIBRARY

বাক্‌পথাতীত কাহিব কাস।।
জে তই বোলী তে তবি টাল
গুরুবোধসে সীস কাল।।
ভণই কাহ্ন জিনরঅণ বি কসইসা।
কালে বোব সংবোহিঅ জইসা।।"

কথাটা ঠিক। যাহা স্বসংবেদ্য তাহা কে কাহাকে বুঝাইবে? বুঝাইবার সময় গুরু বোবা, শিষ্য কালা। তথাপি যাঁহার কৃপায় সে জিনিসটি আমার স্বসংবেদ্য হয়, তাঁহাকে ভক্তি করিয়া আমি কুলাইয়া উঠিতে পারি কি?

শেষাশেষি অবস্থায় একবার ভক্তিশাস্ত্রে যিনি আমাদের গুরুর গুরু পরম গুরু, তাঁহার কথা কিছু আলোচনা না করিয়া ছাড়া যায় না। তিনি ভক্তিশাস্ত্র প্রণেতা শাণ্ডিল্য ঋষি। তাঁহার সঙ্গে আরো এক জনের নাম করিতে হয়—ইনি স্বপ্নেশ্বর—ভক্তিসূত্রের টীকাকার। স্বপ্নেশ্বরবাংলায় এক প্রসিদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রে বাঁড়ুয্যে বংশে নরহরির নাম খুব প্রসিদ্ধ। তাঁহার উপাধি ছিল বিশারদ। তাঁহার পুত্র বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র আনিয়া প্রথম বাংলায় প্রচার করেন; এবং শেষ বয়সে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া বাস করেন এবং তথায় অতি বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া 'চৈতন্যশতক' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র জলেশ্বর উড়িষ্যাধিপতির বাহিনীপতি নিযুক্ত হন। জলেশ্বরের পুত্র স্বপ্নেশ্বর 'শাণ্ডিল্যসূত্রে'র টীকাকার।

শাণ্ডিল্য মুনি ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" স্বপ্নেশ্বর টীকায় বলিয়াছেন —"পরমেশ্বরবিষয়কান্তঃকরণবৃত্তি বিশেষ এব ভক্তিঃ।"

একজন উপকার করিলে তাঁহার প্রতি যে ভক্তি হয় সে ভক্তি ভক্তি নয়। যখন মনের মালিন্যাদি নিরস্ত হয় তখন ভগবানের প্রতি অনুরাগ মাত্রেই মুক্তি হয়, যথা গোপীদের হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে আছে—

"তচ্চিন্তা বিপুলাহলাদ ক্ষীণাপুণ্যচয়া সতী।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখ বিলীনাশেষপাতকঃ।।
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা।।"

পরানুরাগ হইতেই গোপীদিগের মুক্তি হইয়া গেল।

'শাণ্ডিল্যসূত্র' ও স্বপ্নেশ্বরের টীকায় ভক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভেদ কী, সেটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আছে যাঁহার জীবব্রহ্মে ভেদ আছে মনে করেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের মতো ঐশ্বর্যবিশিষ্ট পদার্থের উপর ভক্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের কল্পনাকে মিথ্যা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা শুদ্ধ চিদাত্মাকেই ভক্তির বিষয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু শাণ্ডিল্য মুনি উভয়কেই ভক্তির বিষয় বলিয়া মনে করেন। যেরূপেই হউক, এই ভক্তিসূত্রে ঈশ্বর ভিন্ন অন্যত্র পরাভক্তি হইতে পারে একথা স্বীকার করেন না। সুতরাং ইঁহার মতে বৌদ্ধেরা যখন ঈশ্বর মানে না, আত্মাও মানে না তখন বৌদ্ধধর্মে ভক্তি থাকা অসম্ভব। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি, বৌদ্ধধর্মেও ভক্তির প্রভাব খুব হইয়াছিল এবং এখনো খুব আছে, তবে ভক্তির লক্ষণ দু জায়গায় স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে অথবা 'শাণ্ডিল্যসূত্রে' ঈশ্বর শব্দে বুদ্ধকেও মিলাইয়া লইতে হইবে।

CENTRAL LIBRARY

এ স্থলে আমরা আমাদের ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেনের একটি পদ উদ্ধার করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন—

"সকলের সার ভক্তি—মুক্তি তার দাসী।।"

অনেক ভক্ত মুক্তি চানই না। তাঁহারা বলেন, আমরা শিবের গণ হইয়া থাকিব, আমরা বিষ্ণুলোকে বিষ্ণু-সামীপ্য, বিষ্ণু-সালোক্য ও বিষ্ণুসারূপ্য লইয়াই খুশি থাকিব, নির্বাণ মুক্তি আমাদের দরকার নাই। অনেক বৌদ্ধ ভক্তিই প্রার্থনা করেন—অনুপধিশেষ নির্বাণও তাঁহারা চাহেন না। বুদ্ধভক্তি তাহাদিগকে জীবের মুক্তি দিতে শিখাইয়াছে। যতক্ষণ একটি প্রাণীও অমুক্ত থাকিবে ততক্ষণ তাঁহারা নির্বাণ চাহেন না। অতএব রামচন্দ্র কবিভারতী বলিয়াছেন—

"উপপতিমসতীব চিত্তবৃত্তিঃ
ব্রজতি ভবন্তমপাস্য পঞ্চকামম্।
অপিচ বিষয়িণো ন মোক্ষসিদ্ধিঃ
কিমু করবাণি মুনীন্দ্র দেহি দাস্যম্।।"৩৫।।

"স ভবতি মতিমান্ স না কুলীনঃ।
স চ গুণবান্ স চ কীর্ত্তিমান স সুরঃ।
স জগতি মহিতঃ সুখী স এব
ত্বয়ি জিন যস্য সুনিশ্চলাস্তি ভক্তিঃ।।"৫৭।।

आचार्यमनीषि-हरप्रसादशास्त्री स्मरणे

दीपक घोष

प्राचीनप्राच्यविद्या युगयुगसुचिता भारतीयत्वमूर्त्तौ
कालेऽनादौ स्फुटात्मा कुसुमितमुकुला पूतचिन्मृत्तिकायाम् ।
वेदप्राणा सुसिक्ता विबुधजनगणैः संस्कृतप्राकृताद्यैः
भाराक्रान्ता समुद्या फलधनविद्या भारते भारतेऽस्मिन् ॥१॥

सेयं विद्या सुवर्णोज्ज्वलकरनिकिरा शाश्वती भारतीया
प्रास्तं याति क हंहो नभसि विधिवशाद् भारते वङ्गदेशे ।
काले काले विवर्णा विलयपथपदा वङ्गियास्तद् विमूढा
आशाच्छन्ना तमोभिर्घनघनसदृशैर्मार्गरोधः पुरस्तात् ॥२॥

अर्वाचीना प्रतीच्या चलचलचरणा भिन्नरूपाऽपरैका
विद्या स्थानं विलिप्सुर्नवनवविषया चाकचिक्याऽभिनूतना ।
प्राञ्चि प्रान्ते विकीर्णा वियति बहुतरं भारते वङ्गभूमे-
राविर्भूता युगान्तं रचयति किमु वा दण्डिनी राजवेशा ॥३॥

यात्येकतोऽस्तशिखरं किल पूर्वविद्या
विद्यैकतः समुदितः किल पश्चिमान्या ।
तेजोयुगस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्या-
माविष्कृतं नवयुगं नववङ्गभाले ॥४॥

वङ्गस्य भाग्यगगनं परिभासयन्तो
दुर्मेयशक्तिपुरुषाः प्रतिभाप्रदीप्त्या ।
उत्तोलितोर्द्धपरिघाऽभयदद्विबाहू
ये केचनोदयमिता युगसन्धिकाले ॥५॥

तेषां भवानेकतमः सुदुर्लभः
समं चलिष्णू भवतो द्विबाहू ।
प्राच्या प्रतीच्या च समं मनीषा
कविर्मनीषी नवसव्यसाची ॥६॥

BCU 4112

शास्त्रे सुशाणितधियो वयमेव नान्ये
काव्ये सुकोमलधियो वयमेव नान्ये ।
नूनं कठोरकुलिशाः सुकुमारपुष्पा
वङ्गे वयं नवतया भवता प्रपन्नम् ॥७॥

नास्तिक्यबौद्धेष्वपि दर्शनेषु समं भवान् सागरपारयातः ।
सर्वं समं संस्कृतपालिशास्त्रं हरप्रसादाद् हरति स्वधियि ॥८॥

प्राचीनराशीकृतपुस्तिकासु या मुद्रिता या न च मुद्रिता अपि ।
सनातनी धीर्भवतोऽखिलासु स्वच्छन्दतः क्रीडति सव्यसाचिन् ॥९॥

विद्यावंशे भारते वङ्गभूमौ दीप्तो दीपः प्राक्तनानामृषीणाम् ।
अम्लानास्तां दीपधारोत्तरेषु धन्यो धन्यो मातृभूमेः सुपुत्रः ॥१०॥

पूर्वं समाविर्भवतीह वङ्गे
सार्धैकयुक्ताच् छतवर्षकालात् ।
शास्त्री मनीषी स हरप्रसादः
श्रद्धाञ्जलिं स्वीकुरुतां विनम्रम् ॥११॥

GS5744

CENTRAL LIBRARY

MAHĀMAHOPĀDHYĀY HARAPRASĀD SHĀSTRĪ

(06.12.1853 - 07.11.1931)

Sukomal Chaudhuri

Sadese pujjate rājā paṇḍito sabbattha pujjate. Amhākaṁ "Haraprasad Shastri" (ito paraṁ 'Harapasādo' ti nāmena imasmiṁ pabandhe pakāsito bhavissati) pi attano bahussutatāya ca visiṭṭhapaññatāya kāraṇā na kevalaṁ Baṅgabhāsābhāsīnaṁ santike api tu nikhile visse Sugata-sattha-visāradaṁ santike saraṇīyo varaṇīyo pūjanīyo ca ahosi. āyatiṁ ca dīgharattaṁ vissavandita-paṇḍitānaṁ hadayesu tassa āsanaṁ samalaṅkato bhavissatī it natthi sandehassa avakāso. Tassa Ñāṇagarimāya ca bahussutatāya phalaṁ amhehi laddhaṁ nānārūpeṇa ca nānārasena. 'Sanskrit' - sāhiccuyyānato paṇītāni pupphāni uccinitvā Baṅgabhāsāya sarasā anuvādā katā; sarasa-apadāna-upākhyānādīni suractitāni; sarasa-sāvalīla-rītiṁ anucaritvā itihāsa-sāhicca-Bhāratatattādi-visayesu bahūni rammāni lekhanāni sulikhitāni. Etassa mahādesassa visesato Buddhakālīna-Bhārata-mahādesassa itihāsa-dhamma-sabbhatādiṁ adhikicca mahagghāni upādānāni saṁgayha tena Baṅgabhāsāya pakāsitāni. Yasmiṁ dese Buddhasāsanassa udayo tattheva vilutta-vinaṭṭha-Buddhavacanānaṁ punarujjīvane "Doctor-Rajendrala-Mitra"-mahābhāgānaṁ antevāsirūpeṇa uttarasūrirūpeṇa ca tassa avadānaṁ sakabhāgadānaṁ ativisiṭṭhaṁ anaññasādhāraṇaṁ ahosī ti paṇḍitehi punappunaṁ vuttaṁ. Asmiṁ visaye Paṇḍita-Rājendralāla-mitra-mahābhāgānaṁ pacchā tass'eva nāmaṁ Bhāratetihāse suvaṇṇakkhareṇa likhitaṁ bhavissati.

1853-ti Kiṭṭha-saṁvaccharassa antima-māsassa chaṭṭha-divase Baṅgadesassa Yasohara-zilāya 'Naladāṅgā'-ti nāmadheyassa padesassa kulīna-brāhmaṇa-vaṁse jāto amhākaṁ Harapasādo. Yāva satta-purisayugo kulīno tassa vaṁso. 'Abhiññāta-Rājendralāla-Vidyālaṅkāra'-mahodayassa suvisuddhe mahākulīnavaṁse jāto ayaṁ medhāvī. Tadānīntanakāle Yasohararajjassa rañño sabhāpaṇḍito āsi Rājendralāla-vidyālaṅkāro. Tato paraṁ vaṁsānukkamena tassa vaṁso paṇḍitavaṁso'ti vissuto ahosi. Harapasādassa papitāmaho 'Māṇikya-tarkabhūsano' ti nāmadheyo paṇḍito Palāsi-yuddhassa (1757 A.D.) pacchā Khulnā-zilāya Kumīra-gāmassa bhaddāsanaṁ vissajjitvā Kalikātā-nagarassa 38-K.M.-uttaradisāyaṁ Naihāti-nagare vāsaṁ kappesi. Tassa bahussutattā Yasohara-Khulnā-janapadānaṁ Dāntiyā-Nūrnagar-Sapparāja-purassa bhūmisāmino tassa bahūni brahmottara-sāpateyyāni adaṁsu. Tathāpi sabbaṁ vissajjitvā saparivāro so paṇḍito Naihātinagaraṁ āgamma vāsaṁ kappetuṁ ārabhi. Tassa dūradassitāya kāraṇā tassa uttarapurisā Kalikātā-nagarassa uccatara-sikkhā-sabbhatāya samīpaṁ āgatā. Naihātinagare Ṭolābhidheyaṁ sikkhālayaṁ patiṭṭhitvā so dukkhena kālātipātaṁ karoti. Api tu tassa 'Navyanyāya-Smritiśāstra' iti vijjānaṁ paṭhana-pāṭhane tassa asādhāraṇaṁ nepuññaṁ disvā Hālisaharassa Sāvaṇṇo 'Santosha-Ray-Chaudhuri'-mahodayo mahārājo 'Krishnachandra-Ray'-mahodayo ca tassa brahmottaraṁ bhūdānaṁ adaṁsu. Tato laddhena āyena so paññāsa-antevāsīnaṁ posetvā tesaṁ 'Navyanyāya-Smritiśāstra'-visayesu gambhīraṁ sikkhaṁ adāsi.

Acireṇa so 'Asiatic Society'-iti-vissutasamitiyā patiṭṭhāpakassa vicārapati-Sir-William-Jones (1746-94)-mahābhāgānaṁ pītibhājano ahosi. Tassa cha puttāpi pārivārika-ajjhayana-ajjhāyanādi-kammāni sammā anupālesuṁ. Tassa tatiyo putto 'Śrīnātha-tarkālaṅkāra'-mahodayo gambhīra-medhāsampanno āsi, api tu kevalaṁ tiṁsatimatta-vayakkāle corahatthe tassa akālamaccu ahosi. Tassa putto 'Rāmakamala-Nyāyaratna'-mahodayo vaṁse seṭṭhapaṇḍitarūpeṇa disāpāmokkho ahosi. Rāmakamalassā pi cha yeva puttā, seyyathīdam - Nandakumāro, Raghunātho, Yadunātho, Hemanātho, Sarat-nātho (= Harapasādo), Meghanātho ca. Harapasādassa aggajo 'Nandakumāra-Nyāyacuñcu-Tarkaratna (1835-62)-mahodayo pitāmahassa 'Rāmamāṇikya-Vidyālaṅkāra'-mahodayassa antevāsī hutvā tassa asādhāraṇa-sikkhāguṇena acireṇa yuvāvayasi yeva 'Paṇḍito' ti abhidhaṁ pāpuṇi. Kevalaṁ ūṇavīsativayasi so 'Śrīrāma-Śiromaṇi'-nāmadheyaṁ disāpāmokkhaṁ paṇḍitaṁ takkayuddhe parābhūtaṁ katvā tadānīntana-paṇḍita-samāje patiṭṭhito ahosi. Tassa guṇa-surabhinā ākaḍḍhito 'Īśvarachandra-Vidyāsāgaro (1820-91)' taṁ 'Sanskrita-College' iti-vissutassa mahāvijjālayassa ācariyapadena varesi (1856). Pacchā so Vidyāsāgara-mahābhāgena Kāndī-vijjālayassa padhāna-paṇḍita-pade niyutto ahosi. Paṭhamavayasi Harapasādassa sikkhā Kāndī-vijjālaye yeva āraddhā. Tadā tassa 'Śaratnātha Bhattāchārya' ti nāmaṁ ahosi. Ekadivasaṁ so durārogya-mahābyādhinā pīḷito hutvā Śiva-pasādena byādhimutto ahosi. Tato paraṁ tassa Harapasādo to nāmaṁ dinnaṁ. Aggaje kālaṁ gate Harapasādo Kāndīnagare ṭhātuṁ na sakkhi. 1866-iti Kiṭṭhavasse Vidyāsāgara-mahodayo Harapasādaṁ attano antevāsi-nivāse ānetva 'Sanskrit'-mahavijjālaye pavesitaṁ akāsi. Evaṁ Harapasādo Vidyāsāgara-mahodayassa sadā-sāhacariyaṁ laddhā upakato jāto. Harapasādassa manovikāse sāhiccaruciyaṁ ñāṇadiṭṭhimhi ca Vidyāsāgara-mahābhāgānaṁ ānubhāvaṁ asādhāraṇaṁ āsi. 1866-Kiṭṭhavassato yāva 1877-Kiṭṭhavasso Harapasādo 'Saṇskrita'-mahāvijjālayassa antevāsī hutvā 'Prasannakumāra Sarvādhikāri (1825-87)' ca 'Maheshchandra Nyāyaratno (1836-1906)' ca 'Rāmanārāyaṇa Tarkaratno (1816-80)'-mahābhāgānaṁ santike Āṅgalabhāsāya ca Saṇskrita-bhāsāya ca aparimeyaṁ nepuññaṁ labhi. 'Rāmanārāyaṇa Tarkaratna'-mahodayassa antevāsī hutvā so Kālidāsa-visaye paripuṇṇaṁ ñāṇaṁ pāpuṇi. Catuvīsativayasi Harapasādo 'Rameshchandra Datta-Rajendralāla Mitra'- ti mahābhāgānaṁ antaraṅgo hutvā Bhārata-vijjāya anusīlane attānaṁ niyojesi. Etassa phalassutirūpeṇa acireṇa 'Magadhan Literature'-iti gantho 'Gazetteer Literature in Sanskrit'-iccādi-nibandhā tena pakāsitā. Baṅgabhāsāyaṁ 'Ṛgveda'-nāma-ganthassa pakāsane (1885-87) 'Rameshchandra Datta'-mahodayo Harapasādassa nirantara-sahāyataṁ pāpuṇi. 'Vaṅgadarśana'-iti-tadānīntana-vissuta-sāmayikiyaṁ pakāsite (1284-Baṅgasaṁvaccharassa Phussamāse) 'Veda-O-Vedavyākhyā'-iti nibandhe Harapasādo Vedassa aparuseyatta-vādassa yuttvicāreṇa khaṇḍanaṁ akāsi.

'Rājendralāla Mitra'-mahodayo Harapasādaṁ 'Asiatic Society'-ti gavesaṇa-samitiyā aṅgībhūtaṁ katvā Bhārata-vijjā-visaye gavesaṇāya taṁ nipuṇaṁ akāsi. 'Asiatic Society'-ti-samitiyā saha tassa saṁyoge tassa paṭibhāṇassa vikāsane mahā-sahāyako ahosi. Pacchā so etassa samitiyā

CENTRAL LIBRARY

sabhāpati-rūpena (1919-21) uccinito ahosi. Yāva cha saṁvaccharāṇi so Bhāratavijjā-gavesanāya nāyakattaṁ adāsi. Asmiṁ samaye so 'Bibliotheca Indica'-ti ganthamālāya 'Sanskrita'-vibhāgassa tattāvadhāyako ahosi. 'Rājendralāla Mitra'-mahodayassa maccuno pacchā so "Operations in Search of Sanskrit Manuscripts"-iti- gavesaṇāya sañcālakapade abhisitto ahosi (1891).

Ādhunike kāle 'Rājendralāla Mitra'-mahodayo Buddhavacanassa sāgaramanthane pubbaṅgamo ahosi. Amhākaṁ Bhāratabhūmi Buddhassa Bhagavato jātabhūmi, api tu kāle kāle sabbaṁ Buddhavacanaṁ vinaṭṭham viluttaṁ jātaṁ. Bhagavato Buddhassa nāmaṁ pi imasmiṁ dese vissaritaṁ jātaṁ. 'Rājendralāla Mitra'-mahodayo Nepālaraṭṭhato Buddhavacanavisaye 'Sanskrita'-bhāsāyaṁ likhitā hatthalipyādayo saṅgahaṁ katvā ānetvā Harapasādassa sahāyatāya 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882)'-iti ganthaṁ pakāsetvā asmiṁ dese punarapi Buddhavacanavisaye Bhāratavāsīnaṁ cakkhūni ummīlesi. Tato paraṁ viluttānaṁ Buddhavacanānaṁ punarujjīvane dese-videse mahossāhaṁ sañjātaṁ. 'Rabiīndranātha Ṭhākura'-mahodayo pi etasmā ganthato visayāni saṅgayha bahū kavitā-nāṭyaganthādayo viracitvā vissavissuto ahosi. Baṅgaraṭṭhe aññepi sudhijanā Buddhavacanaṁ ārabbha racanā racayitvā na kevalaṁ Baṅgabhāsāya siriṁ vaḍḍhesuṁ, api tu Baṅgasāhiccam tathā Bhāratīya-sāhiccaṁ pi samunnataṁ akaṁsu.

Bhārate dese yattha tattha vikkhittānaṁ 'Sanskrita'-hatthalikhita-ganthānaṁ saṅgahe ca pakāsane ca 'Rājendralāla'-mahodayānaṁ avadānam pi mahantaṁ sampādesi. Harapasādo tassa antevasirūpeṇa imesu kammesu attānaṁ niyyojetvā sakiya-paṭibhānaṁ vitthāretum samattho ahosi. Tassa 'Descriptive Catalogue'-iccabhidheyānaṁ ganthānaṁ sudīgha-bhūmikānaṁ saṅgahe kate 'Sanskrita'-ganthānaṁ ca 'Sanskrita'-sāhiccānaṁ visaye mahanto itihāso amhehi labbhate. Tatheva Buddhavacana-samiddhesu hatthalikhita-ganthesu Harapasādassa pavesanaṁ pi 'Rājendralāla'-mahodayasseva avadānam. Sanskrita-Pāli-Prākrita-Apabhraṁśa-Avahaṭṭha-Baṅgabhāsā-Hindi-Rājasthāni-Gujarāti-Maithiliccādīsu bhāsāsu pāraṅgato mahāpañño Harapasādo Buddhavacana-samiddha-hatthalipyādayo uddharitva pakāsetva ca Bhāratatatta-tathā-Buddhavacana-visaye sabbesaṁ manoyogaṁ samākaḍḍhi. Etesaṁ paṭhana-pāṭhane ca yugapattanaṁ akāsi. Tena ussāhito hutvā tassa catuttho putto 'Doctor Benayatosha Bhattachārya'-mahodayo Bauddha-Tantra-visayaka-hatthalipyādayo uddharitvā 'Sādhanamālā'-ti amūlya-ganthaṁ pakāsesi. "Hāzār vacharer Purāṇa bāṅglā bhāsāy Bauddha Gān-O-Dohā"-ti nibandha-racanā Harapasādassa anaññasādhāraṇā kitti. Nepālaraṭṭhato mahākavissa Assaghosassa "Saundarananda-kāvyam", Sandhyākara Nandiyā "Rāmacaritaṁ", Vidyāpatissa "Kīrtilatā"-ti tinnaṁ ganthānaṁ hatthalipyādīnaṁ uddharaṇaṃ 'Sanskrit'-sāhiccassa itihāse Harapasādassa mahantam avadānaṁ ghosayati. "Kīrtilatā" Avahaṭṭha-bhāsāya likhitā. Etaṁ uddharitvā Harapasādena padassitaṁ yam Avahaṭṭha-bhāsā na kevalaṁ Maithili-bhāsāya, api tu Baṅgabhāsāya pi jananī-sarūpā.

"Kānchanamālā"-"Bener Meye"-iccādi-racanā Harapasādassa bahumukhipaṭibhānaṁ nidassanaṁ. Evaṁ 'Sanskrit'-bhāsāya likhitā

hatthalipyādayo adhikicca Harapasādo Baṅgabhāsāyaṁ satādhike nibandhe racayitvā Baṅgabhāsāya siriṁ saṁvaḍḍhesi.

Bhārate Vasse Buddha-dhammassa utthānaṁ patanaṁ ca, etassa mahādesassa janasamājesu Buddha-dhammassa dīgharattaṁ pabhāvassa sarupudghāṭane Harapasādo attano jīvitassa adhikaṁ kālaṁ vītināmesi. Amhākaṁ janajīvane Buddha-dhammassa pabhāvavisaye so'va sabbhapaṭhamaṁ garuttaṁ datvā Baṅgabhāsāyaṁ nibandhādayo racayitvā imasmiṁ dese vinaṭṭhassa Buddhadhammassa punarabhudayassa sūcanam kāresi. Tasseva dassitaṁ maggaṁ anusaritvā āyatim bahū paṇḍitā Āṅgala-Baṅga-Hindi-bhāsāsu Buddhavacanāni pakāsetvā dese-videse Buddhadhammassa punajjāgaraṇe hatthaṁ pasāresuṁ.

Taruṇe vayasi "Rājā-Rājendralāla"-mahābhāgānaṁ sahayogitāya 'Asiatic Society'-ti-samitiyaṁ Harapasādo Bhāratatattavisaye gavesaṇāya yaṁ padhānaṁ padhānesi tassa pariṇataṁ ānisaṁsaṁ āyatike kāle "Vaṅgīya-Sāhitya-Parishad"-iti samitiyā pariposaṇe satejakaraṇe ca attānam niyyojesi. Baṅgabhāsāya thulla-culla-patta-pattikāsu Harapasādassa nibandhāvalī sādareṇa pakāsitā. "Baṅgavāsī"-"Bhāratvāsī"-iccādi-patta-pattikāsu tassa mahagghā racanā pakāsitā.

Harapasādassa sārassata-sādhanāya ca Bhāratīya-sabbhatāya sarupudghāṭane mahāvadānam sampaṭicchituṁ tadānīntana-British-sāsako Harapasādam "C.I.E." (Companion of the Indian Empire)-iti-upādhinā vibhūsitaṁ akāsi. Mahārājamahesi-Victoriyāya paññāsatama-rajjābhisekaṁ uddissa pavattitena "Mahāmahopādhyāya"-ti-upādhinā pi so bhūsito ahosi (1898 A.D.).

1931-Kiṭṭha-samvaccharassa ekādasamāsassa sattama-divase Mahāmahopādhyāyo Harapasādo saggaparāyaṇo ahosi. Tasmiṁ kālaṁ gate na kevalaṁ Baṅgadesassa api tu Bhāratassa apuraṇīyā hāni sañjātā.

CENTRAL LIBRARY

বুদ্ধচর্চায় যুগস্রষ্টা হরপ্রসাদ

বেলা ভট্টাচার্য

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম ইংরাজী ১৮৫৩ সালে। অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শ বছর আগে। তাঁর এই দেড়শততম জন্মবার্ষিকীতে আমরা তাঁর স্মরণে কিছু লেখার তাগিদ ভীষণভাবে অনুভব করছি। প্রয়াত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের স্মৃতি তর্পণকালে আমরা সচরাচর ভাবাবেগের দ্বারা অনেকটাই পরিচালিত হয়ে থাকি ফলে তাঁদের কর্মধারার সম্যক বিশ্লেষণ প্রায়শই ঠিকভাবে হয়ে ওঠে না। বর্তমান রচনাটিতে তাঁর সাহিত্য, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর অসাধারণ জ্ঞানলিপ্সা প্রভৃতি বিষয়গুলির সেভাবে আলোচনায় না গিয়ে বুদ্ধচর্চায় তাঁর বিশেষ অবদানের কথাই বিশ্লেষণাত্মক করার প্রয়াসে উদ্যোগী হয়েছি। অবশ্য তা করার সময় বিষয় বহির্ভূত কিছু আলোচনা যেগুলি তাঁর চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্য তা স্বাভাবিকভাবে এই লেখার মধ্যে এসে পড়বে।

হরপ্রসাদ একটি দুর্লভ ব্যক্তিত্ব। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বৌদ্ধচর্চা, প্রত্নতত্ত্ব, নিবন্ধ-রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস বিচরণ। তাঁর রচনাশৈলী বিস্ময়করভাবে সমুজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান। বস্তুতঃ এসবের ক্ষেত্রে বরং বলা যেতে পারে তদানীন্তন বাংলাদেশে চিন্তা ও মানসিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভাবলে নিঃশব্দে একটি বিপ্লব ঘটান।

তাঁর বিষয়ে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি বলেছেন, "প্রাচীন আলঙ্কারিক ও সাহিত্যিক রাজশেখর দুই প্রকারের প্রতিভার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—'কারয়িত্রী প্রতিভা' এবং 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা'। ইহার ইংরেজী অনুবাদ করা যায় Crecative Genius এবং Reflective or Critical Genius অন্যভাবে এই দুই প্রকারের প্রতিভাকে বলা যায় যে, একদিকে রসস্রষ্টা ও অন্যদিকে রসিক বা ভাবুক এবং তথ্যনির্দেশক। শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাতে যেখানে তিনি সাহিত্য রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার রচনা হইয়াছে Literature of Power—অর্থাৎ মানুষের মনকে উদ্বেলিত করিতে পারে, রসাসিক্ত করিতে পারে, উচ্চচিন্তায় প্রণোদিত করিতে পারে এমন সুসাহিত্য; এবং অন্যদিকে তাঁহার অন্য রচনা হইতেছে Literature of Information বা তথ্য নির্ণায়ক ঐতিহাসিক অথবা সমালোচনা সাহিত্য। একাধারে এই দুই প্রকার বৃত্তির এইরূপ অদ্ভুত বিকাশ জগতে সুলভ নহে।"[১]

এরপর হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলেছেন সেই প্রসঙ্গে আসার জন্য চেষ্টা করব। তাঁর মতে বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" এবং জ্ঞানই মুক্তির উপায়।[২] এই দুটি মতই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র। তাঁর মতে বুদ্ধদেব পূর্বাঞ্চলে এই দুইটি মত প্রচারে প্রবৃত্ত হন। পূর্বাঞ্চলে অব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক থাকায় তাঁর প্রচার সার্থকরূপ গ্রহণ করে। সেই সময়ের পূর্বাঞ্চলের খ্যাতনামা জনপদগুলি যথা মগধ, মিথিলা, কৌশল, কাশীর নৃপতিগণ তাঁর দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও রীতি অনুযায়ী জনসাধারণও রাজধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। হরপ্রসাদ এই মত পোষণ করেন যে সমাজের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের ধর্ম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় তারা রাজধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের অনুগামী হন। যাঁরা এই নতুন ধর্মের বিরুদ্ধে যান তাঁদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম থাকার ফলে তাঁরা নতুনধর্মের বিরোধিতা সেভাবে করতে পারেন নি এবং যেটুকু বিরোধিতা দেখা যায় অচীরে তার সমাপ্তি ঘটে। এমন কি ঐ বিরুদ্ধবাদীরাও অনেকে কালক্রমে নতুন ধর্মকে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ বলেছেন

এটি ভ্রান্ত ধারণা যে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকলস্তরে তা বিস্তার লাভ করে। এমন কি সম্রাট অশোকের ঐকান্তিক প্রয়াস সত্ত্বেও সমগ্র মগধ সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম সর্বজনগৃহীত হয়েছিল কিনা তা নিয়ে হরপ্রসাদ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি আরো মনে করেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল এরকম চিন্তা অমূলক। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্মকে অবশ্যই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন কিন্তু যেহেতু বৌদ্ধধর্ম রাজগণের আনুকূল্য লাভ করে সেহেতু এই ঘৃণা ও অবজ্ঞা সেভাবে প্রতিফলিত হতে পারে নি। হরপ্রসাদের দৃঢ় বিশ্বাস বুদ্ধিবিপ্লবের একটি সার্থক পরিণতি বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও বিকাশ। তাঁর কথায়, "অনেকে মনে করেন, বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন না, তিনিও গৌতমাদির ন্যায় কতকগুলি দার্শনিক মত প্রচার করেন মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন শত বৎসর পরে বৌদ্ধমত ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মত অনেক পরিমাণে সত্য হইবার সম্ভাবনা। কারণ, অশোক রাজার পূর্বে আমরা বৌদ্ধদের কথা বড় একটা শুনিতে পাই না। তাঁহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক্রিয়া প্রকৃষ্টরূপে আরম্ভ হয়।"[৩]

মগধ সাম্রাজ্যের উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করার সময় হরপ্রসাদ এইরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজাগণই ব্রাহ্মণের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁদের সাধারণ বৈরূপ্য ছিল ব্রাহ্মণগণের প্রতি এবং তার ফলে ঐ সমস্ত নৃপতিদের মধ্যে একটি ঐক্যের ভাব গড়ে ওঠে। তাঁর মতে রাজকীয় ঐক্যই মগধ সাম্রাজ্য গঠনে মুখ্য ভূমিকা নেয় এবং অনুরূপভাবে ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে যে একতা দেখা দেয় তারই ফলশ্রুতি বৌদ্ধধর্ম।

কি কি পন্থা বা উপায় অবলম্বন করে বৌদ্ধগণ ধর্মের প্রচারে প্রবৃত্ত হন, হরপ্রসাদ সেই প্রসঙ্গে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের গরিমাদীপ্ত সময়টিতে যখন উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মতগুলি আত্মপ্রকাশ করে তখন বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব। বুদ্ধের অতিমানবীয় ক্ষমতা, প্রতিভা, সর্বজীবের প্রতি করুণাবোধ জনগণকে আকৃষ্ট করে। তারা বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করে। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী বৌদ্ধগণ মুখ্যতঃ তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। প্রথম দলটির সদস্যগণ মঠবাসী ছিল, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ভিক্ষার উপর নির্ভরশীল ছিল ও মঠে বুদ্ধত্বলাভের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ধ্যানাদিতে মগ্ন থাকত। বৌদ্ধধর্মে জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠার পরিমাণ অনুযায়ী ভিক্ষু, অর্হত ও বোধিসত্ত্ব ইত্যাদির শ্রেণী বিন্যাস ছিল। গভীর ও জটিল ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলির আলোচনা ও মীমাংসা মঠের মধ্যেই করা হত। দ্বিতীয় দলটি বিষয়ী ব্যক্তিগণের নিকট ধর্ম ধর্মপ্রচারে রত থাকত। তাদের বলা হয় শ্রাবক অর্থাৎ যারা ধর্মীয় নীতি, বিনয় প্রভৃতি বিষয়ে শোনাত এবং তৃতীয় দলটি ছিল বিষয়ী ব্যক্তিগণ। বিষয়-আশয় বৌদ্ধধর্মে ব্রাত্য বৃত্তির পরিচয় বহন করে। কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাণ বা বুদ্ধত্বলাভের জন্য রত থাকলে বাস্তব জীবন অচল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সুতরাং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সংসারধর্ম করুক—একথা মেনে নিতেই হল শুধুমাত্র শর্ত থাকল যেটুকু ধর্মশিক্ষালাভ করা যায় সেটুকু তারা করুক। সুতরাং বলা যেতে পারে এটি তৃতীয় দলটির সদস্যগণ ইতর সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারে যত্নশীল ছিল ও এরফলে বহুব্যক্তি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়।[৪]

বৌদ্ধঘন্টা ও তাম্রমুকুট সম্পর্কে বলতে গিয়ে হরপ্রসাদ জানান নেপালের জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশ হিন্দু ও বাকী অর্দ্ধাংশ বৌদ্ধ এবং যেখানে বৌদ্ধরা দাবী করে তারাও হিন্দু কিন্তু বোধমার্গী। বৌদ্ধদের এভাবে তিনভাবে বিভক্ত করা যায়। সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ গোষ্ঠীর নাম বান্‌রা। এদের মধ্যে ধর্মযাজক এবং পুরোহিতগণ আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীটি ব্যবসাবাণিজ্যে রত। তারা অনেক সময় হিন্দুদের দ্বারাও ক্রিয়াকর্ম করায়। বান্‌রাগণ বিহারে বসবাস করে সুতরাং বিহারগুলিই তাদের গৃহ। বান্‌রা নটি জাতিতে বিভক্ত। এদের মধ্যে সাতটি জাতি ধর্মকর্মে যুক্ত নয়। অন্যান্য নানারকম কাজে রত। বাকী দুটির নাম ভিক্ষু এবং গুভাজু। প্রথমোক্তরা পূজা, মন্ত্রপাঠ, হোম ইত্যাদি কাজ করতে

পারে না। গুভাজুরা এসব কাজ করে। বান্‌রাগণ কিন্তু জাতিরূপে অভিন্ন। তাদের মধ্যে বিবাহ ইত্যাদি হতে পারে। এদের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ প্রচলিত। পঞ্চবর্ষীয় বালক মূল বিহারের প্রবীণতম বান্‌রার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে এবং এই দীক্ষা ভিক্ষুর মতই। দীক্ষাগ্রহণ এসব ক্ষেত্রে একবারই হয়। কিন্তু যেসব গুভাজু ধর্মীয় যাজক হতে চায় তাদের দ্বিতীয়বার দীক্ষা নিতে হয় বয়স যখন ১৭/১৮ বৎসর। অবশ্য কেউ যদি ইতিমধ্যে পিতৃত্ব অর্জন করে তাহলে তাকে এই দীক্ষা দেওয়া হয় না। দীক্ষার আগে সন্তান হলে গুভাজু পতিত বলে গণ্য হয় এবং সেই বংশের কেউ আর গুভাজু হতে পারে না। ভিক্ষু হতে থাকতে হয়। দীক্ষায় পঞ্চাভিষেকের প্রয়োজন হয়। যথা মুকুটাভিষেক, বজ্রাভিষেক, পুস্তকাভিষেক, ঘন্টাভিষেক এবং সুরাভিষেক। এসবের পর এই পঞ্চজাতীয় বস্তু ব্যবহারের যোগ্যতা হলে তাকে বলে বজ্রাচার্য।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে হরপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন এইধর্মে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা অন্য যে কোন ধর্মের লোকের থেকে অধিক। ভারতবর্ষের বৌদ্ধগণ হিন্দুদের বেশ কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করেন এবং অনেকস্থানে বৌদ্ধধর্ম কিঞ্চিৎ বিকৃতরূপে মানা হয়। উড়িষ্যার গরজাত মহলের মধ্যে অনেকগুলি স্থানে বৌদ্ধমত অনুসরণ করা হয়। ধর্মঠাকুরের পূজারীগণ যে বৌদ্ধ তা অনস্বীকার্য।

বিঠোবা ও বিল পূজিত হয় নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তিরূপে।[৫] বাংলাদেশে তন্ত্রশাস্ত্র বৌদ্ধদের কথাই স্মরণ করায়। যাঁরা বিশ্বাস করেন পঞ্চমশূন্যে তারা এবং ষষ্ঠ মহাশূন্যে কালিকা তারা অবিসংবাদিতরূপে বৌদ্ধ। কারণ হিন্দুগণ শূন্যবাদী নয়। এমন যে সব স্থানের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত তাদের মধ্যে তুর্কিয়ান, পারস্য, আফগানিস্থান, বেলুচিস্তান প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এসব স্থানে এক সময় বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এসব নিয়ে পূর্ণাংগ ইতিহাস রচিত হয় নি কারণ বৌদ্ধগণ ইতিহাস লেখা থেকে প্রায় নিবৃত্ত থেকেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে মুসলমান ঐতিহাসিকরাও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তেমন কিছু লেখেন নি। ওদন্তপুরী বিহারের ধংসের কথা তবকতিনাশিরি[৬] বলেছেন এবং তাঁর কথামত ঐ বিহারকে কেল্লা বলে মনে করা হয়েছিল। বিহারে অবস্থানকারী বৌদ্ধদের তাঁরা দেখলেন মস্তকমুণ্ডিত ও গৈরিকবস্ত্র পরিহিত অবস্থায়। মূলতঃ বৌদ্ধ ইতিহাস প্রণয়নে উদ্যোগ নেন ইউরোপের পণ্ডিতগণ ও তাঁদের পথ ধরে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ। কিন্তু সেসব ইতিহাস-লেখণ, হরপ্রসাদের মতে, যথাযথ হয় নি। ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ সিংহলে প্রথম বৌদ্ধধর্ম দেখতে পান এবং সেখানে পালি শিক্ষান্তে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তাঁদের অধিকাংশের মতে বৌদ্ধধর্মে নিছক কিছু নীতি স্থান পেয়েছে যথা এটি করা নিষিদ্ধ, ওটি করা অধর্মীয় ইত্যাদি। Brian Honghton Hodgson নেপালে গিয়ে দেখেন বৌদ্ধদর্শন গভীর একটি দর্শন এবং ইতিপূর্বে ইউরোপে যে সমস্ত দর্শনের চর্চা হয়েছিল তার অনেক আগেই অনুরূপ চর্চা হয়েছিল। বিশপ বিগাণ্ডেট ব্রহ্মদেশে গিয়ে দেখেন সেখানে বৌদ্ধদের মধ্যে পূজা অর্চনার প্রচলন আছে। এমন কি সেখানে কালীপূজা, হোমাদি কর্মও অনুষ্ঠিত হয়। চীনে বৌদ্ধধর্ম আর এক রূপ গ্রহণ করেছে। তারা আমিষ জাতীয় খাদ্যে এবং প্রাণীশিকারে অভ্যস্ত। জাপানে কিছু বৌদ্ধ আছেন যাঁরা দেবদেবীর উপাসক।[৭] এইভাবে বৌদ্ধধর্ম নানারূপে বিভিন্ন দেশে অনুসৃত। এই পদ্ধতি কিংবা ভূতপ্রেত উপাসনারূপে বর্তমান। অবশ্য বুদ্ধ প্রচারিত বিশুদ্ধরূপের বৌদ্ধধর্ম ও নাগার্জুন প্রবর্তিত পথ ও বহুস্থানে প্রচলিত। তাছাড়া ভাষাগত অসুবিধা তো ছিলই যারফলে সেভাবে ইতিহাস লেখা হয়নি। এ ব্যাপারে হরপ্রসাদ বলেছেন "বুদ্ধের রচনাগুলি তিনি কী ভাষায় বলিয়াছিলেন জানা যায় না। তাঁহার বাড়ি ছিল কোশলের উত্তরাংশে। তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন কোশলে ও মগধে। এই দুই দেশেরলোক বুঝিতে পারে এমন কোনো ভাষাতে তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই দেশেও আবার ভিন্ন

অঞ্চলের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বলেন নাই। যে সকল অতি প্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না সংস্কৃত, না-মাগধী, না-কোশলী, একরূপ মাঝামাঝি গোছের ভাষা। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন 'মিশ্র ভাষা'। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহারই নাম দিয়াছেন Mixed Sanskrit।[৮] 'বিমলপ্রভা'[৯] নামে নয় শতের এক পুঁথিতে আমরা দেখিলাম যে, তৎকালে নানা ভাষায় বুদ্ধের বচন লেখা হইয়াছিলে; মগধ দেশে মগধ ভাষায়, সিন্ধুদেশে সিন্ধু ভাষায়, বোট দেশে বোট ভাষায়, চীন দেশে চীন ভাষায়, মহাচীনে মহাচীন ভাষায়, পারস্য দেশে পারস্য ভাষায়, ব্রহ্ম দেশে ব্রহ্ম ভাষায়। আমরা জানি পারস্য দেশে মগের ধর্ম চলিত ছিল, অর্থাৎ সেখানকার লোক অগ্নি-উপাসক ও জরথ্রুসার[১০] শিষ্য ছিল। সে দেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ছিল, একথাই শুনি নাই। তাহাদের ভাষায় যে আবার বৌদ্ধবচনগুলি লিখিত হইয়াছিল সে খবরও এই নূতন। ব্রহ্ম দেশ কাহাকে বলে জানি না, রোম হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, 'বিমলপ্রভায়' বলে, উহা নীলা নদীর উত্তর। 'বিমলপ্রভা'য় আরো একটি নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়ও বুদ্ধদিগের অনেক সংগীত লেখা হইয়াছিল, এ খবর এ পর্যন্ত অতি অল্প লোকেই জানেন।"[১১]

বৌদ্ধ কাকে বলে এপ্রসঙ্গে হরপ্রসাদ জানান এ ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে। অনেকে বলেন গৃহত্যাগী ও বিহারবাসী তাঁরাই বৌদ্ধ। কোনও গৃহীকে বৌদ্ধ বলে স্বীকার করতে তারা নারাজ। আবার অনেকের মতে পঞ্চশীলের নীতিগুলি যাঁরা গ্রহণ করেন তারাই বৌদ্ধ। যে সকল লোক নেপাল তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের মতে সমস্ত পৃথিবীর লোকই বৌদ্ধ কারণ বোধিসত্ত্বকে জগৎ উদ্ধারে ব্রতী হতে হবে। লঙ্কার বৌদ্ধদের মত নিজেদের উদ্ধারের মধ্যেই সীমিত থাকলে চলবে না। হরপ্রসাদের মতে এই কারণেই নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধরা নিজেদের মহাযানী ও লঙ্কার বৌদ্ধদের হীনযানী বলে অভিহিত করেন। তিনি আরো বলেন যান শব্দটি ইংরাজী Vehicle অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। কারণ বৌদ্ধদের মধ্যে 'যান' শব্দটি পন্থা বা মতকে বোঝায়। মহাযানীদের প্রধান গ্রন্থটির নাম 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। এটির মর্মকথা করুণা অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী জগতকে করুণার দৃষ্টিতে দেখা। হরপ্রসাদ মনে করেন, শুভাকরগুপ্তের (বিক্রমশীল মহাবিহারের মহাচার্য অভয়াঙ্কর গুপ্তের ছাত্র) "আদিকর্ম রচনা"[১২] নামের বৌদ্ধদের স্মৃতিতে কাকে বৌদ্ধ বলে এটির মীমাংসা দেওয়া আছে। যে ত্রিশরণ বরণ করে নিয়েছে সেই বুদ্ধ। বহুপূর্বে ত্রিশরণ গমনের জন্য কোনও পুরোহিতের দরকার পড়ত না। নিজেরাই তা করতে পারত। পরবর্তী সময়ে অবশ্য পুরোহিত ত্রিশরণ গমনের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। 'হস্তসার' পুস্তকে ত্রিশরণ নেওয়ার জন্য ভিক্ষুই যথেষ্ট ছিল। 'বিমলাপ্রভায়' বলা হয়েছে সর্বাগ্রে ত্রিশরণ পরে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য এই জন্মেই লৌকিক ও লোকোত্তর সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। প্রসংগত উল্লেখ্য পিতা মাতা বৌদ্ধ হলেই কেউ বৌদ্ধ হয় না তাকে পৃথকভাবে ত্রিশরণ নিতে হবে।

বৌদ্ধধর্মের গুরু কে এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদের সংযোজন হচ্ছে প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য একজন সন্ন্যাসীর মাধ্যমে তা করা হত।

সন্ন্যাসী অর্থে এখানে ভিক্ষু। ভিক্ষুদের দলীয় নাম সংঘ। সুতরাং ভিক্ষুদের বাসস্থানের নাম সংঘারাম। সংঘারামে সাধারণতঃ একটি মন্দির থাকত যেটি বিহার নামে পরিচিত এবং বিহার থেকেই ভিক্ষুদের আশ্রমকেও বিহার নামে অভিহিত করা হয়। সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য কিছু কিছু পদ্ধতি মানা আবশ্যক ছিল। বিহারের প্রবীনতম বৃদ্ধ বা স্থবিরকে কয়েকটি প্রশ্ন শিক্ষানবিশের সামনে রাখতে হত এবং প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়ার পর পাঁচজন ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করা হত ঐ ব্যক্তিকে ভিক্ষুরূপে গ্রহণ করা যায় কি না। তিনবার জিজ্ঞাসার পরও যদি ভিক্ষুগণ চুপ করে

থাকতেন তাহলে ঐ ব্যক্তিকে সংঘে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হত এবং শিক্ষানবিশকে তার উপাধ্যায়ের কাছে সমর্পণ করা হত।

বুদ্ধদেব যখন নন্দকে প্রব্রজ্যার অধিকার দিয়েছিলেন তখন নন্দকে বৈদেহ মুণির কাছে সমর্পণ করা হয়। মহাকবি অশ্বঘোষের রচিত সৌন্দরনন্দ কাব্যটিতে নন্দ ও ঐমুণির সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে সম্পর্কটি খুবই আন্তরিক ছিল। মহাযানপন্থীরা উপাধ্যায়কে 'কল্যাণ মিত্র' নামে অভিহিত করত।

পরবর্তীকালে, যখন ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা ও পঠন-পাঠন দুরূহ বলে বিবেচিত বোধ হতে লাগল তখন মন্ত্রযানের আবির্ভাব ঘটল। মন্ত্রই সন্ন্যাসজীবনে মুখ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হল ও যে তিনটি শর্ত এব্যাপারে, আবশ্যিক বলে মনে করা হল তা হল 'গুরুপ্রসাদ' 'শিষ্যপ্রসাদ' ও 'মন্ত্রপ্রসাদ' অর্থাৎ গুরুকে ভক্তি করতে হবে, শিষ্যকে স্নেহ করতে হবে এবং মন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে চলতে হবে।

বজ্র যানের গুরু প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ বলেছেন "বজ্রযানে গুরু আরো বড়ো হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বজ্রধারী। এই যানের প্রধান কথা এই যে, দেবতাদিগের এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের বজ্রধর নামে একজন পুরোহিত হইলেন। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের উপর বজ্রসত্ত্ব নামে আর একজন বুদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে উহারা বুদ্ধগণের পুরোহিত বলিয়া মানিয়া থাকে। বজ্রসত্ত্ব কতকটা আদিবুদ্ধ বা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। এই মতের গুরুদিগকে বজ্রাচার্য বলিত। বজ্রাচার্যের পাঁচটি অভিষেক হইত, মুকুটাভিষেক, ঘন্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক ও পট্টাভিষেক। তাঁহার দেশীয় নাম গুভাজু, অর্থাৎ তিনি গুরু, তাঁহাকে সকলে ভজনা করিবে। সুতরাং শিষ্য হইতে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। মন্ত্রযানে গুরুকে শিষ্যের "প্রসাদ" খুঁজিতে হইত, বজ্রযানে তাহার কোন দরকার নাই।"[১৩]

সহজযানের ক্ষেত্রে গুরুর উপদেশই মহত্তম। ক্ষমাহীন পাপের ক্ষেত্রেও তা পাপ বলে বিবেচিত হবে না তা যদি গুরুর উপদেশে করা হয়। বৌদ্ধধর্মে এভাবে গুরুর সম্মান উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে।

কালচক্রযানে গুরুর এই মহত্ব কিভাবে বর্দ্ধিত হয়েছিল তা পুণ্ডরীকের প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই পুণ্ডরীক "লঘুকালচক্রতন্ত্রের" টীকা বিমলপ্রভা লিখেছিলেন। তিনি নিজেকে অবলোকিতেশ্বরের নির্মাণকায় বা অবতার মনে করতেন। এরপর লামাযানের আগমন। লামাদের কোনও বিখ্যাত বোধিসত্ত্বের অবতার বলে মনে করা হয়। তিনি সাক্ষাৎ বোধিসত্ত্ব, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। লামাযানের অবলুপ্তির পর দলাইলামাযান, যিনি অবলোকিতেশ্বরের অবতার। তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর কায়া মাঝে মাঝে নতুনভাবে নির্মাণ হয়। এক কায়া পরিত্যাগান্তে তিনি কায়ান্তর গ্রহণ করেন। এইভাবে দেখা যায়—বৌদ্ধধর্মে প্রাথমিক পর্য্যায়ে তিনি গুরু হলেও মিত্রসদৃশ ছিলেন, পরবর্ত্তীকালে তিনি সর্বশক্তিমাণ অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে পরিগণিত হন।

হরপ্রসাদ "নির্বাণ" প্রবন্ধটিতে নির্বাণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নির্বাণ ব্যাপারটি জটিল ও বোঝা খুবই কঠিন। নির্বাণ শব্দটি নিভে যাওয়া বোঝায়। প্রদীপ নিভে গেলে অবশ্যই তার পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না। মানুষ ভাবতেই পারে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান, ধ্যান, যোগ ইত্যাদি পালন করা কি আত্মবিলোপের জন্য। অনেকের মতে বুদ্ধ নির্বাণ দ্বারা আত্মার বিনাশকেই বুঝিয়েছেন, তাই পাদরিগণ মনে করেন বৌদ্ধধর্ম Nihilism এর নামান্তর। কণিষ্কের সময় অশ্বঘোষ নির্বাণ সম্পর্কে যা বলেন তা একান্তই তাঁর নিজের বিশ্লেষণ। যেহেতু অশ্বঘোষ একজন নির্ভরযোগ্য তত্ত্বসন্ধানী ও বৌদ্ধধর্মের মুখ্যস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম তাঁর কথা

অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। অশ্বঘোষের মতে প্রদীপের মতই সাধক ও নির্বাণের পর সমস্ত রকম ক্লেশমুক্ত হল ও সব শান্ত হল, সব শেষ হয়ে গেল। অশ্বঘোষের লেখা উদ্ধৃত করে হরপ্রসাদ বলেন "এখানে কথা হইতেছে" "উপৈতি শান্তিম"—"সব শেষ হইয়া গেল" ইহার অর্থ কি নিহিল? ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ? অশ্বঘোষও নির্বাণের পর আর কিছু থাকিল কিনা কিছু বলিলেন না।"[১৪] অশ্বঘোষের লেখা তিনটি কবিতা হরপ্রসাদ উদ্ধৃত করে তার বঙ্গানুবাদ করেছেন—

(১) "অতএব তৃষ্ণা প্রভৃতিই নানাবিধ জন্মের হেতু, এইটি মনে মনে বুঝিয়া, তোমার যদি মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই তৃষ্ণাকে চ্ছেদ করো। যে হেতু কারণের ক্ষয় হইলে কার্যেরও ক্ষয় হইবে।"

(২) "এখানে তৃষ্ণাদি হেতুর ক্ষয় হইলে, তোমার দুঃখেরও ক্ষয় হইবে। অতএব তুমি ধর্মকে প্রত্যক্ষ করো। এই ধর্ম শান্তিময়, মঙ্গলময়, ইহাতে তৃষ্ণার উপর বিরাগ হয়, ইহা তাঁহার মত, ইহাতে সর্বধর্মের নিরোধ হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম, ইহাতেই পরিত্রাণ। ইহা কেহ হরণ করিতে পারে না, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

(৩) "ইহাই চরম ও অচ্যুতপদ। ইহাতে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই শত্রু সমাগম নাই, নৈরাশ্য নাই, প্রিয় বিরহ নাই, ইহাই পাইবার মত জিনিষ।"[১৫]

অশ্বঘোষের এই কথনের পরিপ্রেক্ষিতে হরপ্রসাদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বলেছেন "যখন অশ্বঘোষ এই তিনটি কবিতার পর নির্বাণের ঐ দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তিনি নির্বাণ শব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে, নির্বাণের পর আর কোনোরূপ পরিবর্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বের লোপ হইবে না।"[১৬]

বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করা হয় "নির্বাণের পর কিছু থাকবে কি?" বুদ্ধ বলেন "না"। "থাকবে না কি?" বুদ্ধ বলেন "না"। "থাকা না থাকার মাঝামাঝি কোনো অবস্থা হবে কি"? বুদ্ধ বলেন "না"। "থাকা না থাকা এই দুটির বাইরে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা হবে কি?"বুদ্ধ বলেন "না"। হরপ্রসাদের মতে এই উত্তর থেকে জানা গেল এটি একটি অনির্বচনীয় অবস্থা যেটি অব্যক্ত মানুষের জ্ঞানাতীত এবং ধারণাতীত। এই অবস্থাই মহাযানে শূন্য বলে বর্ণিত অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতা। শাস্ত্রী মশায়ের মতে নির্বাণ আর একরূপে ব্যাখ্যাত হতে পারে। মানব মন যখন বোধিলাভের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্যে বিশেষভাবে আকুল হয়ে ওঠে তখন তাকে বোধিচিত্ত বলা হয়। বোধিচিত্ত সৎপথে ও ধর্মপথে অগ্রসর হতে থাকলে বারংবার জন্মগ্রহণের পরেও সে ক্রমশঃ উচ্চ থেকে উচ্চলোকের বাসী হয় এবং সম্ভবতঃ বোধিসত্ত্বও লাভ করতে পারে। বোধিচিত্ত রূপও শরীরকে ত্যাগ করে, রূপলোককে অতিক্রম করে, অরূপ লোকে অবস্থান করেন ও সেই অবস্থায় তিনি নিজেকে, সমস্ত বস্তুকে নিছক আকাশরূপে দেখেন যার অর্থ সমস্ত কিছু তাঁর কাছে অসীম ও উন্মুক্ত হয়ে দেখা দেয়। শাস্ত্রীমশায় আরো মনে করেন বৌদ্ধরা প্রথম প্রথম নির্বাণেই সন্তুষ্ট থাকত কিন্তু পরে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। শূন্য হওয়াটাকেই তাঁরা পরম অভিপ্রেত বস্তু বলে মনে করলেন না। আরো একটি বস্তু তাঁরা নিয়ে এলেন যেটি করুণা, সাধারণ করুণা নয়; সর্বজীবে ও সর্বভূতে করুণা, অনন্ত করুণা। বোধিসত্ত্বেরা করুণায় আপ্লুত হয়ে জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণেও অসম্মত ছিলেন না। শাস্ত্রীমশায় মনে করেন এটিই বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতি নির্দেশ করে। মহাযানের দর্শনের গভীরতা, ধর্মমতের বিশুদ্ধতা, করুণার প্রবলতা, অন্য ধর্মে দৃষ্ট নয়। মহাযানের এই জ্ঞান, তাঁর মতে, দীর্ঘদিন রক্ষিত হয় নি। নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় বৌদ্ধসমাজ ক্রমশঃ মহাযানের উচ্চ দর্শনের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে স্থূল বাস্তবের পথ বেছে নেয় যাতে

CENTRAL LIBRARY

জীবনধারণ তার পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। নির্বাণ কয় রকম এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় উল্লেখ করেছেন যে থেরবাদী বৃদ্ধেরা ও প্রত্যেক বুদ্ধেরা ভাবতেন কেউ যদি সদুপদেশের ফলে অথবা নিজের মনোগত কারণে চারটি আর্যসত্যে[১৭] বিশ্বাসী হয় ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ[১৮] মেনে চলে দীর্ঘদিন ধরে তাহলে অভ্যাসগত কারণে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এদের বলে "স্রোতাপন্ন"। স্রোতের মধ্যে পড়লে যেমন উজানে যাওয়া যায় না সেইরকম স্রোতাপন্ন ও আর সংসারাভিমুখী হয় না তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে নির্বাণের দিকে। সে এই রকম নিয়মের মধ্যে থাকলে পুনর্জন্ম থেকে নিস্কৃতি পায়, একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করে, সেই অবস্থাকে বলে 'সকৃদাগামী' এবং আরো কিছুদিন নিয়ম পালনান্তে "অনাগামী" অর্থাৎ আর জন্মগ্রহণ করে না। এর পরবর্ত্তী অবস্থাই অর্হৎ। এ অবস্থায় যদি তিনি বেঁচে থাকেন, তাহলে তিনি মুক্ত পুরুষ। যে নির্বাণ তিনি লাভ করেন তার নাম "স্বউপাদী সেস নির্বাণ" (স্ব উপাধি শেষ নির্বাণ)। অর্হৎ অবস্থায় কিছুদিন থাকলে কর্মের ক্ষয়ই হয়— সঞ্চয় হয় না। সব কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তারপরেই তিনি নিরুপাদি সেস নির্বাণ ধাতুতে প্রবিষ্ট হন। তিনি নির্বাণে প্রবেশ করেন। মহাযানীদের বক্তব্য হীনযানী পন্থার নির্বাণ নীরস, নির্মম, আত্মকেন্দ্রিক ও সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় বহন করে। হীনযানীরা জগৎ সম্পর্কে নির্লিপ্ত। মহাযানীদের মতে নির্বাণকে নঞর্থক করলে চলবে না। হীনযানীরা যখন বলেন আত্মার নাশই নির্বাণ, জ্ঞানের নাশই নির্বাণ, বুদ্ধি নাশের নামই নির্বাণ তখন তারা বুদ্ধ প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হন। মহাযানীদের মতে নিরালম্ব নির্বাণে বোধিচিত্ত শুধু ক্লেশ থেকে মুক্ত হন না, তিনি ধর্মকায়ের পবিত্র মূর্তি অবলোকন করেন। সে অবস্থায় দুটি বস্তু হবে তাঁর পথপ্রদর্শক—সর্বভূতে করুণা ও সর্বব্যাপী জ্ঞান। তিনি তখন সম্যক সম্বোধি লাভ করায় তাঁর মন বলে "সমস্ত প্রাণীকে মুক্ত কর ও চরমানন্দে ভাসিয়ে দাও। নির্বাণেও তখন তাঁর সন্তোষ নেই, তিনি অবলম্বন রহিত— তাই এর নাম নিরালম্ব নির্বাণ। মহাযানীদের মধ্যে আর এক প্রকারের নির্বাণের প্রসঙ্গ জানা যায়। এটি সম্পূর্ণভাবে ধর্মকায়ের থেকে অভিন্ন। তত্ত্বকে মহাযানীরা বলেন তথতা। ধর্মের উপর যে তথতা তাই ধর্মকায়। মুক্তি লাভান্তে, তথাগত পর্য্যায়ে উন্নীত হওয়ার পর তিনি পরম সত্যে উপনীত হয়েছেন। তাঁদের মতে নির্বাণ চৈতন্যের নাশ ইঙ্গিত করে না, অহংবোধের নিরোধ ঘটায়।

প্রত্যেক বুদ্ধদের সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় বলেছেন, পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রাবকযান এবং প্রত্যেক বুদ্ধযানের উল্লেখ আছে। শ্রাবকযানের সাধক বা শ্রাবকের অন্বিষ্ট অর্হত্ব। এঁরা নির্বাণ আকাঙ্খা করেন না। অন্যপক্ষে প্রত্যেক বুদ্ধযানের সাধক বা প্রত্যেক বুদ্ধের লক্ষ্য ব্যক্তিগত নির্বাণ। এঁরা প্রত্যেকে বোধিলাভ করেন কিন্তু শাস্তা বা লোকসাধারণের মুক্তির পথপ্রদর্শক হন না। 'মহাবস্তু অবদান'-এর মালিনী উপাখ্যানে বলা হয়েছে— প্রত্যেক বুদ্ধরা মৌল অবলম্বনেই শোভন হন, তাঁহারা মহান প্রভাব বিশিষ্ট, তাঁরা গণ্ডারের মতো একাকী বিচরণ করেন, তাঁরা কেবল নিজেদেরই দমিত করেন এবং পরিনির্বাণ লাভ করেন। মহাযান মতে বুদ্ধদেবকে প্রত্যেক বুদ্ধদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, কারণ, তিনি বুদ্ধত্ব অর্জনের পরে লোক সাধারণের শাস্তা হয়েছিলেন।"[১৯]

'বুদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল' এই ব্যাপারে শাস্ত্রীমশায় বলেছেন 'বৌদ্ধধর্মের আদি কী' এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তর্কবিতর্ক চলেছে।

প্রথম মত যজ্ঞে অগণিত পশুহত্যা দেখে বুদ্ধদেব বিচলিত হন ও পশুবধকে নিবারণ করার জন্য অহিংসা পরমধর্ম প্রচার করেন।

দ্বিতীয়মত উপনিষদের অদ্বৈত মতকে অনুসরণ করে তিনি নিজের ধর্ম প্রচার করেন। তাই তাঁর অপর একটি নাম অদ্বয়বাদী। নির্বাণ ও অদ্বয়বাদে প্রভেদ নেই বললেই চলে। তাই

CENTRAL LIBRARY

রামানুজপন্থীরা বলেন শঙ্করাচার্য বৌদ্ধমত গ্রহণ করে অদ্বৈতবাদী হয়েছেন আর অন্যমতে বুদ্ধ উপনিষদের প্রাচীন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করে অদ্বয়বাদী হয়েছেন।

তৃতীয়মত হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমতের ফলশ্রুতি। সাংখ্যদর্শন যেমন ত্রিতাপনাশের জন্য রচিত, বুদ্ধেরও তেমন পঞ্চস্কন্ধ, চতুরার্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ। সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের পার্থক্যটুকু হল যে প্রথমটিতে আত্মার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে যেটি বৌদ্ধধর্মে হয় নি।

আর একটি মত হচ্ছে বুদ্ধদেব তাঁর সমকালীন ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও অহঙ্কার দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি তাই সকলকে মুক্তির পথ দেখাতে ব্রতী হলেন। ব্রাহ্মণদের উপর দ্বেষের ফলেই তাঁর ধর্মপ্রচার।

এ ব্যাপারে আরো কিছু মত বর্ত্তমান সেগুলি গুরুত্ব পাওয়ার মত নয় বলে তিনি মনে করেন। শাস্ত্রীমশায় এসব মতের প্রতি সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য পশুবধ দেখে বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন একথা তাঁর জীবন চরিতে দেখা যায় না। সেই সঙ্গে 'ললিত বিস্তর', 'মহাবস্তু অবদান' বা 'বুদ্ধচরিতে'ও এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নেই। অহিংসা যে পরম ধর্ম এ সত্য তাঁর পূর্বেও বিদিত ছিল ও জৈনরা বুদ্ধের অনেক পূর্বেই অহিংসাধর্মকে মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল। শাস্ত্রী মশায়ের মনে হয়েছে উপনিষদের অদ্বৈতবাদ, বৌদ্ধধর্মের দিশারী তা স্বাকীর্য নয়। ব্রাহ্মণগুলি যজ্ঞ করার জন্য রচিত। 'হর্ষচরিতেই' প্রথম উপনিষৎ বলে একটি দর্শনের উল্লেখ দেখা যায়। উপনিষদের বহুল উল্লেখ শঙ্করাচার্যের পর থেকে দেখা যায়। এ ছাড়া বৌদ্ধধর্মে অদ্বৈতবাদ আসে মহাযানীদের পর থেকে। বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমতসঞ্জাত একথা মোটামুটি অশ্বঘোষের লেখায় পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মশায় এই বিশ্বাসের বিরোধিতা করে বলেছেন "যদি বৌদ্ধধর্ম সাংখ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে তো উহা আর্য-ধর্ম হইতেই উৎপন্ন হইল। আমার সেই কথাতেই সন্দেহ। সাংখ্যমত কি বৈদিক আর্যগণের মত? শংকরাচার্য তো উহাকে বৌদ্ধাদি মতের ন্যায় অবৈদিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি এত যত্ন করিয়া ও মত খণ্ডণ করেন কেন?"[২০] সব কিছু বিচার বিবেচনা করে শাস্ত্রীমশায়ের অনুমাণ পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ, মগধ ও চের নামে যে তিনটি জাতি বাস করতেন তাদের সঙ্গে আর্যদের পারস্পারিক ক্রিয়ার ফলে বৌদ্ধধর্ম সৃষ্ট হয়। যেখানে আর্যদের পশ্চিমসীমা ও এই জাতিগুলির পূর্বসীমা সেখানেই বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলেই অধিকাংশ ধর্মগুলি উৎপন্ন। তাদের মধ্যে অনেকগুলি ধর্ম যথা আজীবক, নির্গ্রন্থ প্রভৃতি সেভাবে পরবর্ত্তীকালে বিদ্যমান না থাকলেও বৌদ্ধধর্ম পূর্ব ভারতে বহুদিন ধরে অম্লান হয়ে বিরাজমান থাকে। মহাযান ও হীনযান সম্বন্ধে হরপ্রসাদ যা বলেছেন তা আগেই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা তিনি পুনরায় করেন। তাঁর মতে মহাযানেরা আগের বুদ্ধদের হীন বলত। এর আগে দুটি যান ছিল—প্রত্যেক যান ও শ্রাবক যান। বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রথমটিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন অর্থাৎ পৃথিবীতে কোন বুদ্ধের অবর্তমানে লোক নিজের চেষ্টায় প্রত্যেকবুদ্ধ হতে পারে। অবশ্য তারা নিজে উদ্ধার প্রাপ্ত হতে পারে কিন্তু অপরকে উদ্ধার করতে পারে না। পক্ষান্তরে বুদ্ধের মুখে ধর্ম শুনে যাঁরা জ্ঞানবান হন তাঁরা শ্রাবক। এঁরাও জন্মজরামৃত্যু আদি থেকে মুক্তি পেতে পারেন কিন্তু অপরকে মুক্ত করতে পারে না। মহাযানীদের বক্তব্য এই দুটি যানই স্বার্থপরতার কারণে হীন। জগৎবাসী যখন অবলোকিতেশ্বরের কাছে আকুল মিনতি জানায় "আপনি নির্বাণপ্রাপ্ত হইলে কে আমাদের উদ্ধার করিবে?" সেই শুনে অবলোকেশ্বর আশ্বাস দেন একটি প্রাণীও যতদিন আবদ্ধ থাকবে তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হবেন না এবং এই করুণা বোধই মহাযানকে 'মহা' করেছে। হীনযান অর্হত্ব পেলেই সন্তুষ্ট মহাযান বুদ্ধত্ব চায়। মহাযানীরা বলেন বুদ্ধ মানবের উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন তাই তিনি বুদ্ধ আর তাঁর শিষ্যগণ নিজেরা উদ্ধার প্রাপ্ত হবেন।

CENTRAL LIBRARY

তাই তারা অর্হৎ। শ্রাবকযানীদের সমালোচনার উত্তরে মহাযানীরা বলেন পূর্বোক্তযান সম্বোধি পেতে পারে কিন্তু সর্ব্বোচ্চ সম্বোধি পায় না এবং বোধিসত্ত্ব কাকে বলে জানে না। আবার শ্রাবকগণ যখন অভিযোগ জানায় মহাযানীদের হাতে বুদ্ধবচন নেই, সূত্র, বিনয়, আভিধর্ম কিছুই নেই তখন মহাযানীরা বলেন তাঁদের প্রজ্ঞাপারমিতা আছে যা সকল সূত্রের আধার। তাদের বিনয় ও আছে— যা শ্রাবকদের বোধাতীত এবং তাদের অভিধর্ম তো আছেই যে ধর্ম "অনুত্তর সম্যকসম্বোধি"। শ্রাবকযানে 'ত্রিশরণের' পরেই 'পঞ্চশীল' গ্রহণ। তাদের মধ্যে 'পোষধ' ব্রত (উপবাস) আছে। ত্রিশরণের উপস্থিতি মহাযানীদের থাকলেও 'পোষধ নেই'। শীলরক্ষা তাঁদের কাছে তেমন গুরুত্ব পায় না। হীনযানে অনেক কিছু থেকে বিরত থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যেমন মিথ্যাবচন থেকে বিরত থাকা। মহাযানীরা যেন স্বাভাবিকভাবেই বিরত থাকতেন। তাঁদের চেষ্টা থাকত কিবাবে শীলের উৎকর্ষ আনা যায় মহাযানীদের জীবনীশক্তি প্রবল। তাঁদের একটি পারমিতার নাম বীর্য। মহাযানীদের মধ্যে অসংখ্য ধ্যান ও সমাধির কথা আছে। তাঁরা স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এসব কথা মানেন না। পরিবর্তে পাওয়া যায় "দশ বোধিসত্ত্ব ভূমি"। ত্রিশরণ উভয়ের মধ্যেই আছে তবে মহাযানীদের ক্ষেত্রে তা বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ না হয়ে ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ। তাদের কাছে বুদ্ধ হচ্ছে 'মানুষী' বুদ্ধ ও তাঁহার স্থান সপ্তম (দীর্ঘ নিকায়ের মহাপদান সূত্র)। তাই তাদের কাছে ধর্ম বুদ্ধ অপেক্ষা বড়ো।

এখন এই মহাযান কিভাবে আগত তা নিয়ে মতভেদ বর্তমান। অনেকে মনে করেন নাগার্জুনই এটির প্রবর্তক। তিনিও তাঁর শিষ্য আর্যদেব মহাযানের আদি গুরু। বুদ্ধের মৃত্যুর একশ বছর পরে বৌদ্ধসংঘে বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা দেয়। স্থবিরগণ বিনয় থেকে বিন্দুমাত্র চ্যুত হতে চাইছিল না নবীনগণ কিছুটা শিথিলতা চেয়েছিলেন। বৈশালীর মহাসভায় একটি আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা সফল হয় না। অধিকাংশ বৌদ্ধ স্থবির দল থেকে পৃথক হয়ে যান। ফলে থেরবাদ ও মহাসাংঘিকের জন্ম। মহাসাংঘিকরা লোকোত্তরবাদী। বুদ্ধ তাঁদের কাছে এক অলৌকিক ব্যক্তিত্ব। সম্রাট অশোকের সময় পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত মহাসভায় মহাসংঘিকেরা স্থান পান নি। মহাযানীদের কাছেও সে সভার গুরুত্ব নেই। কালক্রমে স্থবিরবাদের দুটি শাখা হয় 'মহীশাসক' এবং 'বজ্জিপুত্তক'। এই দুটিরই আবার কয়েকটি প্রশাখা বর্তমান। মহাসাংঘিকদের দুটি দল 'গোকুলিক' ও 'একব্যোহারিক'। এদেরও অনেকগুলি প্রশাখা। বৌদ্ধবিদ্বেষী পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে মহাসাংঘয়িকগণ পূর্ব্বাঞ্চল ত্যাগ করে পশ্চিমাঞ্চলে চলে যান। সেখানে তাঁরা বিদেশী রাজগণের আনুকুল্যলাভে সমর্থ হন। সম্রাট কণিষ্কের সময় জলন্ধরে যে মহাসভা হয় তাতে স্থবিরবাদীরা স্থান পান নি। শাস্ত্রীমশায় মনে করেন এই সভার ফলেই মহাসাংঘয়িকরা মহাযানী হয়ে যান। তবে এটি সমাধা হতে তিনশ বছরের বেশী সময় লেগেছিল। মহাসাংঘয়িকদের একটি মাত্র গ্রন্থের কথা শোনা যায় যেটি 'মহাবস্তু অবদান'। এটির ভাষা নিরূপণ করা দুরূহ। ভাষাটিকে গাথাভাষা, mixed language, vernacularised sanskrit, sanskritized vernacular প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'মহাবস্তু অবদানের' পরও প্রাক্‌নাগার্জুনপর্বে যে গ্রন্থগুলি রচিত হয় তাদের মধ্যে 'লঙ্কাবতার সূত্র' ও অশ্বঘোষের তিন-চারটি গ্রন্থ দেখা যায়। সবগুলিতেই মহাযানীদের মতের প্রাধান্য। নেপালে বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মের দুটি রূপ। দেবভাজু ও গুভাজু। হয় দেবতার ভজনা নতুবা গুরুর ভজনা। মহাযানীরা গুভাজু। বুদ্ধকে পরমগুরু রূপেই তারা মুক্তিদাতা বলে মনে করে। কিছু লোক মনে করে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মিলনার্থে, নাগার্জুন মহাযানের প্রতিষ্ঠা করেন। শাস্ত্রীমশায় যুক্তি সহকারে তা খণ্ডণ করেছেন। মহাযান সৃষ্ট হওয়ার পর পূর্বের বিবাদ বিসম্বাদ অন্তর্হিত হয়। শূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদীদের মধ্যেও বিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাযান থেকে

উদ্ভূত মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান সকলেই নিজেদের মহাযানী বলে মনে করে। সহজযান সম্পর্কেও শাস্ত্রীমশায় আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মহাযানে নির্দেশিত নির্বাণের পথ অতি কঠিন। সেটি সর্বসাধারণের অনুধাবনযোগ্য নয়। একটি সহজ পথের প্রয়োজন। সহজযানীদের মতে সংসারের মত নির্বাণ ও মিথ্যা, মানুষ সদামুক্ত। বাঙলায় সহজপদ সরহপাদও ভাদেপাদের রচনায় সুন্দরভাবে সহজযানের মূল কথাটি বিবৃত। সহজযানের মূলকথা সদ্গুরুর উপদেশ। তাদের মতে বোধিলাভের ইচ্ছা থাকলে পঞ্চকামের উপভোগে বাধা নেই। মানুষমাত্রেই পঞ্চকামের অধীন কিন্তু এতে পাপপুণ্যের প্রশ্ন থাকে। কিন্তু বজ্রগুরু যখন বোঝান সবই শূন্য তখন পঞ্চকামোপভোগ দূষণীয় হয় না। সহজকামীদের বক্তব্য জনসাধারণ প্রবল উৎসাহে গ্রহণ করে। বৈষ্ণব সাহিত্যে গীতিকারদের বলে পদকর্তা। তাঁদের গান পদরূপে পরিচিত। বৌদ্ধ সংকীর্তনের গীতিকারও পদকর্তা। তাঁদের রচিত গানের নাম চর্যাপদ বা গীতিকা। প্রখ্যাত পণ্ডিতগণও গীতিকা লিখেছেন—যেমন দীপংকর শ্রীজ্ঞান, রত্নাকর শান্তি। বাঙালী ছাড়াও, আসামি, উড়িয়া, মৈথিলরাও গীতিকা লিখতেন। সহজযানের যাঁরা গুরু অর্থাৎ বজ্রগুরুদের অনেকসময় সিদ্ধাচার্য বলা হয়। তিব্বতে বহুস্থানে সিদ্ধাচার্যদের মূর্তি সংরক্ষিত। লুইপাদ সিদ্ধাচার্যদের আদি। সংখ্যায় চুরাশিজেন সিদ্ধাচার্যের কথা শোনা যায়। সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের সহজ সরল প্রাণমাতানো গানে ও উপদেশে মানুষের হৃদয় জয় করে নেয়। তাঁদের জন্যেই বাংলাভাষা একটি মাধুর্য ও বৌদ্ধসমাজে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। অবশ্য সহজযানের এইরূপ বর্তমানে পরিবর্তিত।

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের কারণগুলি অনুধাবন করতে গিয়ে প্রথমে তিনি সহজযানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। সহজযানে চরিত্র বিশুদ্ধি যেটি বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ছিল ও বিশেষভাবে অনুসৃত হয় তা একেবারে বিসর্জন দেওয়া হয়। পরিবর্তে দেখা দেয় অবাধ ব্যভিচার ও দেহতত্ত্বের চর্চা। যে মহাযানে নিজেকে উন্নতমানে নেওয়ার জন্য অবিরাম চেষ্টা করার জন্য বলা হয়েছিল তার জায়গায় এসে দাঁড়ানো সন্ধ্যাভাষা বা আলো আঁধারি ভাষা। জীবনযাত্রার সকলস্তরের যে অবনমন ও বিচ্যুতি দেখা দেয় তা বর্ণনার বাইরে। দ্বিতীয়তঃ মহাযানের আচার্যগণ, 'প্রজ্ঞাপারমিতা' বোঝা ও অনুশীলন করা কঠিন বোধে সাধারণের জন্য 'ধারণীর' সহজপথের সুপারিশ করলেন। এই সব ধারণীর সংখ্যা ছিল বিপুল। চারশ এগারটির সন্ধান লেখক পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শুধু বুদ্ধের মূর্তি নয় বা 'ধ্যানীবুদ্ধ' যেমন 'অমিতাভ' অক্ষোভ্য, বৈরচন, রত্নসম্ভব ও অমোঘসিদ্ধি মূর্তি নয়, শক্তিগণের 'লোচনা', 'মামকী', 'তারা', 'পাণ্ডরা', 'আর্যতারিকা' মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল। এই অধোগতি শেষ সীমায় এসে দাঁড়াল যখন ডাকিনী, যোগিনী, ভৈরবীর পূজা ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা সুরু হল। এছাড়াও দেখা দিল গুহ্যপূজা, শম্বরের অশ্লীল মূর্তির পূজা। বুদ্ধ প্রচারিত শীলরক্ষা ও অন্যান্য কঠোর নিয়মগুলি স্থান পেল যথেচ্ছচারিতায়। বুদ্ধের মৃত্যুর পাঁচ ছয়শ বছর পর থেকে ভিক্ষুদের বিবাহ অনুমোদিত হল, পরে গৃহস্থগণও ভিক্ষু হতে পারল। এদের সংখ্যাই ক্রমশঃ বাড়তে থাকে কারণ তাদের সন্তান সন্ততি স্বাভাবিকভাবেই ভিক্ষু হতে পারত। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের পৌরহিত্য, কায়জীবী মানুষের হাতে চলে এল। বৌদ্ধধর্মের এই অবক্ষয়ের প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় বলেন "এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম, ইহা এখন কোথায় গেল? যখন সহজিয়া ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবে বাঙালী একেবারে অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময় আফগানিস্থানের খিলজীরা আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙ্গিয়া দিল—দেবমূর্ত্তি বিশেষতঃ যুগলাদ্য মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া দিল—সহস্র সহস্র নেড়া ভিক্ষুর প্রাণনাশ করিল। বড় বড় বিহারে যে সকল যথার্থ পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন, তাঁহারাও ঐ সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাঁহারাই ঐ ধর্ম্মের অস্থি ও মজ্জা

স্বরূপ ছিলেন। অস্থি ও মজ্জার নাশ হইলে দেহেরও নাশ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম্মেরও নাশ হইল।"[21]

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের অনেকগুলি কারণ শাস্ত্রীমশায় দেখিয়েছেন তারমধ্যে তাঁর লেখা থেকে আরো একটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করার প্রলোভন সংবরণ করা গেল না।

"The other discovery I have made is not so much from books and MSS. as from actual observation in Nepal. It was always a puzzle to me that the pure metaphysical religion of Buddha could be made the medium of practising immoral and obscene rites. The Buddhist Trinity Dharma (Religion) Buddha and Sangha (Buddhist monastic congregation) are merely obstract ideas personified. All the three words are in masculine gender. How can there be the introduction of female divinities and subsequent obscene rites? But on entering the Holiest of the great places of pilgrimage in Nepal, the Svayambhū kṣetra, I was struck with a female figure labelled or inscribed as Namo dharmaya. I at once enquired from the Residency Pandit, a Buddhist high-priest himself and the descendant of the most learned of Buddhist Pandits ever met with by the English in Nepal. He coolly said Dharma is nothing else but Prajñā. I had often read in Buddhist works the phrase prajñopāyasvarūpinīm or svarūpāya. I know that Buddha is never an object of workship. His image is kept in monasteries simply for the purpose of keeping his noble example always present before the aspires to Nirvāṇa, and so he is the upāya or means to Nirvāṇa. I also knew that Prajñā or true knowledge is the great goal of those who aspire to Nirvāṇa. But none ever suspected that Dharma and Prajñā are identical. This identification introduced a female deity into the Buddhist Trinity and she at once became the mother of all Bodhisattvas, beings representing the Saṅgha or the Buddhist congregation. In a MS in the Durbar library belonging to the Kālacakra school I subsequently saw illustrations of Buddha and Prajñā in the unspeakable situation begetting Bodhisattvas. This information led to the explanation of many facts and symbolisms unexplained before. Buddhism subsequently became closely allied to Śakti worship and its latter development ran in parallel lines that of Śakti cult" - "Antiquities of the Tantras and the Introduction of Tantric rites in Buddhism", Proceedings of Asiatic Society of Bengal, August 1900, pp. 101-02."[22]

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল ঘুরে এসে হরপ্রসাদ লেখেন 'Discovery of living Buddhism in Bengal'. তাঁর মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল বৌদ্ধধর্মের উদয় ও অস্তের সঙ্গে বাঙালীর ইতিহাসকে অভিন্ন বলে মনে করতে হবে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের—"The sanskrit Buddhist Literature of Nepal রচনার সময় হরপ্রসাদ বিশেষভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এবং এই কাজটির ফলে হরপ্রসাদ বৌদ্ধসাহিত্য ও মহাযান বৌদ্ধমতের গবেষণার ক্ষেত্রে এক অনান্য ব্যক্তিস্বরূপে দেখা দিলেন। নেপালে তিনি বার চারেক যান ও সেখানে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল লাভ করেন। তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'Northern Buddhism (I.H.Q. March, June, Sept. 1925), Six Buddhist Nyāya Tracts (1910), আর্যদেবের চতুঃশতিকা (1914), অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ (1927), তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত বৃহৎস্বয়ম্ভূপুরাণ (1898-1900), চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ

(1898), সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' (1910), অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দকাব্য, (1910), হাজার বছরের পুরাণ বাংলাভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা (১৩২৩'ব) ইত্যাদি স্মরণীয়। হৃজমন পথিকৃত অবশ্যই কিন্তু শাস্ত্রীমশায়ের কৃতিত্ব নেপাল থেকে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য উদ্ধারে তাঁর বিপুল সাফল্য। বৌদ্ধবিদ্যায় তাঁর পারিদর্শিতা ও নিরলস অনুসন্ধানের স্বীকৃতি তাঁর জীবনের এক মহান প্রাপ্তি। বিংশ শতাব্দীর এই মনীষীর উদীচ্য বৌদ্ধচর্চায় অবদান দেশে বিদেশে সমানভাবে মেনে নেওয়া হয় তা মৌলিক গবেষণায় মর্যাদা লাভ করে। সম্ভবতঃ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না এক সময় বিদগ্ধ পাশ্চাত্য সমাজ তাঁকে মনে করতেন বৌদ্ধবিদ্যায় সব থেকে বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। একথা স্বীকার্য হরপ্রসাদের সব থেকে মূল্যবান কাজটি হচ্ছে সংস্কৃত পুঁথির আলোচনা। এ ব্যাপারে তাঁর বর্ণনাত্মক সংস্কৃত পুঁথির সূচী অপরিহার্য সম্পদ সেইসব ব্যক্তির কাছে গণ্য হবে যাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নে প্রয়াসী কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যা বা সঠিকভাবে বলতে গেলে বৌদ্ধবিদ্যায় গবেষণা ও অনুশীলনে তাঁর সংশয়াতীত ব্যুৎপত্তি সাক্ষর বহন করে বিশ্বের তদানীন্তন পণ্ডিতদের অজস্র পত্র লিখনে। বস্তুতঃ Alexander Csoma de Koros ও Brian Houghton Hodgson বৌদ্ধচর্চায় যেমন বিশ্ববিশ্রুত নাম, হরপ্রসাদের কর্মকাণ্ডও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিস্ময় বোধ হয়, যখন শোনা যায় সেই সময়ের বিদ্বৎসমাজের কিছু লোক শাস্ত্রীমশায়কে 'বৌদ্ধবাতিকগ্রস্থ' বলে আখ্যা দিতেও দ্বিধা করে নি। বৌদ্ধচর্চায় তাঁর বস্তুনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, সামগ্রিক ও সজীবতায় ভরা রচনাগুলি আজও আগ্রহী পাঠককে সমানভাবে আকৃষ্ট করে। কালজয়ী তাঁর সৃষ্টি এটি বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে হরপ্রসাদের পূর্বে অবশ্যই ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম বিশারদদের মধ্যে, বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন কোণ সেভাবে আলোচিত হয় নি।

এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নে ও মূল্যায়নে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম চর্চায় তাঁর রচনা একটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। তাছাড়া হরপ্রসাদই সম্ভবতঃ প্রথম যিনি অনুভব করলেন ও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করলেন যে উত্তর পূর্ব ভারতের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য আহরণ দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্যে অপরিহার্য। তাই তিনি বুদ্ধচর্চায় যুগস্রষ্টা।

নির্দেশিকা—

১। হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা, পৃষ্ঠা, ঞ।

২। হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা, ৩৮৭।

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৩৮৮।

৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৩৯৪-৩৯৫।

৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪০।

৬। মৌলানা মিন্‌হাজুদ্দিন আবু উমর-ই-উস্‌মান্ রচিত ইতিহাস গ্রন্থ 'তবকাৎ-ই-নাসিরি-তে ওদন্তপুরী মহাবিহার ধ্বংসের বিবরণ পাওয়া যায়। মিন্‌হাজুদ্দিন দিল্লির সুলতানদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ১২৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান বিহার রাজ্যের বিহার শরিফে ওদন্তপুরী মহাবিহার ছিল। ওদন্তপুর বা ওদন্তপুরী মহাবিহার ধর্মপাল (আ ৭৭০/৭৭৫-৮১০ খৃ.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মনে করা হয়। দীপংকর শ্রীজ্ঞান এখানে ছাত্র ছিলেন, পরে প্রধান আচার্য হন। আনুমানিক ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বা এর কাছাকাছি সময়ে বখতিয়ার খলজি এই বিহারের সমস্ত ভিক্ষুদের হত্যা করেন। বিহারটি তাঁর সৈন্য শিবিরে পরিণত হয়।

৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪২-২৪৩।

৮। মহাবস্তু, ললিতবিস্তর ও সদ্ধর্মপুণ্ডরীক ইত্যাদির ভাষাকে একদা গাথা ভাষা বলা হত, এখন বলা হয় 'মিশ্র-সংস্কৃত'।

CENTRAL LIBRARY

৯। 'লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা'র অন্য নাম 'বিমলপ্রভা'। এই পুঁথি নেপালে পাওয়া গেছে। লেখক পুণ্ডরীক, নামান্তর জানবজ্র।

১০। ইরান দেশের প্রাচীন আর্যদের ধর্মগুরু অশো (ঋষি) জরথুশত্র। বাবা রাজবংশীয় পণ্ডিত পোউরুশস্প, মা দোগদো (দুগ্ধোবা)। জন্মকালে নবজাতকের নাম রাখা হয় স্পিতম্। স্পিতম্ পনেরো বছর বয়সে বনবাসী হন, প্রায় পনেরো বছর মহাতপস্যায় নিবিষ্ট থাকেন। তপস্যার অন্তে তিনি জরথুশত্র নামে পরিচিত হন। জরথ শব্দের অর্থ সোনালি, উশত্র শব্দের অর্থ প্রকাশ। জরথুশত্র অর্থ সুবর্ণকান্তি। ঐশী কান্তিতে শরীর পূর্ণ হওয়ায় তাঁর এই নাম হয়েছিল। তিরিশ বছর বয়স থেকে এই ঋষি ইরান দেশে ধর্মপ্রচার শুরু করেন।

১১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪৩।

১২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২৪৬।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২৪৯-২৫০।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২৬৪।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২৬৫।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২৬৫।

১৭। দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা হল চতুর্আর্যসত্য।

১৮। সৎ-দৃষ্টি, সৎ সংকল্প, সৎ কর্ম, সৎ বাক্য, সৎ আজীব, সৎ ব্যায়াম, সৎ স্মৃতি, সৎ সমাধি।

১৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১।

২০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা,, ২৯২।

২১। হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪২৩।

২২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৮-৮৯।

CENTRAL LIBRARY

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জ্ঞানের পথে এক মহান অভিযাত্রী

আশা দাশ

"আকাশের আলো দিয়ে, পৃথিবীর লক্ষ্মীশ্রী দিয়ে মানুষের প্রেমের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সাধছেন। আপনার সেই বড়োটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে বলেই কবি কবিতা লিখেছে, শিল্পী কারু রচনা করেছে, কর্মী কর্মে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। মানুষের সকল রচনা বলেছে—"তোমার মতো এমন সুন্দর আর দেখলুম না।"[১] একজন অনন্য বাঙালী তাঁর শিল্প কর্ম দিয়ে তার সমগ্র জীবন তপস্যা দিয়ে তাঁর জ্ঞানের আলো আর লক্ষ্মীশ্রী দিয়ে বাঙালী জাতটাকে বিশ্বের দরবারে একটা উদার স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালী এক বিরাট মানুষের পরিচয় পেল। যে মানুষ নরের মধ্যে নরোত্তম। তিনি বাঁচিয়েছেন বাঙালীকে। বাঁচিয়েছেন বাঙালীর নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করে বাঙালীর ঔদাসিন্য থেকে। বাঁচিয়েছেন বাঙালীর ভাষা অর্বাচীন—অন্যের এই উপেক্ষা ও অবজ্ঞার দুর্দশা থেকে। এই কথা কটি বলতে ও লিখতে অতি সহজ। কিন্তু এর জন্য একজন মানুষকে কঠিন পরিশ্রম করে ভিন্ন রাজ্যের সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে পরম সম্পদ আহরণ করে আনতে হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের সে অনন্য সম্পদ হল *হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*। আর এই নক্ষত্র প্রতিভা হল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[২] (জন্ম ১৮৫৩—মৃত্যু ১৯৩১)।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[৩] মহোদয় নেপাল রাজ দরবারের গ্রন্থাগার থেকে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পুথি সংগ্রহ করেন। ১৯১৬ খ্রী. 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' 'সরহপাদ ও কৃষ্ণপাদের টীকাসহ দোহা' এবং 'ডাকার্ণব' ইত্যাদি পুথি ঐ নামে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশনায় এক দিকে আছে নির্মীয়মান বাঙলা ভাষার রূপরেখা, অন্যদিকে প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের চরম পরিণতি। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ জনগণের ভাষায় ঐতিহ্যকে ধারণ ও বহন করে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সৃজনকর্ম সম্পন্ন করেন। এই ঐতিহাসিক কাজটির জন্য বাঙালী ও বাংলা ভাষার পাঠকের নিকট সহজাচার্যগণ চিরস্মরণীয়। এতদিন চৈতন্য পূর্ববর্তী বাংলা ভাষায় প্রাচীন নিদর্শন বাঙালীর জানা ছিল না। এবার বাঙালীর ভাষাকে প্রাচীনত্বের আভিজাত্য ও গৌরব প্রদান করে হরপ্রসাদ হলেন চির বরণীয়।

তাঁর জীবন ছিল ত্রিমুখী ধারায় প্রবাহিত। তিনি অধুনালুপ্ত দুর্লভ পুথির আবিস্কারক। বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ লেখক। আবার ভারততত্ত্বের অক্লান্ত গবেষকও। নেপাল পরিভ্রমণ করে উল্লেখিত পুথি ব্যতীত তিনি আরো কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পুথি সংগ্রহ করেন। তাঁর মধ্যে অন্যতম হল 'রামচরিতম্'। পুথিটি সংস্কৃত ভাষায় তালপত্রে লিখিত। ১৯১০ খ্রী এশিয়াটিক সোসাইটি হতে Memories of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, No. I-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। মহামহোপাধ্যায় এই প্রকাশনার ভূমিকায় বলেছেন, ইহা দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিখিত। আনীত পুথির লিপিকর শ্রী শীলচন্দ্র। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী সংস্কৃত ভাষায় আর্যাছন্দে 'রামচরিতম্' লিখেছিলেন। এ কাব্যের প্রতিটি শ্লোকের দু প্রকার অর্থ। প্রথম অর্থে রামায়ণের ঘটনার বর্ণনা। দ্বিতীয় অর্থে পিতা ভ্রাতাপুত্রাদিসহ পালরাজ রামপালের ইতিবৃত্ত। এ গ্রন্থ প্রকাশ করে হরপ্রসাদ গৌড় বঙ্গের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ জনসমক্ষে এনেছেন। গৌড় বঙ্গের এই কাল সীমা হল একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং দ্বাদশ শতাব্দী। 'সৌন্দরানন্দ' কাব্য আবিষ্কার তাঁর আর এক গৌরবময় কীর্তি। কাব্যের রচয়িতা বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ। টীকাকার সর্বানন্দ ছিলেন বাঙালী। হরপ্রসাদ নেপাল থেকে এ গ্রন্থের পুথি সংগ্রহ করেন। ১৯১০ খ্রী এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Bibliothica Indica গ্রন্থমালায় ইহা প্রকাশিত। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 'সৌন্দরানন্দ'

CENTRAL LIBRARY

এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'কীর্তিলতা' পুথিও সংগ্রহ করেন নেপাল থেকে। এ পুথির রচয়িতা বৈষ্ণব মহাকবি বিদ্যাপতি। 'কীর্তিলতা' অবহট্‌ঠ্ ভাষায় লিখিত। অবহট্‌ঠ, মৈথিল এবং পূর্ব প্রান্তীয় ভারতীয় আর্যভাষায় ইতিহাস জানার পক্ষে 'কীর্তিলতা' সহায়ক। 'বর্ণরত্নাকর' পুথি আর একটি মূল্যবান সংযোজন। ১৯৪০ খ্রী এশিয়াটিক সোসাইটির Biblothica Indica গ্রন্থমালায় এটি প্রকাশিত। রচয়িতা জ্যোতিরীশ্বর। গ্রন্থটি মৈথিল ভাষায় গদ্যে লেখা। এ গ্রন্থ থেকেই পূর্বপ্রান্তিয় ভারতীয় আর্যভাষায় গদ্যের শুভ সূচনা। 'আদি কর্মবিধি' নামে আর একটি দুর্লভ পুথিও তাঁর সংগ্রহের অর্ন্তগত। এই পুথির ঐতিহাসিক উপাদান হল পালরাজগণ বর্ণাশ্রমী হিন্দুর ন্যায় ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কিন্তু মৎস্যঘাতী কৈবর্তপ্রমুখ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর প্রতি ছিল তাঁদের ঘৃণাভাব। 'রামচরিতম্'-এর প্রথম পরিচ্ছেদের এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১ম থেকে ৩৫ শ্লোকের টীকাও তাঁর আনীত পুথির অর্ন্তগত। 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা' (হরিবর্মাদেবের ১৯ রাজ্যাংকে লিখিত) এবং 'বিমলপ্রভা' (হরিবর্মাদেবের ৩৯ রাজ্যাংকে লিখিত) দুইটি অমূল্য পুথিও নেপাল থেকে আবিষ্কার করেন। এই পুথি দুইটির আবিষ্কারও তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব।

হরপ্রসাদের প্রথম রচনা 'ভারত মহিলা' ১৮৮২ বঙ্গাব্দে ঋষি বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া আর্যদর্শন নব্যভারত, সাহিত্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, নারায়ণ, মানসী ও মর্মবাণী—সমসাময়িককালের এই সুপরিচিত পত্রিকা সমূহে তাঁর লেখা সাদরে প্রকাশিত হত। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম হল—ভারত মহিলা (১৮৮১), প্রাচীন বাংলার গৌরব (১৯৪৬) বৌদ্ধধর্ম (১৯৪৮), মেঘদূত ব্যাখ্যা (১৯০২)। প্রথম জীবনে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব শিষ্য রূপে এঁদের ভাষা ও রচনারীতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এঁদের প্রভাব মুক্ত হতে বেশী সময় লাগেনি। ভাষার স্বাতন্ত্র্যে, শব্দৈশ্বর্যে, ভাবের অনুধ্যানে এবং সুচিন্তিত নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তমুখী মানসিকতায় অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি হয়েছেন স্বতন্ত্র পথের যাত্রী।

হরপ্রসাদ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের সন্তান। তাঁর পূর্ব সুরীরাও ছিলেন কৃতবিদ্য ও যশস্বী। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর সহজ উত্তরাধিকার। এ ছাড়া পালি, প্রাকৃত এবং ইংরেজী ভাষাবিদ, বহু শাস্ত্রদর্শী হরপ্রসাদের অনন্য সাধারণ মনীষা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির তমসাঘন রুদ্ধদ্বার উন্মোচনে সদা নিযুক্ত থাকত। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম ও শিক্ষানীতি আলোচনায় তা ভাস্বররূপ পেয়েছে। 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' রচনা তাঁর ঐতিহাসিকবোধ, সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টির স্বাক্ষর। তিনি পুরাতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে তাঁর 'নেপালী বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য' প্রণয়নেও সাহায্য করেছেন। রাজেন্দ্র লাল হরপ্রসাদের ভারত জিজ্ঞাসু তীক্ষ্ণ মনীষার সন্ধান পেয়ে এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁকে 'a friend of mine'[৯] বলে লিখেছেন। কেবল ৪৭টি চর্যাপদ, প্রচুর শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার এবং বহু গ্রন্থ সংগ্রহেই তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি সীমায়িত ছিল না। সব্যসাচী হরপ্রসাদ সংগ্রহ ও গবেষণা দুই কর্মেই সমান সিদ্ধপুরুষ। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে অধিকাংশ প্রবন্ধ তিনি ইংরেজী ভাষায় লিখেছেন। বাংলা প্রবন্ধ স্বল্প। এ জাতীয় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য হল এগুলি কেবল নীরস ইতিহাস নয়। ইতিহাস ও সাহিত্যের মেলবন্ধন। উইলিয়াম জোন্স, উইলসন, কোলব্রুক প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিদের চিন্তা ও রচনাকে তিনি প্রমাণ্য মনে করেননি। এখানে তিনি বঙ্কিমের ভাবশিষ্য।

হরপ্রসাদ শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন পুথির পাঠোদ্ধার ইত্যাদি করে ভারত ও বাংলার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং লোক-সংস্কৃতির অপর্যাপ্ত ভান্ডার থেকেও তিনি দেশের ইতিহাসের তথ্য আহরণ করেছেন। তাঁর আলোচনা নৈয়ায়িকের ন্যায় তীক্ষ্ম এবং যুক্তিপ্রবণ ও গবেষণা ধর্মী। বৈজ্ঞানিকের ন্যায় বিশ্লেষণ পরায়ণ ও চিন্তাধর্মী। প্রত্নতত্ত্ব

আলোচনায় তিনি মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাবশিষ্য। উভয়ের প্রতিভাও সমপর্যায়ের। হরপ্রসাদ বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতিকে ভালোবেসেছিলেন। নিম্নলিখিত প্রবন্ধে তাঁর প্রাণের অকুণ্ঠ মমতা ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়—'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'আমাদের গৌরবের দুই সময়', 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান', 'ভাস্করের কাজ', 'বাংলায় সংস্কৃত', 'বাঙালী ব্রাহ্মণ', 'চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর', 'পালবংশের রাজত্বকালে বাঙ্গালার অবস্থা', 'পুরান বাঙ্গালার একটি খণ্ড' ইত্যাদি। প্রকাশের পরিচ্ছন্নতা, যুক্তিপূর্ণ সহজ বর্ণনা ও পাণ্ডিত্য এই রচনা সমূহকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রমাণ নির্ভর তথ্য সমৃদ্ধিও সুস্পষ্ট। তাঁর আলোচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিশ্ররূপ প্রতিভাত হয়েছে। হরপ্রসাদের আর একটি কীর্তিস্তম্ভ হল এশিয়াটিক সোসাইটির সংগৃহীত পুথির ডেসক্রিপটিভ ক্যাটলগ (Descriptive Catalogue)। পুথিগুলির তথ্য ভিত্তির উপর রচিত তাঁর ভূমিকা প্রাচ্য বিদ্যার এক অমূল্য সম্পদ।

সুপ্রণালীবদ্ধ, উচ্ছাসসংযত এ আকরগ্রন্থ যেমন বিশাল তেমনি জ্ঞানগর্ভ। "তিনি খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডের সোনা এবং খাদ অংশ পৃথক করতে জানতেন"। —এ মন্তব্য অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। Buddhist Text and Reasearch Society-র সম্পাদক রূপে ১৮৯৫ খ্রী তিনি প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ঐতিহ্যের গবেষণায়ও সহায়তা করেছিলেন।[৮]

হরপ্রসাদ রচনাবলীর ১ম সম্ভারের[৯] অন্তর্গত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ সমূহও বৌদ্ধ প্রসঙ্গ আলোচনায় তাঁর অন্যান্যসাধারণ মনীষার পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে—

'আমাদের গৌরবের দুই সময়', "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ', 'কুশীনগর', 'পাষাণের কথা', বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম', 'হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ', 'ধর্ম ঠাকুরের পূজা বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি', 'বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন' ইত্যাদি প্রবন্ধ বাচন ভঙ্গির সুন্দর সমন্বয়ে সমৃদ্ধ ও সারগর্ভ।

মহাকবি কালিদাস ছিলেন তাঁর একান্ত প্রিয় কবি। কালিদাসের সৌন্দর্য প্রিয়তা, রসমাধুর্য ও ভাবসম্পদ হরপ্রসাদের কবি মনের আনন্দময় স্পর্শ পেয়েছে। 'মেঘদূত' ও অন্যান্য কাব্য গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'মেঘদূত', 'রঘুবংশ', 'রঘুবংশের গাঁথুনি', 'কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা', 'পার্বতীর প্রণয়', 'দুর্বাসার শাপ' ইত্যাদি। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের দুর্বাসার শাপকে তিনি এক অনন্য সাধারণ গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। লিখেছেন 'শাপে রাজার চরিত্রটি খুবই খুলিয়াছে। তিনি রাজার মতন রাজা। মহাপুরুষ এমন কি দেবতাও হয়েছেন।' এ মন্তব্য রাজা দুষ্যন্তকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনার (comparative criticism) ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন দিগন্তের স্রষ্টা। 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র', 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' —এই পর্যায়ের তথ্য নির্ভর, রসদীপ্ত শিল্পকীর্তি। কালিদাস ও সেক্সপীয়ার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই দিক্‌পাল মহাকবি। হরপ্রসাদ এদের কবি প্রকৃতি ও রচনারীতির স্বরূপধর্ম সম্পর্কে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। দুই মহাকবির কবি-মানসের স্বরূপ প্রকৃতি তিনি সহজেই অনুধাবন করেছেন। তাঁর অনুভূতি সূক্ষ্ম ও রমনীয়। গভীর ও সহজবোধ্য। কালিদাস বাহ্য জগতের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়। সেক্সপীয়র অর্ন্তজগতের, মানুষের হৃদয়ের উপর আধিপত্য করেছেন।[১০] 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' লেখকের অসাধারণ ধীশক্তি বহুশ্রুতত্বের পরিচায়ক। সমসাময়িক কালে যে তিন কবির সাহিত্য ও ভাবাদর্শ নব্য বাঙালীর জীবন, সৃজন প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁরা হলেন—মহাকবি কালিদাস, পাশ্চাত্ত্য কবি বায়রণ এবং ঋষি কবি বঙ্কিমচন্দ্র। হরপ্রসাদ নিরপেক্ষভাবে এই তিন মনীষীর গুণাগুণ বিশ্লেষণ করেছেন। কালিদাস শাশ্বত কালের মহাকবি। চিরন্তন তাঁর

আবেদন। নব্যবঙ্গের যুবকগণ, প্রবলভাবে তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। বায়রণ বিদ্রোহের ঋত্বিক। সমাজ বন্ধনের ভয় তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। বঙ্গীয় যুবশক্তি তাঁর কাছে সমাজ বিদ্রোহের প্রেরণা পেয়েছে। বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্য কৃতির মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের গভীর রূপ ও জটিল তত্ত্ব বঙ্গীয় যুবকদের নূতন পথের দিশা দিয়েছে। তিন কবির তুলনা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদের সুচিন্তিত বিশ্লেষণ—'একজন সমাজ ভাঙ্গিতে', সমাজের অত্যাচারী নিয়মাবলী পরিবর্তন করিতে শিক্ষা দেন, সমাজ ছাড়িয়া গেলে কিরূপ সুখ হয়, তাহাই দেখান। একজন সমাজে থাকিয়া কতদূর সুখ ভোগ করা যাইতে পারে তাহাই দেখান। আর একজন সমাজের সহায়তায় ও উহার বিরোধে কিরূপ আনন্দ অনুভব করা যায় তাহাই দেখাইয়া শেষ করেন।'[১১] ত্রয়ী মহাকবির সংশ্লেসাত্মক **(Synthetic)** এই আলোচনা অভিনব ভাবে এক সৌন্দর্যরূপের সংযোজনা।

বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ জাতীয় প্রবন্ধেও হরপ্রসাদ তাঁর পারদর্শিতা ও পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে লেখকের উচ্ছ্বাস সংযত। তাঁর রচনা সুপ্রণালীবদ্ধ ও সারগর্ভ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তীক্ষ্ণ যুক্তি এই প্রবন্ধ সমূহের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। 'বাঙ্গালা ভাষা', বর্তমান শতাব্দীর বাঙালা সাহিত্য', 'নূতন কথা গড়া', 'বাঙালা ভাষার পরিণতি'। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে জাত হলেও ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপধর্ম রয়েছে। হরপ্রসাদ মুক্ত মনে এই স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। বক্তব্যের স্পষ্টতা ও যুক্তির তীক্ষ্ণতা এই প্রবন্ধ সমূহকে তথ্যনিষ্ঠ ও বিচার বিশ্লেষণ ধর্মী করে তুলেছে।

শাস্ত্রী মহাশয় তার সামাজিক প্রবন্ধ সমূহে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি কৌতূক মিশ্রিত শ্লেষ ও অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করেছেন। এ জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ', 'সমাজের পরিবর্ত কয় রূপ', 'তৈল' ইত্যাদি। এই প্রবন্ধ সমূহ তাঁর প্রগতিশীল মনের পরিচয়বাহী। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত হল সমাজ মানুষের জন্য। মানুষ সমাজের জন্য নয়। নিজের প্রয়োজনে মানুষই সমাজ গড়েছে। মানুষের মনের, শরীরের ও সংসারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। এই আলোচনায় লেখক — সমাজ সংস্কারক নন। সমাজ বিপ্লবী। 'তৈল' প্রবন্ধে লঘু ভঙ্গিতে দূরূহ বিষয় অবতারণা করেছেন। লিখেছেন, "বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।"

"যে তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান; তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকিলের পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না— বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোনো কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।"[১২] এই রচনায় শ্লেষ ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপাশ্রিত তরল হাস্যরস প্রাধান্য পেয়েছে। 'প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ' প্রবন্ধে অসংকোচে প্রচলিত বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে প্রণয় হল একটি শুদ্ধ আন্তরিক ভাব। বাহ্যিক কিছুর অস্তিত্ব প্রণয়ে থাকে না। প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্ত্য সমাজ বিবাহকে চিরস্থায়ী রূপ দিয়েছে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এক সূত্রের নিগূঢ় বন্ধনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখানে তাঁর বক্তব্য হল "চিরদিন যখন কিছুই থাকে না, সকল পদার্থেরই যখন প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হইতেছে, তখন আমরা কেমন করিয়া বলি যে, আমরণ আমরা এইভাবে থাকিব। ....এইরূপ অন্যায় হুকুম করা কি তোমার ঘোরতর অত্যাচার নহে।"[১৩] সর্বশেষ তাঁর অভিমত হল প্রচলিত বিবাহ প্রথা অপনীত হওয়ার যোগ্য। প্রকৃত প্রণয়ের সঙ্গে বিবাহের কোনও সম্পর্ক নেই। "প্রকৃত প্রণয় স্থলে বিবাহ প্রথা সমাজের হস্তক্ষেপ প্রণয়ীর অত্যন্ত ক্ষতিকর, উহা যত শীঘ্র অপনীত হয় ততই জগতের মঙ্গল।"[১৪]

শিক্ষা ও সমাজসেবা মূলক প্রবন্ধ সমূহে হরপ্রসাদ সত্যান্বেষী ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ। 'শিক্ষা' 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যে', 'কলেজী শিক্ষা' প্রবন্ধ সমূহে মহামহোপাধ্যায় প্রচলিত শিক্ষার বিরোধী। জাতীয় ভাবের উদ্দীপক শিক্ষানীতির পক্ষপাতী। প্রচলিত শিক্ষা সর্বতোমুখী নয়। কেবল স্মরণ শক্তির উৎকর্ষ সাধক। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শরীর চর্চার স্থান নেই। যা বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কার্যকরী শক্তির পরিপুষ্টি ঘটায়, যা মানুষকে দশের কল্যাণকার্যে প্রণোদিত করে তাই প্রকৃত শিক্ষা। হরপ্রসাদ নিজে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। শিক্ষাবিদ রূপে তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর মৌলিক চিন্তার গভীর পরিচয় এই প্রবন্ধ সমূহে সুচিহ্নিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রকৃত শিক্ষা, শিক্ষার আবশ্যকতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অধিকার-সীমা সুষ্ঠভাবে প্রসারিত করেছে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিণতি স্বরূপ সংস্কৃত আরবি-ফারসি আশ্রিত দেশীয় বিদ্যা চর্চার ধারা ক্রমশ তাৎপর্যহীন এবং পরিশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ সুস্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক। 'বাংলা সাহিত্য : বর্তমান শতাব্দী', প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, বৃটিশ রাজশক্তি দেশীয় উৎপাদন কেন্দ্র—কারুশিল্প ও কৃষিকে রূঢ়ভাবে বিধ্বস্ত করে। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল পরম্পরাগত সামাজিক বিন্যাসের ধারাকে ধ্বংস করা এবং আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার সূত্রপাত করে দেশ শাসনের উপযোগী কেরানী কূল তৈরী করা। সেকালের শিক্ষা নীতি তার দৃষ্টান্ত। এই নীতির নিপুণ রূপায়ণ করে এবং দেশজ কারুশিল্প ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে এদেশে আধুনিক শিক্ষার গোড়া পত্তন। ফলে প্রাচীন শিক্ষা ধ্বংস প্রাপ্ত হল। দেশীয় শিক্ষার আধুনিকতায় উত্তরণও আর সম্ভব হল না।

হরপ্রসাদের সাহিত্য-কৃতি এক বিশাল ঐশ্বর্য নিকেতন। কেবল প্রবন্ধ রচনাতেই তা সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রবন্ধকার রূপে তাঁর মর্যাদা ও বিশিষ্টতা তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে বাংলা উপন্যাসও এক রসসমৃদ্ধ পরিণতি লাভ করেছে। 'বেনের মেয়ে' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসের ভূমিকায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন—"বেনের মেয়ে একটা গল্প"।[১৫] বেনের মেয়ে খ্রী দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত সহজিয়া তন্ত্রের উপন্যাস। বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রভাবও পড়েছে। ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়ের অভিমত হল,— "সহজিয়াবাদের এমন সুন্দর সুললিত ম্যানুয়েল আর নাই। যে কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ে ইহা বৌদ্ধ দর্শনের পাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে।[১৬] এই বৃহদাকার উপন্যাসে হরপ্রসাদ নিপুন তুলিকায় সহজযানী বাংলার এক মনোরম কাল্পনিক ছবি এঁকেছেন। সে যুগের বাংলায় হিন্দু বৌদ্ধ জীবনাচরণে বহু বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও বাঙালীর মূল জীবন সাধনায় তার নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে এক সমন্বয়ী ঐতিহ্যই প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে বাঙালী নরনারী শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে পারস্পরিক মিলন ও সমন্বয় দ্বারা এক পূর্ণায়ত সার্বিক জীবনাদর্শের জয় ঘোষণা করেছিল।

উপন্যাসের রূপাবয়বের মধ্যে লেখক বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের ধর্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের ব্যক্তি সম্পর্কাশ্রিত গুহ্য সাধনজীবন এবং সমসায়মিক কালের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মনীষীদের জীবন স্মৃতির যুগচিত্র উপস্থাপিত করেছেন। সেকালের এই খন্ড-খন্ড চিত্রগুলি যেমন জীবন্ত তেমনি শোভন। এ সম্পর্কে সাহিত্য পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য—"সেকালের ইতিহাসই একালের উপন্যাসের মত। শাস্ত্রী মহাশয় নিপুন তুলিকায় সেকালের ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছেন।"[১৭]

বৌদ্ধ গাজন ও বিহার প্রতিষ্ঠার এবং গুণীজনকে পুরস্কার বিতরণী সভার সর্বাবয়ব চিত্র উপন্যাসের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। সে যুগের জ্ঞান, ধন-দৌলত ও সমৃদ্ধির অতল-স্পর্শতায় অবগাহন করে এ যুগের অনুসন্ধিৎসুদের দাবীকেই তিনি চরিতার্থ করেছেন। নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে

ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির সমন্বয়ে উপন্যাসটিকে তিনি সাবলীলতা দান করেছেন। সুদুর অতীতের অজ্ঞাত পটভূমিকায় রচিত হলেও উপনাসের মধ্যে কোথাও দুরবগাহতা নেই। বরং সে যুগের পরিবেশে মানব - জীবনের মর্মোৎসারী গভীর দৃষ্টির পরিচয় আছে। একটি গ্রন্থের অবয়বে সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন—এটাই হরপ্রসাদের বড় কৃতিত্ব।[১৮]

'কাঞ্চনমালা' (১৩২২ খ্রী) গ্রন্থকে লেখকের কৃতি পুত্র ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছেন। লিখেছেন, " 'কাঞ্চনমালা' একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস অর্থাৎ ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তুকে কাঠামো করিয়া কল্পনাবলে তাহাকে রক্ত, মাংস, বেশভূষা ও অলঙ্কারে সুশোভিত করা, যাহাতে বিষয় বস্তু হৃদয়গ্রাহী হয়।"[১৯] 'কাঞ্চনমালা' বৌদ্ধ চেতনার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। এক মহান আদর্শবাদের গভীর আবেগ উপন্যাসে উদ্ভাসিত হয়েছে। উপন্যাসের অবলম্বন ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' (৩য় খণ্ড)।[২০] কাঞ্চনমালা অশোক পুত্র কুনালের স্ত্রী। কুনাল অশোকের অন্যতমা মহিষী পদ্মাবতীর পুত্র। নবজাত শিশুর নয়ন ছিল কুনাল নামক হংসের ন্যায় মনোরম। অশোক পত্নী তিষ্যরক্ষিতা কুনালের আয়ত লোচনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আসক্তা হয়েছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপন্যাসে তিষ্যরক্ষিতার ষড়যন্ত্রে কুনালের চক্ষুরুৎপাটন হয়েছে। অবদানে সত্যক্রিয়ার দ্বারা কুনাল চক্ষু লাভ করেছে। হরপ্রসাদের উপন্যাসে কুনালের চক্ষু প্রাপ্তি বৌদ্ধ চন্ডালের গুরুদক্ষিণা। কাঞ্চনমালা বৌদ্ধ ক্ষান্তি ও সেবার মূর্ত প্রতীক। তিনি কাঞ্চনমালার দেহে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। কুনালও ক্ষমা ও তিতিক্ষার, ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক। এঁদের কাছে জগতের কোনও বস্তু, এমন কি দৈহিক সুখ-দুঃখও তুচ্ছ। প্রাণের গভীরতম অনুভূতির আনন্দে চরম শত্রুকেও তাঁরা ক্ষমা করেছেন।[২১]

'বাল্মীকির জয়' (১২৮৮) গ্রন্থে হরপ্রসাদ একজন অনন্য ধ্রুপদী শিল্পী। পৌরাণিক আখ্যানের মাধ্যমে দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি তাঁর আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে লেখকের ধারণালব্ধ সত্য দৃষ্টি ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থে ত্রিশক্তির—শারীরিক শক্তি, জ্ঞানের শক্তি এবং মৈত্রী বা প্রেমের শক্তির সংগ্রাম দেখানো হয়েছে। সংগ্রামে মৈত্রী বা প্রেমশক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে। গ্রন্থে প্রধান পাত্র তিন জন—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি। মহর্ষি বশিষ্ঠ ষষ্ঠি সহস্র শিষ্য পরিবৃত হয়ে আশ্রমে বাস করেন। তিনি পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ। শিষ্যদের জ্ঞানধর্মনীতি উপদেশ দেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়। দিগ্বিজয়ী। তাঁর বিপুল সংখ্যক সৈন্য পরিচালনা করে বিশ্বজয়ের বাসনা। বাল্মীকি দস্যুদলের অধিপতি। এছাড়া আছেন ঋভুগণ। তাঁরা গায়ক। তাঁদের গানের—'সুর যত জমিতেছে, কেবল যেন বলিতেছে ভাই ভাই। ঋভুরা যেন বাহুপ্রসারণ করিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খচর, জলচর সকলকে ডাকিতেছে এসো ভাই ভাই, এসো ভাই ভাই, এসো ভাই ভাই ভাই। সবাই ভাই। সুর জমিতেছে, যেন আরো ডাকিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সাবই ভাই।

পৃথিবী সুদ্ধ যেন বাজিয়া উঠিল ভাই ভাই। ব্রহ্মান্ড হইতে যেন প্রতিধ্বনি আসিল ভাই ভাই। পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম যেন গভীর সুরে বলিল ভাই ভাই। আমরা সাবই ভাই।[২২] তিনজনের হৃদয় এ গানের সুরে বিগলিত হল। বশিষ্ঠ ভাবলেন তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও তপোবলে পৃথিবীতে ভাই-ভাই স্থাপন করবেন। বিশ্বামিত্র ভাবলেন, সমগ্র বিশ্ব জয় করে আমি 'ভাই ভাই' করব। বাল্মীকির মনে শান্তি নেই। তিনি নিদারুন অনুতাপে কেঁদে-কেঁদে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করলেন। বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীর গুণে প্রলুব্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র শস্ত্রবলে কামধেনু নিয়ে যেতে চাইলেন। নন্দিনী সরস্বতী মূর্তিতে আর্বিভূতা হয়ে বললেন—আমি ব্রাহ্মণের বিদ্যা। কুলক্রমে ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করছি। কার সাধ্য আমাকে অপহরণ করে। নন্দিনীর দেহ হতে অসংখ্য

সৈন্য বর্হিগত হল। ঘোরতর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে বিশ্বামিত্র পরাজিত হলেন। তাঁর জীবনে এই প্রথম পরাজয়। বুঝলেন বাহু বলে পৃথিবী জয় করা যাবে না।

বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। তিনি বেদমন্ত্র দর্শন করলেন। এ মন্ত্র হল গায়ত্রী—ব্রাহ্মণ মাত্রেরই জপমন্ত্র। কিন্তু বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকৃত হল না। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় বিশ্ব সৃষ্টি করলেন। সে বিশ্বে হিংস্র জন্তু নেই। প্রকৃতি এখানে স্বভাব-সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন। সুখ ও ঐশ্বর্যদায়িনী। এ রাজ্যে মানুষও বড় সুখী। তারা সকলেই উন্নতির পথে ধাবমান। যুক্তিই একমাত্র মানুষের উপাস্য দেবাতা। অন্য কোনও দেবতা নেই। এখানে জন্ম সংখ্যা নির্দিষ্ট। মৃত্যু নেই। অন্য গ্রহান্তর থেকে পুনরাবর্তন আছে।

বাল্মীকি হিমালয়ের গহণ অরণ্যে কেবল রোদন করে বেড়ান। একদিন তিনি লীলাচঞ্চল ক্রৌঞ্চ মিথুনের ক্রীড়া দেখছেন। হঠাৎ এক ব্যাধের তীরে ক্রৌঞ্চের মৃত্যু হল। বাল্মীকির কণ্ঠে করুণ সুর ধ্বনি উঠল—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।

এ হল সেই চিরন্তন মুহূর্ত। দেবী সরস্বতী আর্বিভূতা হলেন। দেবীর হাতের বীণা দিলেন বাল্মীকিকে। বললেন এ বীণা তোমার ও তোমার মত লোকের হাতে চিরদিন থাকবে। তোমরা কেবল পরহিতব্রতে এর ব্যবহার করো।"

বিশ্বামিত্র তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতে তাঁর স্বজনবর্গ সহ কান্যকুব্জ নগরকে উঠিয়ে আনতে চাইলেন। নগর আকাশ পথে কিছু দূর উঠে যাবার পর মানুষের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। বিশ্বামিত্র পৃথিবীর বায়ু আকর্ষণ করলেন। কিন্তু পারলেন না। ব্রহ্মা বললেন—তোমার তপস্যার বল শেষ হয়েছে। তুমি স্থির হও। দেখা গেল, বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট পৃথিবী, যে পৃথিবীতে সমাজ বন্ধনে অত্যাচার ছিল না, ছোটো বড়ো ছিল না। যাহাতে কেবল প্রেম আর ঐক্য আর সাম্য ছিল তাহাও অনন্ত গর্ভে নিহিত হল। বিশ্বামিত্র মূর্ছিত হয়ে ঘুরতে-ঘুরতে শূন্য পথে পড়তে লাগলেন। এ সময় পৃথিবীতে মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত।

কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞ করবেন। যজ্ঞ হবে সংবৎসরব্যাপী। যজ্ঞে বাধাদানকারী পক্ষও শক্তিশালী। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হল। বাল্মীকি উভয় পক্ষের হাত ধরে শান্তি প্রচেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কান্নায় কারো মন গলে না। এমন সময় ঘুরতে ঘুরতে বিশ্বামিত্রের দেহ-পিন্ড যজ্ঞ-কুন্ডে পতিত হল। বাল্মীকি সকরুণ বীণা ঝঙ্কারে কেঁদে আকুল। ক্রমে বিশ্বামিত্রের জ্ঞান হল। ব্রহ্মা বললেন—'বৎস, তুমি আজ ব্রাহ্মণ হলে।' বিশ্বামিত্র দেখলেন, একজন গায়ক গান করছেন। আর সমগ্র বিশ্ব সে গানে কেঁদে ব্যাকুল। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। ব্রহ্মা বললেন, "বাল্মীকি আজ তোমারই জয়"। চারিদিক হতে ধ্বনি উঠল—'জয়, বাল্মীকির জয়"।

ব্রহ্মা ঋষিত্রয়কে সর্বলোক মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য নারায়ণের অবতরণ সংবাদ প্রদান করলেন। বাল্মীকির উপর ভার দেওয়া হল রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করার জন্য। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করলেন। তাঁর শিষ্য কুশলবকে তিনি রামায়ণ গান শেখালেন। ঋভুগণ বাল্মীকির জয় ধ্বনি দিলেন। বিরাট বিশ্বলোকে প্রতিধ্বনিত হল—

"জয় বাল্মীকির জয়"।

প্রাচীন ঋষিরা একদিন উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন

ভবতু বিশ্ব একনীড়ম্।

CENTRAL LIBRARY

এই ভাবাদর্শ আর একবার ধ্বনিত হয়েছে ঋভুদের কণ্ঠে—"ভাই ভাই" "সবাই ভাই ভাই"। সবাইকে ভালবাসলে মনের কালিমা দূর হয়। বাল্মীকি ছিলেন নরহত্যাকারী দস্যু। ঋভুদের গান শুনে তিনি হলেন কোমল হৃদয় মানব প্রেমিক। বিশ্বের আদি কবি। তিন ঋষি—বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি। জয়ী হলেন বাল্মীকি। জ্ঞান আর শক্তি নয়। প্রেমই জয়ী হল।

হরপ্রসাদ লোক কথার আধারে একটি অনবদ্য গল্প পরিবেশন করেছেন। নাম "পাঁচ ছেলের গল্প"। গল্পে রাজপুত্রের চার বন্ধু—গুরুপুত্র, পাত্রের পুত্র, পুরু পুত্র আর কোটালের পুত্র। তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী নামকরণ হয়েছে—পুণ্যবন্ত, প্রজ্ঞাবন্ত, রূপবন্ত, শিল্পবন্ত আর বীর্যবন্ত। এদের চরিত্রগত বৈচিত্র্য রয়েছে। পুণ্য, প্রজ্ঞা, রূপ, শিল্প ও বীর্য এদের বৈশিষ্ট্য। পাঁচ বন্ধুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাও করলেন পাঁচ বিষয়ে। এবার কার অধীত বিদ্যা বড় বিচার করতে হবে। ওরা ভিন্ন রাজ্যে গিয়ে নিজেদের অধীত বিদ্যানুযায়ী রোজগার করে খরচ চালাতে লাগলেন। পাঁচ বন্ধুই আপন আপন শিক্ষার পুরস্কার পেলেন। পুণ্য, প্রজ্ঞা, রূপ, শিল্প, বীর্য কোনটাই অবজ্ঞার নয়। সবই মানুষের কাজে প্রয়োজন। গল্পের ভাষা ও পরিবেশন কৌশলও লোককথার আঙ্গিককে অনুসরণ করেছে। তিনি অতি সুন্দরভাবে গল্পের ধারাবাহিকতা ও সূত্র নির্ধারণ করেছেন।

"ঠানদিদিদের গল্প যখন বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে জাতক। যখন মহাযানীরা বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে অবদান। যখন ব্যাসদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে সংবাদ। আবার বিষ্ণুশর্মার মুখে হইয়াছে পঞ্চতন্ত্র। এখানকার পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোকদের কাছে হইয়াছে ব্রতকথা।"[২৩]

বাংলা ভাষার স্বরূপ—প্রকৃতি, রীতি ও ভাবৈশ্বর্য তাঁর আয়ত্ত্বে ছিল। প্রবন্ধ ও উপন্যাস ইত্যাদি রচনাবলীর মাধ্যমে তাঁর ভাষা শৈলীর সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা লিখিত ভাষার দ্বিবিধ সাধু ও চলিত পদ্ধতিতে তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণযোগ্য—"বাংলা রচনায় গোড়া থেকেই হরপ্রসাদের একটু বিশেষ ক্ষমতা (flair) ছিল। পন্ডিত তিনি। সাধু ভাষার দখল তাঁর স্বতঃসিদ্ধ। সেই সঙ্গে তাঁর আসক্তি ছিল চলিত ভাষার বিষয়ে। হরপ্রসাদ যে প্রবন্ধ ক'টি লিখেছিলেন তার মূল্য এখনো কম নয়। তাঁর মতো ভাষা জ্ঞান ও ভাষাবোধ নিয়ে কম লেখকই বাংলা লিখেছেন।"[২৪] অবশ্য তাঁর রচনা সংগ্রাহক অভিযোগ করেছেন—"তাঁর বই বা পত্রিকার লেখায় কোথাও বানান ব্যবহারে শৃঙ্খলা নেই। তৎসম শব্দের বিকল্প রূপ এবং তদ্ভব, দেশী, বিদেশী সমস্ত শব্দেরই একাধিক বানান তিনি মিশিয়ে ব্যবহার করেছেন। এমন কি একই লেখার মধ্যে এক—একটি শব্দের দু'রকম বানান পাওয়া যাচ্ছে।"[২৫] বোঝা গেল হরপ্রসাদের রচনায়ও ত্রুটি আছে। চাঁদেও কলঙ্ক থাকে। কলঙ্কটা বড় নয়। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার রূপ লাবণ্য ও সুষমায় চাঁদ মহিমান্বিত। হরপ্রসাদের ভাষার বলয়িত গতি মাধুর্য তাঁর রচনাকে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল করেছে। তাঁর ভাষা-প্রতিমা তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দের Trinity সৌধ। প্রসাদগুণ এবং ভাব ও বোধের সমন্বয়ে তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত লেখক। কিন্তু লেখায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য নেই। অলঙ্কার বা বিশেষণের আধিক্যে ভাষা কোথাও শ্লথগামিনী হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব শিষ্য হয়েও তিনি বাংলা ভাষার জন্য এক সহজ ঋজু পথের দিশারী ছিলেন। অতি সূক্ষ্ম মৃদুল রসিকতা তাঁর ভাষা শৈলীকে উপভোগ্য করেছে। অপ্রচলিত দেশীয় এবং আঞ্চলিক ভাষার প্রতিও তাঁর মমতার নিদর্শন পাওয়া যায়। 'বামুনের দুর্গোৎসব' রচনা থেকে অনুরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত আহরিত হল—[২৬]

শব্দ	পৃষ্ঠাঙ্ক
নুন্‌ধগড়িপানা ছেলে	৪৩৩
ঢলাঢলি	৪৩৫

কানছ	৪৩৫
আড়া	৪৩৫
দোব্জা	৪৩৬
নাগরি	৪৩৬
থুহ	৪৩৭
রোখ	৪৩৯
হোগলকঁড়েয়	৪৪০
বাল্দেলি	৪৪০
বউনি	৪৪২
কিতাববতি	৪৪২
কিতাবতি	৪৪২
ঝিঙ্কুর	৪৪৪
তল্লিদার	৪৪৪
চিয়াইতে	৪৪৭

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর বিষয়ের বিপুলব্যাপ্ত পরিধি যা পরিক্রমা তত সহজ সাধ্য নয়। দুষ্প্রাপ্য জাতীয় সম্পদের আবিষ্কার, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি প্রাচীন বাঙালী সমাজের জীবন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বহুমুখীন প্রসারিত রচনাসম্ভার তাঁর অনন্য সাধারণ মনীষার পরিচয়বাহী। অন্ন-ব্রহ্ম মানুষের জৈবিক ক্ষুধার তৃপ্তি ঘটায়। কিন্তু আত্মিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য চাই বাণী-ব্রহ্ম। বাণীই সর্ববস্তুর প্রকাশিকা। এজন্য অক্ষরাঞ্জলি দিয়েই মানব-সভ্যতার জয় যাত্রার সূচনা। মহাশ্বেতার চরণতলে অক্ষরাঞ্জলি নিবেদন করে হরপ্রসাদ হয়েছেন বাণীর বরপুত্র। মহাভারতে বলা হয়েছে—

শ্রুতেন তপসা বাপি শ্রিয়া বা বিক্রমেণ বা
জনান্‌যোভিভবতান্যান্‌ কর্মণা হি সর্বৈ পুমান্‌।[27]

যিনি বিদ্যাদ্বারা তপস্যার দ্বারা, ঐশ্বর্যের দ্বারা বা বিক্রমের দ্বারা অপর সকলকে অতিক্রম করেন তিনি যথার্থ পুরুষ। এরূপ যথার্থ পুরুষের সামগ্রিক উপাদান পরিপূর্ণভাবেই হরপ্রসাদের মধ্যে বর্তমান ছিল। হরপ্রসাদের মত ব্যক্তিত্বকে উপনিষদের ভাষায় বলা যায় 'যুক্তাত্মা'। যিনি যুক্তাত্মা তিনি সকলের সঙ্গে যুক্ত, সকলের জন্য কাজ করেন। তিনি জানেন, যিনি পরমানন্দঃ পরমাগতিঃ সেই পরমাত্মা সমস্ত প্রাণি-জগতের মধ্যে বিরাজমান। হরপ্রসাদ মহামহোপাধ্যায় নির্ভয়ে সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে আমাদের সেই অতীত ঐশ্বর্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করিয়ে দিয়েছেন।

নমো নমস্তে'স্তু সহস্রকৃত্বঃ।

নির্দেশিকা—

১। সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৯৫৯, পৃঃ ৩৩।

২। উপাধ্যায়, উপ-অধি-ই-তা (ষএচ্) - অপা, রাষ্ট্রীয়। উপাধ্যায় রাঢ়ীয় কুলিন ব্রাহ্মণের কৌলিন্য সূচক উপাধি। যিনি বৃত্তির নিমিত্ত বেদ বেদাঙ্গাদি অধ্যাপনা করেন। মহামহোপাধ্যায়, কর্মধারয়। মহোপাধ্যায়েরও শ্রেষ্ঠ বা গুরু। মহাপন্ডিতের উপাধি বিশেষ। ইংরেজ রাজকর্তৃক প্রদত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে পান্ডিত্যের স্বীকৃতি সূচক উপাধি। পন্ডিত চূড়ামণি।

৩। শৈশবে তাঁর নাম ছিল শরৎ নাথ ভট্টাচার্য। এ সময় তিনি একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হন। শিবের কৃপায় বালকের রোগ মুক্তি ঘটে। তাঁর নূতন নাম হয় 'হরপ্রসাদ'।

৪। Sir William Jones প্রাচ্য দেশীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের জন্য ১৭৮৪ খ্রী., ১৫ই জানুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।

৫। The Sanskrit Buddhist Litterature of Nepal, 1882, ভূমিকা পৃঃ xiii দ্রষ্টব্য।

৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ১ম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষৎ, ভূমিকা, পৃঃ ৩৩।

৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ১ম, ভূমিকা প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

৮। নানা নিবন্ধ, সুশীল দে, পৃঃ ৩০১।

৯। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিল কুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত, ১৩৬৩, পৃঃ ৩৭৭-৪৩৪।

১০। হরপ্রসাদ রচনাবলী, বসুমতী সং ১৯৩২, পৃঃ ২৬৫।

১১। হরপ্রসাদ গ্রন্থবলী, বসুমতী সং, ১৯১৯ পৃঃ ২৮১।

১২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ১ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯-৯০।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৭-৭৮।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৮।

১৫। হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, বসুমতী, মুখপাত।

১৬। বেনের মেয়ে, প্রবাসী, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, মাঘ সং লিখিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধ।

১৭। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮। বিস্তৃত আলোচনার জন্য লেখিকার 'বাংলা সাহিত্যে ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি', ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৯, পৃঃ ৪২৬-৩৩ দ্রষ্টব্য।

১৯। হরপ্রসাদ রচনাবলী, ২য়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিল কুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত, মুখবন্ধ, পৃঃ ২৯৬।

২০। অনু শরৎচন্দ্র দাস, কুনালাবদান, পৃঃ ৫১৭।

২১। বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি' প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩৩ দ্রষ্টব্য।

২২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ১ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৩-৫৪।

২৪। প্রাগুক্ত, প্রারম্ভবচন, পৃঃ ১৯-২০।

২৫। প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃঃ ৪৩-৪৪।

২৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ১ম, প্রাগুক্ত।

২৭। মহাভারতম্, হরিদাস সীদ্ধান্ত বাগীশ প্রণীত, উদ্যোগ পর্বণি, চতুর্বিংশত্যধিক শততমো অধ্যায়ঃ, শ্লোক ২৪।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম

বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী

জ্ঞানতপস্বী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রদাস শাস্ত্রী, এম.এ., ডি.লিট, সি.আই.ই. মহোদয় ছিলেন একাধারে সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র ও ইতিহাস বিশারদ। তাঁর পিতা ছিলেন নৈহাটীর খ্যাতনামা সংস্কৃত অধ্যাপক রামকমল ন্যায়রত্ন এবং মাতামহ ছিলেন বরাহনগরের বিখ্যাত পণ্ডিত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার আর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নন্দকুমার ভট্টাচার্য। কাজেই পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিকেই সংস্কৃত চর্চার পরিবেশে শিক্ষালাভ করে সাথে সাথে মেধাবী ছাত্র হিসাবে জাতীয় ইংরাজী শিক্ষায় ও কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে নয় বৎসর কাল উক্তপদে কৃতিত্ব সহকারে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং এর আগে ও পরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে পুঁথি সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত থাকেন। এই উপলক্ষে রাজেন্দ্র লাল মিত্র, ও সোমা ডেকোরোস, সিসিল ব্যান্ডেল প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তিদের সহযোগে কাজ করেন ও পুঁথি সংগ্রহের সন্ধানে বার বার নেপাল যাত্রা করেন। সমাজসচেতন এই মহাবিদ্যান ব্যক্তি দুরূহ পুঁথি সম্পাদনের কাজে আজীবন যেমন আত্মনিয়োগ করেছেন তেমনি এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপদে অধিষ্ঠিত থেকে কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে তিনি অজস্র লিখেছেন অনলসভাবে সহজ, সরল অনাড়ম্বর ভাষায়। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণার সাথে সাথে বাংলা গল্প উপন্যাস রচনার চর্চা করেছেন। তিনিই আদি বাংলার উৎস আবিষ্কারের পথিকৃৎ। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ পুঁথি সম্পাদন করতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম চর্চার প্রতি আগ্রহী হন। তাঁর বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কীয় সংস্কার মুক্ত অনবদ্য রচনাগুলি বৌদ্ধধর্মের বিশ্লেষণে যেমন সুপরিস্ফুট তেমনি অন্ধকারচ্ছন্ন অধ্যায়গুলি আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর বহুবিধ রচনার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক নিম্নলিখিত গ্রন্থ এবং নিবন্ধাবলী উল্লেখযোগ্য—

১। গ্রন্থ সম্পাদন—আর্য্য ভদন্ত মহাকবি অশ্বঘোষ বিরচিত সৌন্দরনন্দ কাব্য, ১৯১০।

২। অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ—একাদশ শতাব্দীর অদ্বয়বজ্রের দর্শন সম্পর্কীয় ২০টি গ্রন্থের সংকলন। ১৯২৭।

৩। বৌদ্ধ গান ও দোহা—হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গলা ভাষায় চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণবের চর্য্যাপদগুলির প্রামাণ্যপাঠ ও সটীক বঙ্গানুবাদ, ১৯৫১।

৪। বৃহৎ স্বয়ম্ভু পুরাণ, ১৮৯৪-১৯০০।

৫। Six Buddhist Nyaya Tracts ১৯২০।

৬। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত।

৭। আর্য্যদেবের চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ, এছাড়া অন্যান্য রচনা।

৮। Descriptive Catalogue, Vol. I, ১৯১৭।

৯। Catalague of Palm Leaf and Selected MSS belonging to the Durbar Library, Nepals, Vol. I, 1905; Vol. II, 1915.

১০। Notes on Palm Leaf Manuscripts in the Library of the Maharaja of Nepal (Journal of Asiatic Society of Bengal, 1897).

CENTRAL LIBRARY

১১। Northern Buddhism, Indian Historical Quarterly, 1925.

১২। রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থ সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ডে নিম্নলিখিত বৌদ্ধ বিষয়ক নিবন্ধাবলী আছে:

(ক) বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার গুরু কে?
(খ) নির্বাণ
(গ) নির্বাণ কয় প্রকার?
(ঘ) কোথা হইতে আসিল?
(ঙ) কোথা হইতে আসিল (২)
(চ) হীনযান ও মহাযান
(ছ) সহজযান
(জ) মহাযান কোথা হইতে আসিল?
(ঝ) বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত
(ঞ) বৌদ্ধধর্ম কোথা গেল?
(ট) এখনো একটু আছে
(ঠ) উড়িষ্যার জঙ্গলে
(ড) জাতক ও অবদান
(ঢ) দলাদলি
(ণ) মহাসাঙ্ঘিক মত
(ত) থেরবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক
(থ) মানুষ ও রাজা (এই কয়টি নিবন্ধ সংকলন 'বৌদ্ধধর্ম' নামে গ্রন্থ পূর্বাশা লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৫৫)
(দ) রত্নাকর শান্তি
(ধ) বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম
(ন) হিন্দু বৌদ্ধে তফাত
(প) বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন
(ফ) বাংলার বৌদ্ধ সমাজ; হিন্দু ও বৌদ্ধ
(ব) ভারতের ভক্তিসাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব
(ভ) Buddhism in Bengal since the Muhammedan Conquest.

শাস্ত্রী মহোদয়ের রচনার তালিকা দেখে বোঝা যায় বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাই রচনাবলীও বৈচিত্র্যময়। বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও প্রসার বৌদ্ধ সঙ্ঘে দলাদলি ও বিভিন্ন শাখার আবির্ভাব ও মহাযানের বিকাশ এবং হীনযানের মূলতত্ত্বের তুলনামূলক বিচার তাঁর আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি বজ্রযান সহজযানের খুঁটিনাটি তথ্য সম্বলিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিবরণ ও সমাজে প্রভাব, এমন কি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধদের অবস্থা ও আচার-আচরণ ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে বৌদ্ধধর্মে সামগ্রিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর রচনার নির্বাচিত অংশের উদ্ধৃতির সাহায্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর আংশিক পরিচয় প্রদানের মধ্যে বর্তমান নিবন্ধ সীমাবদ্ধ রইল।

গৌতম বুদ্ধ ও তদ্প্রবর্তিত ধর্ম এবং মহাযান সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন আবার তান্ত্রিক আচার পদ্ধতি এই ধর্মের অধঃপাতের কারণ বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। 'বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে' নিবন্ধে তিনি বলেছেন, "বৌদ্ধধর্ম যত লোকে মানে এত লোকে আর কোন ধর্ম মানে না। চীনের প্রায় সমস্ত লোকই বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং সাইবেরিয়ার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিব্বতের সব লোক বৌদ্ধ। ভুটান, সিকিমের সব লোক বৌদ্ধ। নেপালের অর্ধেকেরও বেশি বৌদ্ধ। বর্মা, সায়াম ও আসামের সব বৌদ্ধ। সিংহল দ্বীপে অধিকাংশ বৌদ্ধ।

বৌদ্ধ ধর্ম না মানিলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধদিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো অনেক জায়গায় বৌদ্ধমত একটু বিকৃতভাবে চলিতেছে। চাটগাঁ, রাঙ্গামাটিরত কথাই নাই। উহারা বর্মা আরকানের শিষ্য।

এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আরও বিস্তার হইয়াছিল। তুর্কীস্থান এককালে বৌদ্ধধর্মের আকর ছিল। সেখান হইতে সাময়েদরা এবং তুর্কীস্থানের পশ্চিমের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছিল। পারস্য এককালে বৌদ্ধ প্রধান ছিল। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পুরাই বৌদ্ধ ছিল।"

"কোথা হইতে আসিল (২)" নিবন্ধে তিনি বলেছেন "বুদ্ধদেবের পূর্বে ও লোকে সংসার ত্যাগ করিত। ভিক্ষু হইত; যেমন পার্শ্বনাথের দল, কনকমুনির দল কিন্তু বুদ্ধদেব যে বিহার ও সঙ্ঘারামের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন তাহা তাঁহার নিজের, ভিক্ষুদিগের শাসনের জন্য যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের, এক জায়গায় অনেক ভিক্ষুর থাকার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের, এইরূপ অনেক ভিক্ষু একত্র থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ গোলযোগ যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের তিনি রাজার ছেলে, রাজা হইবার সবশিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। ভিক্ষুসঙ্ঘের পরম উন্নতির জন্য, তাঁহার সেসব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার সঙ্ঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর কাহারও হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাহাতে বুদ্ধের ধর্ম এত বড়, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়, যাহার জন্য বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান, যাহার জন্য সকল ধর্ম অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম এত উদার, সেটি তাঁহার মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ 'মাঝামাঝি চল, বাড়াবাড়ি করিও না।' অহিংসা পালন করিতে হইবে বলিয়া, একেবারে মুখে কাপড় বাঁধিয়া চল যেন কোন কীট মুখে ঢুকিতে না পারে। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিও না, পাছে তাহাতে কীট-পতঙ্গ পড়ে। বুদ্ধদেব এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে বলেন না। তিনি বলেন ইচ্ছা করিয়া কেনা জীবহত্যা করিও না। তাহা হইলেই অহিংসা ধর্মপালন হইবে। তিনি বলেন অত্যন্ত ভোগাসক্তি ভাল নয়। এই মধ্যমা প্রতিপৎ, এইটিই বৌদ্ধধর্মের মজ্জা, সার নিগূঢ় কথা উপনিষৎ। বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, সর্ব বিষয়ে মধ্যমা প্রতিপৎ অবলম্বন করিয়াই চলিতেন, শিষ্যদিগকে শিখাইতেন। দুটো বিরোধী জিনিষ উপস্থিত হইলে, সে দুটার বিরোধ মিটাইয়া দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।"

'হীনযান ও মহাযান' নিবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় হীনযান ও মহাযান এই দুই প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে হীনযান বলে কোন যান নেই। মহাযানরা আগেকার বৌদ্ধদের হীনযান বলত। আগে দুটো যান ছিল— (১) প্রত্যেক বুদ্ধযান অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি যে উপায়ে নিজের চেষ্টা বা উদ্যমে জন্মজরা মরণ থেকে অব্যাহতি পেতে পারতেন, (২) শ্রাবকযান অর্থাৎ যাঁরা বুদ্ধের মুখে ধর্ম উপদেশ শুনে ভিক্ষু হতেন। ধ্যান ধারণা

করে প্রথমে স্রোতাপন্ন, তারপরে ক্রমে ক্রমে সকৃদাগামী, অনাগামী ও শেষে অর্হত্ব লাভ করে মুক্ত হবেন। আর মহাযানেরা আপনাদের মহাযান বলে, যেহেতু তারা নিজের উদ্ধারের জন্য তত ভাবে না, জগৎ উদ্ধারই তাদের মহাব্রত। হীনযান অর্হত্ব পেলেই খুশী, মহাযান তাতে খুশী নয়, তারা বুদ্ধত্ব চায়। বুদ্ধত্ব লাভ করতে হলে বোধিসত্ত্বের ব্রত অর্থাৎ বোধিচিত্তোৎ করতে হয় যে জগতের একটি প্রাণীও মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত সে বুদ্ধত্ব চায় না। বোধিসত্ত্বকে ষট্‌পারমিতা পালন ও ধ্যান সমাধি করতে হয়। মহাযানে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের সংখ্যা অসংখ্য। নিবন্ধের উপসংহারে শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, "এইরূপে হীনযান ও মহাযান যতই তুলনা করি, ততই আমাদের মনে হয়, যে হীনযান ধর্মনীতি ও সমাজনীতি লইয়া ব্যস্ত, আর মহাযান দার্শনিক মত ও পারমিতা লইয়া ব্যস্ত। স্বভাবচরিত্র বিশুদ্ধ হইলে, মানুষ পৃথিবীর বস্তু ছাড়িয়া কোন উচ্চতর বস্তুর আকাঙ্খা করিলে নিশ্চয়ই বড় হয়। হীনযান মানুষকে সেইরূপ বড় করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাযান মানুষকে সর্বময়, সর্বনিয়ন্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাযান মানুষকে সর্বময়, সবনিয়ন্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। দর্শনে তাঁহারা শূন্যবাদী নীতিতে তাঁহারা করুণাবাদী। তাই তাঁহারা আপনাদিগকে বড় বা মহা মনে করিতেন ও শ্রাবক ও প্রত্যেকযানকে হীন বা ছোট মনে করিতেন। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ সম্পর্কে যে আলোচনা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় করেছেন, তাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়েছে। 'নির্বাণ' নিবন্ধে তিনি বলেছেন, "মোটামুটি ধরিতে গেলে নির্বাণ শব্দে নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। প্রদীপ যেমন যায়। তেমনিই মানুষ নিবিয়া গেল। প্রদীপ নিবিয়া গেলে কিছু থাকে না; মানুষ নিবিয়া গেলেও কিছুই থাকে না। এ কথাটা শুনিতে যত সোজা, ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে তত সোজা নয়। প্রদীপ নিবিয়া গেল, আর কিছু নাই, একেবারে শেষ হইয়া গেল, কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি সেইরূপ একেবারে শেষ হইয়া যায়? একেবারে 'নিহিল', হইয়া যায়? একেবারে 'এনিহিলেসন' হইয়া যায়? একেবারে নাস্তি হইয়া যায়? এইখানেই গোল বাধিল। আমি একেবারে থাকিব না এবং সেইটিই আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবে? আমি তপ জপ, ধ্যান ধারণা করিব, শুদ্ধ আমার অস্তিত্বটি বিলোপ করিবার জন্য? এত বড় শক্ত কথা।

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছেন। বুদ্ধ নিজে কি বলিয়াছেন তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। পালি ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট তৈয়ারি হইয়াছিল সেই রিপোর্ট মাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও ঐরূপ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়া সহিতই নির্বাণের তুলনা করে। কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে নির্বাণের পর কি থাকে। সুতরাং নির্বাণে যে একেবারে সব শেষ হইয়া যায়, তাঁহার শিষ্যরা ভাবিতে যেন ভয় পাইত। বুদ্ধদেব সে কথার কি জবাব দিলেন, আমরা পরে তাহা বিবেচনা করিব।"

এরপর শাস্ত্রীমশাই বৌদ্ধ দার্শনিক কবি ও প্রচারক অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নির্বাণ সম্বন্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। তার গদ্যানুবাদ হচ্ছে, "প্রদীপ যেমন নিবার্ণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাশেও যায় না, কোন দিগ্‌বিদিকে ও যায় না, তৈলের ও শেষ প্রদীপটিরও শেষ; সাধক ও তেমনই ভাবে নির্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান না। আকাশেও যান না কোন দিগবিদিকে যান না। তাঁহার সকল ক্লেশ ফুরাইয়া গেল। তাঁহার ও সব ফুরাইয়া গেল। সব শান্ত হইল।"

এইখানে কথা হইতেছে 'উপেতি শান্তিম'—'সব শেষ হইয়া গেল'— ইহার অর্থ কি নিহিল? ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ? অশ্বঘোষ ও নির্বাণের পর আর কিছু থাকিল কিনা, কিছুই বলিলেন না। এই দুইটি কবিতার পরই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। কিন্তু এই কবিতা

CENTRAL LIBRARY

দুইটির পূর্বেই যে তিনটি কবিতা আছে, তাহা পড়িলে নির্বাণ যে অস্তিত্বের লোপ এরূপ বোধ হয় না। কবিতা তিনটির বঙ্গানুবাদ হল—"অতএব তৃষ্ণা প্রভৃতিই নানাবিধ জন্মের হেতু, এইটি মনে মনে বুঝিয়া, তোমার যদি মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই তৃষ্ণাকে ছেদ কর। যেহেতু কারণের ক্ষয় হইলে, কার্যের ও ক্ষয় হইবে।

এখানে তৃষ্ণাদি হেতুর ক্ষয় হইলে, তোমার দুঃখের ও ক্ষয় হইবে। অতএব তুমি ধর্মকে প্রত্যক্ষ কর। এই 'ধর্ম' শান্তিময়, মঙ্গলময়, ইহাতে তৃষ্ণার উপর বিরাগ হয়, ইহা গুহার মত, ইহাতে সবধর্মের নিরোধ হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম, ইহতেই পরিত্রাণ, ইহা কেহ হরণ করিতে পারে না, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইহাই চরম এবং অচ্যুত পদ। ইহাতে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই, শত্রুসমাগম নাই, নৈরাশ্য নাই, প্রিয়বিরহ নাই, ইহাই পাইবার মত যত জিনিষ।"

শাস্ত্রী মশাই এরপর বলেছেন, "যখন অশ্বঘোষ এই তিনটি কবিতার পর নির্বাণের ঐ দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তিনি নির্বাণশব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে নির্বাণের পর আর কোনরূপ পরিবর্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বেরও হইবে না।

পালি ভাষার পুস্তকে বুদ্ধদেবকে নির্বাণের পর কি থাকিবে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কি উত্তর দিয়াছেন দেখা যাক। "নির্বাণের পর কিছু থাকিবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন "না"। "থাকিবে না কি?" উত্তর হইল না। "থাকা না থাকার মাঝামাঝি কোন অবস্থা হইবে কি বুদ্ধদেব বলিলেন না"। "কিছু থাকা না এদুয়ের বাহিরে কোন বিশেষ অবস্থা হইল কি?" আবার উত্তর হইল না।

তবে দাঁড়াইল কি? এমন একট অবস্থা দাঁড়াইল, যে অবস্থার "অস্তি" ও বলিতে পারি না। "নাস্তি" ও বলিতে পারি না। এদুয়ে জড়াইয়া কোন অবস্থা নয়, এদুয়ের অতিরিক্ত কোন অবস্থাও নয়। ইহাতে পাওয়া গেল কোন অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। মানুষের জ্ঞানের বাহিরে।

এই অবস্থাকেই মহাযানে শূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। "শূন্য" বলিতে কিছুই নয় বুঝায়, অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথাই বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ পন্ডিতেরা বলেন "আমরা করি কি আমরা যে ভাষায় শব্দ পাই না। নির্বাণের যে অবস্থা হয় তাহা যে বাক্যের অতীত ঠিক কথাটি পাই না বলিয়াই আমরা উহাকে "শূন্য" বলি। কিন্তু শূন্য শব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এমন অবস্থা বুঝাইতে চাই যাহা অস্তিনাস্তি প্রভৃতি চারি প্রকার অবস্থার অতীত। 'অস্তিনাস্তিতদুভয়ানুভয়—চতুষ্কোটি বিনির্মুক্তং শূন্যম্'। হরপ্রসাদের মতে কবি অশ্বঘোষ যে নির্বাণের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন বা পালি সাহিত্যে নির্বাণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় নির্বাণ একটি অনির্বচনীয় অবস্থা। শুধু বাক্যের অতীত নয়, মানুষের ধারণারও অতীত। পরবর্তীকালের বৌদ্ধগণ মনে করতেন সংসার হল ভাব আর নির্বাণ অভাব। আর পরবর্তীকালে, বিশেষ করে সহজযানের প্রবক্তাগণ মনে করতেন ভব বা সংসারের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। তা অতীব পদার্থ। তাঁরা সহজেই বললেন,

অপনে রচিরচি ভবনির্বাণা।
মিছা লোক বন্ধাব এ অপণা।।

অর্থাৎ "ভব ও শূন্যরূপ, নির্বাণ ও শূন্যরূপ। ভব ও নির্বাণে কিছুই ভেদ নাই। মানুষে আপন মনে ভব রচনা করে নির্বাণ ও রচনা করে। এইরূপে তাহারা আপনাদের বদ্ধ করে। কিন্তু পরমার্থতঃ দেখিতে গেলে কিছুই কিছু নয়। সবই শূন্যময়।" সহজযানীদের মতে "যে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা বালজাতীয় অর্থাৎ মূর্খ লোকে বদ্ধ হয়, পন্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহাতেই মুক্ত হয়।"

অতঃপর শাস্ত্রী মহোদয় আর এক উপায়ে নির্বাণ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন। সেটা হচ্ছে বোধিচিত্তের বিকাশ সাধনের দ্বারা নির্বাণ উপলব্ধি করা। মানুষের চিত্ত যখন বোধিলাভের জন্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হয় তখন তাকে বোধিচিত্ত বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে সদ্ধর্মপথে অগ্রসর হয়। ফলে ইহ জন্মে বা পরজন্মে বোধিলাভ হতে পারে। বোধিচিত্ত মানুষেরই হয়। থেরবাদ বা হীনযান মতানুসারে দান, শীল, সমাধি ইত্যাদি পারমিতা সম্পাদানের দ্বারা বোধিচিত্ত ক্রমে ক্রমে কামলোক, রূপলোক, অরূপলোকে চার রূপধ্যানও ও চার অরূপধ্যানের দ্বারা উত্থিত হয়ে অনন্ত শূন্যে মিশে যায়।

শাস্ত্রী মশাই অতঃপর বলেছেন, "নির্বাণ বলিতে নাই নাই'ই বুঝায়। প্রথম বৌদ্ধেরা এই 'নাই' নাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। নির্বাণ হইয়া গেলে, একটা অনির্বণী অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু পরে অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার উহার সঙ্গে আর একটা জিনিষ আনিয়া ফেলিলেন। উহার নাম করুণা। ইহা যেমন তেমন করুণা নয়, সর্বজীবে করুণা, সর্বভূতে করুণা। মহাযান বৌদ্ধধর্মে এ করুণা এত প্রবল ও অবিচ্ছেদ্য হল যে প্রত্যেক বোধিসত্ত্বে প্রতিষ্ঠা হল, "যতক্ষণ জগতের একটি মাত্র প্রাণী বদ্ধ থাকিবে ততক্ষণ আমি নির্বাণ লইব না।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, "এই বৌদ্ধধর্মে চরম উন্নতি। মহাযানের দর্শন যেমন গম্ভীর, ধর্মমত যেমন বিশুদ্ধ করুণা যেমন প্রবল, এমন আর কোন ধর্মে দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে অনেক তপস্যা ও সাধনা করিয়া এই মতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

'মহাযানের নির্বাণ শূন্য ও করুণায় মিশামিশি। এ নির্বাণের একদিকে করুণা, আর একদিকে শূন্যতা। করুণা সকলে বুঝিতে পারে। কিন্তু যে সকল যজমানে উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেশী নির্ভর করিতে লাগিলেন, তাহাদিকে শূন্যতা বুধান বড়ই কঠিন'। তাই সহজযানীরা শূন্যতার বদলে 'নিরাত্মা' পরে 'নিরাত্মাদেবী' কথাটি ব্যবহার করতেন।'

বৌদ্ধধর্মের শেষ পর্য্যায় সহজযান সম্পর্কে শাস্ত্রী মশাই বলেছেন, "মহাযানমতে নির্বাণ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কত জয়জন্মান্তর ধরিয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধি করিয়া 'দশভূমি' অতিক্রম পূর্বক শূন্যের উপর শূন্য, তার উপর শূন্য পার হইয়া, তবে নির্বাণপদ লাভ হয়। এত ত লোকে করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একটা সহজপথ চাই।" সহজবাদীরা মাধ্যমিক এবং যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীদের সম্পর্কে বলতেন, "তোমাদের সংসারও যেমন মিথ্যা, নির্বাণ ও তেমন মিথ্যা। মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপপূণ্য বলিয়া কিছু নাই। সহজযানের মূল কথা সদ্‌গুরুর উপদেশ। শ্রীসমাজতন্ত্র নামে সহজযানের গ্রন্থে আছে "বজ্রগুরু ব্যতিরেকে নির্বাণপাদ পাওয়া যায় না। যে নির্বাণে সকল ক্লেশের নাশ হয়, শান্তি যে নির্বাণের চরম ফল, যে নির্বাণে আর বিবর্ত থাকে না, অর্থাৎ কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, সেপদ গুরুর কৃপা ভিন্ন পাওয়া যায় না।" শ্রীসমাজতন্ত্রে আরও বলছেন, "পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, বিষয়কেই ভোগ বলে। বিষয়কেই কাম বলে। সে পাঁচটি ভোগ ত্যাগ করিয়া তপস্যা দ্বারা আপনাকে পীড়া দিবে না। যোগতন্ত্রানুসারে সুখভোগ করিতে করিতে বোধির সাধনা করিবে।" দারিকপাদ তাঁর দোঁহায় বলেন, "আর বালযোগি তোর মন্ত্রেই বা কি? তন্ত্রেই বা কি? ধ্যানেই বা কি? ব্যাখ্যানেই বা কি? তোমার যখন মহাসুখলীলায় প্রতিষ্ঠা নাই, তখন নির্বাণ তোমার পক্ষে দুর্লভা তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরমার্থ সত্যের সহিত মহাসুখলাকে এক করিয়া পঞ্চকাম উপভোগ কর।"

সহজধর্মের অনেক বই বাংলায় লেখা। "পদকর্তারা সন্ধ্যা ভাষায় গান করিতেন। সন্ধ্যা ভাষা অর্থাৎ আলো-আঁধারে ভাষা। উপরে কথায় কথায় একরূপ মনে হয়। অথচ ভিতরে অন্য

গূঢ় অর্থ থাকে। বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে কখন বিবাহ বলিতেছেন, কখন তরুলতা সাজাইতেছেন, কখন হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া বলিতেছেন, কখন দুধদোহা বলিতেছেন, কখন বা শুঁড়িনীর মদ বেচার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখন বা নদীর উপড় সাঁকো গড়ার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখন শূন্যও করুণার মিলন দেখাইতেছেন, কখন গঙ্গা যমুনার মাধে নৌকার সহিত তুলনা করিতেছেন। কখন ইঁদুরের সহিত তুলনা করিতেছেন। এইরূপ নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ছন্দে নানা অলঙ্কারে তাঁহারা সহজমত নানা দিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন।"

কিন্তু সহজযান প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্মের যে পরিণাম হয়েছিল সে সম্পর্কে শাস্ত্রীমশাই 'বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত' নামক নিবন্ধে লিখেছেন, "সহজযানের ফল যে অতি বিষময় হইয়াছিল তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে কামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে চরিত্রবিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্মের প্রাণ। যে চরিত্রবিশুদ্ধির জন্য আর্য্যদের চরিত্রবিশুদ্ধি প্রকরণ নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযানে সেই চরিত্র বিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। তাঁহারা দেহতত্ত্বের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং দেহে আকাশ, কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু সবই রহিল। যে বোধিচিত্ত মহাযানমতে নির্বাণ পাইবার আশায় ক্রমেই আপনার উন্নতি করিতেছিলেন, দেহতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া তাহার যে কি দশা হইল তাহা আর লিখিয়া জানাইব না।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ৬ই চৈত্র ১৩৩২ সাল (২০শে মার্চ ১৯২৬) পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি আসনে উপবিষ্ট হয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে ভাষণ দেন তা ১৩৩৩ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দ্বিতীয় সংখ্যায় নিবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষাতে বলি "আজিকার বক্তৃতার বিষয় এই যে, বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। একে ভাষার কথা, তারপর ব্যাকরণের কথা একথা নিশ্চয়ই নীরস হইবে, কঠিন হইবে। সেইজন্য যদিও আপনাদের কষ্ট হইবে, বুঝিতে পারিতেছি, তথাপি আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি, ধীরভাবে কথাগুলি শুনিবেন।

বুদ্ধদেব কোন ভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া অনেক বিবাদ-বিসংবাদ আছে, এবং এখন পর্যন্ত কত ভাষায় বৌদ্ধধর্মের বই লেখা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে ও আমাদের দেশের লোক খবর বড়ো কম রাখে। বর্মা, শ্যাম, আনাম, চাটগাঁ আরাকান দেশে বৌদ্ধধর্ম সিংহল দ্বীপ হইতে আসিয়াছে। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের পুঁথি এখন প্রায়ই পালি ভাষায় লেখা। সিংহলি পণ্ডিতেরা বলেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষাতেই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

কথাটা অত সহজ নয়। তিনি যে পালিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তার কোন প্রমাণ নাই। পালি ভাষা কী, কোথা হইতে আসিল, কোন দেশে ইহার উৎপত্তি হইল, সে সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিংহলের লোকে বলে, সা মাগধী মূলভাসা নরায় আদিকপ্পিকা ব্রহ্মাণো চ অসসুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে (অর্থাৎ মাগধী হল মূলভাষা যে ভাষায় আদি কল্পের মানুষেরা ব্রহ্ম যারা কখনো কোনো কথা শোনে নি তারা এবং বুদ্ধেরা কথা বলেন)। মাগধী যে মূল ভাষা একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। সিংহল দেশের লোক বিশ্বাস করিতে পারে।" শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে আমরা একমত যে মাগধী বুদ্ধবচনের বা বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের একমাত্র ভাষা হতে পারে না। ইহা সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্ভাবন মাত্র। আর ভাষারূপে পালি শব্দের ব্যবহার খুব সাম্প্রতিক কালের। আধুনিক ইউরোপীয় পন্ডিতগণ অথবা সিংহলী বৌদ্ধগণ ত্রিপিটকের ভাষারূপে

পালিভাষার নাম করণ করেছেন বলে মনে হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের সময়ে। (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) 'পালি শব্দটি ত্রিপিটকের মূলগ্রন্থ বুঝাতে প্রযুক্ত হত। সিংহলী পালি কাব্য চূলবংসে উল্লিখিত আছে 'পালি মত্তং ইধানীতং ন অট্‌ঠকথা এব' অর্থাৎ পালিই শুধু এখানে (সিংহল) আনা হয়েছে। অর্থকথা (ব্যাখ্যা পুস্তক) নয়। বুদ্ধঘোষ নিজেও তাঁর অর্থকথাগুলোতে পালি শব্দটি একই অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

অতঃপর শাস্ত্রী মশাই বলেছেন, "যাহা হউক, পালি ভাষা লইয়া আমাদের কথা নয়। আমাদের কথা, বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন, কোথায় করিয়াছেন। দেখিতে গেলে বুদ্ধদেবের বাড়ি গোরক্ষপুরের উত্তরে নেপালপ্রান্তে। সেখান বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁর বক্তৃতার সীমা একদিকে অঙ্গরাজ্য যার রাজধানী চম্পানগর বা ভাগলপুর, আরেকদিকে শ্রাবস্তী লাক্ষ্ণৌ হইতে দুই শত মাইল উত্তরে। আর একটা সীমা হইতেছে গয়া, আরেকটা সাঙ্কাশ্য। শ্রাবস্তী হইতে গয়া ইহার মধ্যে অনেক জায়গায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন—তার ভিতরে যেটুকু বেহারে—গয়া, রাজগৃহ, বৈশালী, পাব্যপুরী, কুশীনগর, কোশলে কাশী, শ্রাবস্তী, সাকেত, সাঙ্কাশ্য ইত্যাদি বুদ্ধদেব যে জেলায় যাইতেন, সেই জেলার ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তবে রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী এই সকল নগরের লোক পরস্পরের ভাষা অনেকটা বুঝিতে পারিত। নগরে নগরে যাতায়াতের দরুন পরস্পরের সম্পর্কে অনেক জিনিষ তাদের জানা থাকিত.... সংস্কৃত হইতে সহজ করিয়া নিয়া যে সময় প্রকৃত হইয়াছে সে সময়ে একটি ভাষা হইয়াছে শাক্যদের দেশে যাহাতে একটি সংযুক্ত বর্ণ নাই; শ, ষ, ক্ষ; দুই একটি সংযুক্ত বর্ণ হইলে ও সেগুলি অসংযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলে ও এরকম একটা ভাষা ছিল, সে ভাষা আমরা বুদ্ধদেবের ভাষা বলিয়া নিতে পারি। তাহার উদাহরণের মধ্যে একটি মাত্র বাক্য পাইয়াছি (যথা—পিপ্রাব শিলালেখ; ইয়ং সলিল নিধনে বুধস ভগবতে সকিয়নং সুকিতিভতিনং সপুতদলনং অর্থাৎ এই যে শরীর নিধান অর্থাৎ ছাই বা হাড়গোড় ভগবান বুদ্ধের, শাক্যদের ভাই-ভগিনী ও সুত-দাবার সহিত, এই লেখটি বুদ্ধের পরিনির্বাণের অল্পদিনের মধ্যে স্থাপিত। সংস্কৃত হইতে ভাঙ্গিয়া যে অসংখ্য বুলি [dialect] হইয়াছে, এ ভাষাটি তাহারই একটি)। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি (বুদ্ধদেব) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন। এইটাই কার্ণ সাহেবের মত। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? কলিকাতার লোক কি ঢাকার ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে, না ঢাকার লোক কলিকাতার ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে? তবে সাবধান হইয়া বক্তৃতা করিলে, এমন ভাষায় বক্তৃতা করা যায় যে, সারা বাংলার লোক বুঝিতে পারে। বুদ্ধদেব বোধ হয়, সেইরূপ ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার ভাষা চম্পা অর্থাৎ ভাগলপুর হইতে শ্রাবস্তী অর্থাৎ বলরামপুর পর্যন্ত সমস্ত দেশের লোকই বুঝিতে পারিত। বুদ্ধবচন সম্পর্কে গবেষণার ফলে জানা যায় ধর্মপ্রচারের উপযোগী বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বজনবোধ্য সাধারণ (common) ভাষা বুদ্ধের সময়ে প্রচলিত ছিল। সুতরাং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলে মনে হয়।

বাংলা দেশ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ

সত্যজিৎ চৌধুরী

"বাংলা দেশ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ"—বাংলায় সামাজিক ইতিহাসের পরত সরিয়ে সরিয়ে, বাঙালির জীবন ও মনন চর্যার খুঁটিনাটি তথ্য পিঁজে পিঁজে সারাজীবনের কাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) এই সিদ্ধান্তে পৌছন। উক্তিটি একটি মননদ্যুতিপূর্ণ এপিগ্রামের মতো। এ উক্তির অভিঘাত ইতিহাস জিজ্ঞাসুকে সজাগ করে তুলবেই। এমন একটি সিদ্ধান্তবাক্য এত প্রত্যয়ে হরপ্রসাদ উচ্চারণ করতে পারলেন কোন্ তথ্যে এবং তত্ত্বে ভর করে, কোন্ অভিজ্ঞতায়, জানার আগ্রহে ফিরে যেতে হয় সামাজিক ইতিহাসে আমাদের অভিনিবেশ গাঢ় হয়ে ওঠার এক কালপর্বের আখ্যানে। এ আখ্যানের শুরু ধরা যায় উনবিংশ শতাব্দীর যাটের সত্তরের দশকে। ভারতে সাম্রাজ্যের বনেদ দৃঢ় করার জন্য দেশটার গোটা পরিচয় জানার প্রয়োজনে ইংরেজ পণ্ডিতরা তখন ভারতবর্ষের প্রাচীন মধ্য আধুনিক ইতিহাসের একটা ছক দাঁড় করছিলেন। সেই ছকটি ইংলণ্ডে বসেই তৈরি করে দেন জেমস্ মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) তাঁর ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ 'দি হিস্ট্রি অফ বিটিশ ইন্ডিয়া' (১৮১৭) নামের বিরাট কাজে। মিল দাবি করতেন, এই গবেষণায় তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলে দিলেন, এর বাইরে এদেশ সম্পর্কে জানবার মতো আর কোনো গুরুতর বিষয় থাকতেই পারে না আশ্চর্য, এত বড়ো কাণ্ডটি তিনি ঘটালেন যে দেশ নিয়ে সেই ভারতে একবার পা রাখার দরকারও বোধ করেন নি। মিলের ইতিহাস প্রতিপন্ন করে, শাসিত দেশের ইতিহাস শাসকের সাম্রাজ্যতত্ত্ব আনড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার গরজে কতখানি বিকৃত করা যায়। এই বিকৃত ইতিহাস দৃষ্টির জের হিশেবে এসেছে ভারতবর্ষের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে নানান্ উদ্ভট গবেষণা। যেমন জেমস্ ফার্গুসন (১৮০৮-৮৩) ভারতীয় স্থাপত্যের উজ্জ্বল কীর্তিগুলি সব গ্রীকরা তৈরি করে দিয়েছিল—কোমর বেঁধে এই তত্ত্ব প্রমাণ করেছিলেন। সাহেবদের ব্যাপক গবেষণা আর তত্ত্বগঠনের আখ্যানের মধ্যে এক কৌতুকজনক স্ববিরোধ ছিল। উদ্দেশ্য দেশটির দৈন্যদশা বিশ্বের সামনে তুলে ধরে প্রমাণ করা, ইংরেজ শাসন ভিন্ন এদেশের উদ্ধার নেই। কিন্তু ভারত-জিজ্ঞাসু ইংরেজ মনস্বী চার্লস উইলকিন্স (১৭৪৯/৫০-১৮৩৬), হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০), জেমস প্রিনসেপ (১৭৯৯-১৮৪০), আলেকজেন্ডার কানিংহামদের (১৮১৪-৯৩) উদ্যমে ক্রমাগত হাতে আসছিল সুপ্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাচর্চার, সাংস্কৃতিক জীবনের উজ্জ্বল সব নিদর্শন। একী সব বাইরে থেকে আসা! নিজেদেরই তত্ত্বের সঙ্গে এ অভিজ্ঞতা মিলছিল না আদৌ।

বাংলায় মননের হাওয়া বদলের দিন এল ক্রমে। শাসক প্রভুদের 'দর্শন' নির্বিকার বশ্যতায় মেনে নেবার পর্ব পেরিয়ে 'মননের-স্বরাজ' চেতনা ক্রমে সামর্থ্য অর্জন করেছে। চেতনার উত্তরণের জমি তৈরি করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)। রমেশচন্দ্র দত্তর (১৮৪৮-১৯০৯) মতো মনস্বীরা। ইতিহাসতত্ত্বে এক বিকল্প অবস্থান সুস্থির হয়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪), রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়দের (১৮৪৫-৮৬) স্বাধীন মননের সামর্থ্যে। তথ্যের সন্ধান, তথ্য বিশ্লেষণ, কালের অনুক্রম নির্ণয়, এক পর্ব থেকে পরের পর্বে উত্তরণের যুক্তিশৃঙ্খলা, ইতিহাসের ইঙ্গিত ধরতে পারা, গবেষণার এই পদ্ধতি-বিজ্ঞান, মেথলজি আমাদের আবহমান জ্ঞান চর্চায় ছিল না। ফলে কালক্রমের শৃঙ্খলায় গাঁথা আমাদের কোনো ইতিহাস সত্যিই লেখা হয়নি। জ্ঞানচর্চার এই শাখায়—অন্য অনেক শাখার মতোই—এ বিদ্যা আমরা আহরণ করেছি যুরোপ থেকে, ইংরেজি শিখার মাধ্যমে। তাতে লজ্জার কিছু নেই। জ্ঞানচর্চায় আদান-প্রদান চলবেই এবং একান্ত কাম্য। তাই ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি-বিজ্ঞান বা মেথডলজির শিক্ষা যুরোপ থেকেই নিতে

CENTRAL LIBRARY

হবে—এ নিয়ে কোনো দ্বিমত ছিল না। প্রশ্ন উঠছিল দেশজিজ্ঞাসায় স্বাদেশিকতার দিক থেকে, দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ইতিহাস দেশের মানুষকে নিয়ে। উৎপাদন ব্যবস্থায়, সমাজ বিন্যাসে, মননে সৃজনে একটি দেশের জনবৃত্তের প্রতিভার উন্মেষ বিকাশের খোঁজ খবর বাদ দিয়ে কোনো যথার্থ ইতিহাস দাঁড়ায় না। রাজায় রাজায় মারামারি কাটাকাটির, ক্ষমতাকেন্দ্র দখল বেদখলের ইতিহাসটাই কোনো দেশের প্রকৃত ইতিহাস হতে পারে না। ইংরেজের হাতে তৈরি ভারতীয় ইতিহাসে ইংলন্ডের গৌরবের উজ্জ্বল আখ্যানের পাশেই রাখা হত দীনতাময় ভারতের ছবি। সে ভারত "ব্রিটিশ ইন্ডিয়া", ইংরেজের ভারত। এর বিকল্পে জেগে উঠল বিপরীত এক ইতিহাসতত্ত্ব, ভারতবর্ষীয়ের ভারতকে দেখার, বোঝার ইতিহাসতত্ত্ব। রাজবৃত্তের ইতিহাস নয়, জনবৃত্তের ইতিহাস। এই দৃষ্টির মর্ম 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) বইটির প্রসিদ্ধ লেখক, 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম সহযোগী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্পষ্ট করে নির্দেশ করেছিলেন, "কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে উন্নতবুদ্ধি জ্ঞানিগণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে রাজা বা সেনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নহে। ব্যক্তি বিশেষের কার্য্যাবলী ইতিহাসের পটে অবস্থান মাত্র করিতে পারে; সমাজের পরিবর্ত্তন প্রদর্শনই ইতিহাসের প্রকৃত বিষয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের প্রাধান্য। লোকের রীতি, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প, শাস্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য, ধন, বল প্রভৃতি কালে কালে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য।" ("প্রাচীন ভারতবর্ষ", 'বঙ্গদর্শন', ১৮৭৮ খৃ.)। ইতিহাস দৃষ্টির এই রূপান্তর, রূপান্তরিত দৃষ্টির কিরণ সম্পর্কে সজাগ না থাকলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ আর বিংশ শতাব্দীর শুরুর দু-তিন দশক জুড়ে ভারতীয় সমাজের, বাংলার সমাজের জীবনযাত্রার, ধর্মকর্মের, আচার-অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার তাৎপর্য ঠিক ঠিক ধরা যায় না।

ইতিহাসতত্ত্বের এই নতুন অবস্থান থেকে আমাদের ইতিহাসচর্চার ইতিহাসে প্রবেশ করলে বোঝা যাবে কেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরা বৌদ্ধধর্মের বিকাশ বিবর্তনের ধারা উপধারার পুরো পরিচয় উন্মোচন অবশ্য কৃত্য মনে করতেন।

।। ২ ।।

আবিশ্ব মনীষী সমাজে ষোড়শ শতাব্দী থেকে ক্রমে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব-বিকাশ সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্ব গোচরে আসতে থাকে। য়ুরোপে এই নতুন বিদ্যার চর্চা বহুদিন দক্ষিণী বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে সীমিত ছিল। ব্রহ্মদেশ-শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ এশিয়ায় এবং আরও কিছু অঞ্চলে পালিভাষা আশ্রিত থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ছিল। এই ধারাকেই আমরা সাধারণ ভাবে হীনযান বলি। বৌদ্ধসংস্কৃতির আর একটি শাখা, বড়ো শাখা মহাযান—সংস্কৃতভাষা আশ্রিত। সে শাখার মূল গ্রন্থাবলির পরিচয় উন্মোচিত হয় অনেক পরে, মাত্রই উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে। একে বলা হয় 'নর্দার্ন বুদ্ধিজম' বা 'উদীচ্য বৌদ্ধবিদ্যা'—যার প্রভাব পরিব্যাপ্ত ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতে। যার জের টিকে থেকেছে বাংলায় নেপালে তিব্বতে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ঐতিহাসিকদের চর্চায় উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের উদয়-বিলয় নিয়ে অভিনিবেশ গুরুত্ব পেল। বিশেষ করে পূর্বভারতের, বাংলার ইতিহাসের আদ্যন্ত পর্ব-পর্বান্তরের ইতিহাস গড়ে তোলার গরজ থেকে গবেষকরা বুঝতে চাইলেন মুসলমান-পূর্ব কালের সমাজ বিন্যাস কেমন ছিল। সেকালের ভাষা-সাহিত্যের, ধর্ম-দর্শনের রূপ কেমন ছিল না জানায় মধ্যযুগের ওদিকটা একেবারেই আবছা রয়ে যায়। পূর্বভারতের প্রাচীন ইতিহাস উন্মোচনের জন্যই উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের বিকাশ বিলয়ের তথ্য-তত্ত্ব উদ্ধার এবং বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে ওঠে।

এ ধারায় কাজের ইতিহাস বড়ো বিচিত্র। সে ইতিহাসের সূত্রপাত এক হাঙ্গেরীয় পরিব্রাজকের উদ্যমে, পূর্ণ পরিণতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিপুণ গবেষণায়। এর সঙ্গে স্মৃতিতে জেগে ওঠে দেশবিদেশের বহু মনীষীর উজ্জ্বল নাম—যাঁরা দুরধিগম্য বিষটিতে প্রবেশের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। যেমন রুশ মনস্বী শ্চেরবাটস্কোই (১৮৬৬-১৯৪২), ফরাসি ভারতবিদ্যাবিদ সিলভ্যাঁ লেভি (১৮৬৩-১৯৩৫), ইংলন্ডের সিসিল বেন্ডল (১৮৫৬-১৯০৬), হল্যান্ডের লুই দ্য লা ভ্যালে পুসাঁ (১৮৬৯-১৯৩৯), জর্মাণ রুডল্‌ফ হোর্নলে (১৮৪১-১৯১৮) রিচার্ড কার্ল পিশেল (১৮৪৯-১৯০৮)।

এ বিদ্যার সূত্রপাত আলেকজান্ডার চোমা-দা-কোরোস-এর (১৭৮৪-১৮৪২) অভিযানে। হাঙ্গেরির কোরোস নামে এক গ্রামের ছেলে চোমা যৌবনকাল থেকে নিজের জাতির আদি নিবাস সন্ধানে ব্যাকুলতা বোধ করতেন। হাঙ্গেরির মানুষ ফিনোউগ্রীয় ভাষাগোষ্ঠীর মাগিয়ার ভাষাভাষী। মাগিয়াররা ছিলেন যাযাবর। নবম শতাব্দীর শেষে হাঙ্গেরিতে এঁরা স্থায়ী হন। গ্রামের এক লৌকিক উপকথার সূত্রে চোমার ধারণা হয়, তাঁদের আদি বাসভূমি মধ্য বা পূর্ব এশিয়ার কোথাও ছিল। পড়াশুনো শেষ করে তিনি ১৮১৯ সালে শিকড়ের সন্ধানে পায়ে হেঁটে অভিযান শুরু করেন। নিঃসম্বল এই অভিযাত্রীর সম্বল ছিল অসামন্য মেধা এবং ভাষা শেখার সহজাত ক্ষমতা। কন্‌স্তান্তিনোপল হয়ে পেশোয়ার, পেশোয়ার থেকে লাহোর হয়ে পৌছন লাদাকের রাজধানী লেহ্-য। এইখানে চোমার জীবনে একটি বড়ো বাঁক এল। মুরক্রফট নামে এক ইংরেজ অভিযাত্রীর সঙ্গে জুটে খুব ভালো করে তিব্বতি ভাষা শিখলেন। তিব্বতে পৌঁছে একজন লামার আশ্রয়ে বৌদ্ধপুথির অনুলিপি তৈরির কাজ শুরু করলেন। হিম ঠাণ্ডায় পাথরের মেঝেতে শোওয়া, ক্ষীণ আলোয় কাজ করা, এভাবে চোমা দিনের পর দিন পরিশ্রম করে ৩২০ খানি পুথির অনুলিপি সম্পূর্ণ করলেন। এরই সঙ্গে তৈরি করতে থাকেন একটি তিব্বতি অভিধান। কোলকাতায় এলেন চোমা। অনেক চেষ্টায় কিছু সরকারি সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে আবার তিব্বতে গেলেন। কঠিন পরিশ্রমে তিনি বিরাট এক পুথি সংগ্রহ নিয়ে এসে ১৮৩১-এ স্থায়ী ভাবে কাজে বসলেন কোলকাতায়, এশিয়াটিক সোসাইটিতে। এর আগে গবেষক সমাজে কেউ জানতেন না ভারত থেকে কী বিপুল পরিমাণ বৌদ্ধ-সাহিত্য তিব্বতে গেছে। চোমার বিরাট সংগ্রহের সবই ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের তিব্বতি অনুবাদ। মূল সংস্কৃত রচনা সবই প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু তিব্বতি অনুবাদে স্থায়ী হয়ে আছে শত শত গ্রন্থ। ভারতের বৌদ্ধ মনীষীদেরই মেধার সৃষ্টি বিপুল এই বৌদ্ধ-সাহিত্য ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, টিকে রইল তিব্বতে তিব্বতি অনুবাদে, কিছু বা নেপালে মূল সংস্কৃতে—এ বড়ো বিস্ময়।

বৌদ্ধসংস্কৃতির উপর তলায় এমন উন্মূল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সমাজ জীবনের বাস্তবে, বাংলার জীবনযাত্রার পালপার্বণে, আচার-অনুষ্ঠানে, ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারে কি বৌদ্ধ সংস্কৃতির জের কিছু রয়ে যায়নি? বাঙালি জাতিসত্তার, বাঙালির ভাষাসাহিত্যের, কলাসংস্কৃতির পরিমণ্ডলের বাস্তব পরিচয় শুধু হিন্দুত্ব বা ইসলামত্ব দিয়ে সর্বদা যে ব্যাখ্যা করা যায় না বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ক্রমেই এই সত্য প্রতিভাত হচ্ছিল। আর্যামির বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও মানতেই হচ্ছিল বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রতিপত্তি প্রায় নেই। এদেশ শূদ্রময়। আর সমাজের প্রান্তবাসী জনজীবনে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সংস্কৃতির অমিশ্র রূপ দেখাই যায় না। ইসলাম-আশ্রিত সমাজেরও নানান থাক। নিচু দিকের থাকে নমাজ আর উঠোনের তুলসিতলায় দীপ জ্বালানো একই সঙ্গে চলে—যেমন দেখা যায় বিক্রমপুরের (ঢাকা জেলা) জোলাদের মধ্যে—যাঁদের বৃত্তি তাঁত বোনা, বা মেদিনীপুরের পটুয়াদের মধ্যে—যাঁরা ধর্মে মুসলমান, বৃত্তিতে হিন্দু পুরাণের পট আঁকিয়ে। গোটা হিন্দুপুরাণ, মনসা-চণ্ডীর আখ্যান যাঁদের স্মৃতিতে চির প্রবাহিত। আমাদের সামাজিক ইতিহাসে এতসব বিমিশ্রণের তথ্যসূত্রের সন্ধানে ক্রমে চোমার গবেষণা এবং সংগ্রহ মহামূল্য হয়ে ওঠে।

CENTRAL LIBRARY

এই একই কাজ করছিলেন ভিন্ন আর এক স্তরে ব্রায়েন হটন হজসন (১৮০০-৯৪)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনের এক বড়ো আমলা হজসন ১৮৩৩ থেকে ৪৩ অবধি নেপালে রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। নেপালকে ইংরেজ কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করাই তাঁর মূল দায়িত্ব ছিল, কিন্তু মানুষটি ছিলেন একটু ভিন্ন ধাতুর। আমলাগিরির বাইরে ভারত-ভূখণ্ডের এই বিশিষ অঞ্চলটির প্রকৃতি-মানুষজন-ধর্মকর্ম—সামাজিক জীবন অনুপুঙ্খ জানার আগ্রহে তিনি প্রকৃত অর্থে একজন নানা বিদ্যায় পারঙ্গম গবেষক হয়ে ওঠেন। হজসনের মন ছিল বৈজ্ঞানিকের। হিমালয়ের মানুষ এবং প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। পাখি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর এই আগ্রহেরই আর এক বিস্তারে নেপালের সমাজ কাঠামোর মধ্যে জীবনযাত্রার বিভিন্নস্তর তুলে আনেন তাঁর গবেষণা নিবন্ধে। এইসূত্রে তাঁর নজরে আসে বৌদ্ধধর্মের এক বিশিষ্টরূপ যা দক্ষিণি বৌদ্ধধর্ম থেকে ভিন্ন। বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে হজসনকে সাহায্য করতেন নেপাল রিসিডেন্সির হেড পণ্ডিত অমৃতানন্দ। অমৃতানন্দর সংগ্রহ করে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হজসন বৌদ্ধধর্মের, বৌদ্ধ সমাজের আচার-আচরণ নিয়ে ১৮টি প্রবন্ধ লেখেন। বৌদ্ধবিদ্যার য়ুরোপীয় গবেষকরা তাঁর লেখায় বহুবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং বহু বৌদ্ধ-দেবদেবীর মূর্তি পূজার বিবরণে সম্পূর্ণ নতুন এক বৌদ্ধধর্মের চেহারা দেখতে পেলেন। পণ্ডিত অমৃতানন্দের নামটি অবশ্য লুপ্ত হয়ে গেছে।

ইউজিন বুর্নুফ (১৮০১-৫২) মন্তব্য করলেন, হজসনের লেখায় নেপাল তিব্বত অঞ্চলের ভাষা সাহিত্য ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন তথ্য উঠে আসছে। বিশেষ করে সংস্কৃতে লেখা অতি বিচিত্র সব পুথির ভিত্তিতে বোঝা গেল দক্ষিণি বৌদ্ধবিদ্যার সমান্তরাল আর এক বৌদ্ধবিদ্যার প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, যার বেশ জোরালো জের ঊনবিংশ শতক অবধি সজীব রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় লেখা পুথির ভাষা অশুদ্ধ হলেও অর্থবোধে বাধা হয় না। সংস্কৃত থেকে তিব্বতিতে অনুবাদ করা বইয়ের সংখ্যাও প্রচুর। কাঠে খোদাই করে ছাপার রীতিতে এসব বই ছাপা হত। এই অনূদিত সংগ্রহের কেঙ্গুর আর তেঙ্গুর—দুই ভাগ। কেঙ্গুর বুদ্ধাবাণীর তিব্বতি অনুবাদ। তেঙ্গুর বৌদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে ভারতীয় ও তিব্বতি পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মূলক রচনা। হজসন এ-মহাকোষের বহু বই সংগ্রহ করে এনে বিভিন্ন বিদ্যাকেন্দ্রে দান করেন, কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি পেল ১৭১ খানি, লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি ৮৫ খানি, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ৩০ খানি, অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরি ৭ খানি, প্যারিসের সোসাইটি আশিয়াতিক ও বুর্নুফের কাছে জমা দেন ১৭৪ খানি। নতুন এই আকার গ্রন্থ বিশ্বময় বিদ্যাকেন্দ্রগুলিতে নতুন করে বৌদ্ধবিদ্যা চর্চার জোয়ার এনেছিল।

কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এ বিষয়ে কাজের নতুন ধারা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাতে শুরু এবং পরিণতি তাঁরই সাক্ষাৎ শিষ্য হরপ্রসাদের কাজে এ চর্চার বিচিত্র বিকাশে। এই চর্চায় ক্রমে উত্তর-পূর্ব ভারতে মুসলমান শাসন পত্তনের আগের যুগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ইতিহাসের অন্ধকার কাটিতে থাকে। বিশেষ করে বাঙালির ইতিহাসের কালসীমা পিছিয়ে যায় প্রায় ৫০০ বছর অতীতের দিকে। বাংলার ইতিহাস উদ্ধারের এই ইতিহাসে যেতে হবে, দেখতে হবে সোসাইটিতে এবং পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যে কাজ চলেছিল তার পদ্ধতি কী এবং কী সে ধারবাহিক চর্চার ফলাফল।

॥ ৩ ॥

দেশের লুপ্ত ইতিহাসের উপাদান বৌদ্ধ-সংস্কৃত পুথি নিয়ে কাজের পদ্ধতি-বিজ্ঞান রাজেন্দ্রলাল মিত্রর উদ্ভাবন। প্রথম কাজ পুথির পাঠোদ্ধার। এই কাজে তিনি ভালো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্য

নিতেন। বৌদ্ধ-সংস্কৃত প্রায়ই ব্যাকরণদুষ্ট, অশুদ্ধ। বুঝতে পারলেই হল, ভাষার শুদ্ধতা নিয়ে বৌদ্ধ লেখকদের ইচ্ছাকৃত উদাসীনতাই ছিল। তাঁদের কথা, আমরা সুশব্দবাদী নই। পণ্ডিতরা পুথির পাঠোদ্ধার করে সামারি করে দিতেন। সেই বস্তু কালক্রম ও বিষয় অনুসারে সাজিয়ে এক- একখানা নোটিশ তৈরি করতেন রাজেন্দ্রলাল। 'নোটিশ' গুলিতে থাকত পুথির সাধারণ বিবরণ। এর পরের ধাপে করা হবে বিবরণাত্মক তালিকা, ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ। এই তালিকায় থাকবে পুথির পুষ্পিকা, যে বস্তুতে লেখা—যেমন কাগজ বা তালপাতা—তার নির্দেশ এবং লেখক ও বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ক্যাটালগের ভূমিকায় সংস্কৃতবিদ্যার এক-কেটি শাখার ইতিহাস এবং বিচার বিশ্লেষণ থাকবে এই হল মান্যরীতি। পুথি নিয়ে কাজের এই পদ্ধতি রাজেন্দ্রলাল পত্তন করে গিয়েছিলেন—সেই ধারায় হরপ্রসাদ প্রায় দশ হাজার পুথির বিবরণ—ডেস্‌ক্রিপটিভ ক্যাটালগ প্রস্তুত করে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদের করা ১৪ খণ্ডের ক্যাটালগের প্রথমখণ্ডটি বৌদ্ধ পুথির বিবরণ, প্রকাশ ১৯১৭-য়। এর অনেক আগেই তিনি রাজেন্দ্রলালের বিখ্যাত সংকলন 'দি স্যান্‌স্‌ক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অফ নেপাল' (১৮৮২) গ্রন্থের ১৬টি অধ্যায় লিখে দিয়েছিলেন। বৌদ্ধসাহিত্যে সে-ই হরপ্রসাদের প্রথম প্রবেশ—বৌদ্ধপুরাণের আখ্যান অনুবাদে। ১৮৯১-এ রাজেন্দ্রলালের প্রয়াণ হল। তাঁর জায়গায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে পুথি চর্চার পূর্ণ দায়িত্ব পেলেন হরপ্রসাদ।

রাজেন্দ্রলালের এবং হরপ্রসাদের কাজের ধরন-ধারনের মধ্যে বেশ তফাত। পুথির জ্ঞান আর জীবনের বাস্তব জ্যাবদ্ধ করার প্রবণতা হরপ্রসাদের কাজে যেমন উজ্জ্বল রাজেন্দ্রলালে যেন তেমন দেখি না। দুজনই ইতিহাস সন্ধানী পরিশ্রমী বিদ্ধান। কিন্তু হরপ্রসাদ পুথিশালার সঞ্চয় ঘাঁটাঘাঁটি করে যেসব তত্ত্ব পান তার শিকড় খোঁজার গরজে বারবার বেরিয়ে পড়েন দূরদূরান্তে, নেমে দাঁড়ান সমাজের একেবারে অবতলের থাকে। বাঙালি ইতিহাসের যেসব পর্ব পেরিয়ে এসেছে, তার জের কি কিছুই নেই? এমনকী হতে পারে—একটা কোনো জীবনদর্শন, নীতিতত্ত্ব-ধর্মতত্ত্ব আশ্রয় করে ইতিহাসে একটা উজ্জ্বল পর্ব জমাট বেঁধে কালান্তরে সম্পূর্ণই নিবে গেল। কোনোই জের রইল না তার। মানুষের ইতিহাসে এমন কিন্তু কখনও হয় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, আমরা জীবনযাপন করি এক প্রচ্ছন্ন স্মৃতিলোকের মধ্যে। অবচেতনের আধারে ধরা জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক স্মৃতি বহুকাল পেরিয়েও প্রভাব মেলে চলে। ধ্যানধারণায়, জীবনযাপনের বহু অনন্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে সেইসব যাপিত জীবনের স্মৃতিরেশ সক্রিয় থেকেই যায়। য়ুং বা এরিক এরিকসন আধুনিকতার চূড়ান্ত পর্বেও ছিন্ন, অসংহত, অথচ অমোঘ সেসব স্মৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করে যেমন দেখিয়েছেন, শুধু কোনো জনগোষ্ঠীর মানসিক প্রবণতার নজির নয়, ধর্মেকর্মে, সাহিত্যে-সঙ্গীত-শিল্পকলায় অবিরল অবসৃত জগৎ উঠে আসে চিত্রকল্পের প্রতীকের অনন্যতায়। সেই স্মৃতিলোক যেন-বা এক মহামাতার গর্ভাধারের মতো আমাদের ধারণ করে রাখে। আবছায়া, অচেতনার অন্ধকার হয়তো, কিন্তু জননীর গর্ভের আঁধারের মতোই সপ্রাণিত। সৃজনাবেগে বেপথু, বেপমান।

আধুনিক তাত্ত্বিকদের মতো এমন করে এত কি ভেবেছিলেন হরপ্রসাদ? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তাঁর বোধের মধ্যে নিশ্চয়ই আপন জাতিসত্তার আদি-অন্ত পুরো জমিনটি উন্মোচনের গরজ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছিল। একে বলা যায় অদম্য স্বদেশ জিজ্ঞাসা। তাই কোরস দ্য চোমা বা ব্রায়ান হজসনের বয়ে আনা তথ্যের উৎসে বারবার তিনি অভিযান করেন। তিব্বতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি, কিন্তু নেপালে গেছেন চারবার। ১৮৯৭ ১৮৯৮ পরপর দুবার, তৃতীয়বার ১৯০৭-এ। অনেক পরে ১৯২২-এ শেষবার। দুটি উদ্দেশ্য। হজসন যা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তার বাইরে আরও

CENTRAL LIBRARY

পুথি পাওয়া নিশ্চয় সম্ভব। কারণ নেপালের দরবার লাইব্রেরির পুথি সব দেখা হজসনের সাধ্যে কুলোয় নি। একাজে হরপ্রসাদের দক্ষতা অনেক বেশি। নিরাশও হননি। প্রথমযাত্রাতেই হাতে আসে 'রামচরিত' যা পাল রাজত্বের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। ১৯০৭-এ পেয়ে যান চর্যাগীতির পুথি। সঙ্গে দোহাকোষ। এসব আবিষ্কারে বাঙালির শাসনতান্ত্রিক এবং ভাষাসাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীন পাতা কত অতীতে উল্টে গেল! দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যেন আরও তাৎপর্যময়। নেপালে তরাইয়ে সমাজটাই যেন একটা ইতিহাসের আকর। হিন্দু রাজত্ব, কিন্তু বৌদ্ধ জীবনাচার সমাজের ভাঁজে ভাঁজে টিকে আছে, আছে সাধনভজন, সহজিয়া বৌদ্ধদের গুরুতন্ত্র। এ যেন বাংলার প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের অন্তঃপুরে ঢুকে যাওয়ার সুযোগ। সামাজিক ইতিহাস চর্চায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ জুড়ে প্রচুর কাজ হওয়ায় অনুভব করতে পারি, সামাজিক ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালি জনসমাজের মধ্যে মিশে গিয়ে কেমন উত্তেজনা বোধ করতেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর ইতিহাসচর্চার অবস্থান যেন আমূল পালটে দেয়। উপলব্ধি করেন, পুথিশালায় সংরক্ষিত পুথিপত্র অবশ্যই মহামূল্য এবং প্রামাণিক, কিন্তু বহতা জীবনের স্রোতে তার সমর্থন খুঁজে পেলে স্বভাবতই সন্ধানী মন আরও প্রচ্ছন্নের প্রমাণ, ভাঁজে ভাঁজে মিলেমিশে থাকা টুকরো টুকরো তথ্যও উদ্ধারে অশেষ উৎসাহ পায়। সেই উদ্দীপনা হরপ্রসাদকে কীভাবে চালিত করত তাঁর রচনা ধারায় সেসব নজির পাই অবিরল।

সব তথ্য হয়তো পাকা-তথ্য নয়, অনুমানে প্রমাণে জড়িয়েও থাকে অনেক। এসব অনুমান নিয়ে তাঁকে 'পাথুরে প্রমাণের' কারবারিরা নিরন্তর খোঁটা দিয়েছেন, উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু নৃতত্ত্বে, সমাজতত্ত্বে আমাদের চক্ষুষ্মান্ গবেষণা প্রমাণ করেছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর হাতে সব বিষয়ে 'পাথুরে প্রমাণ' ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ভুল ছিল না। এই কথাটি খুব জোর দিয়ে একদিন বলেছিলেন নীহাররঞ্জন রায়। বলেছিলেন, 'লিপি-কি-পাথরটাথর পড়তে এক আধটা ভুল হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ওঁর দৃষ্টিতে কোনো ভুল ছিল না।' 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব' (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) নামে বাঙালির আদি ইতিহাস—ঠাস বুনোট এই বাংলার সামাজিক ইতিহাসের লেখক নীহাররঞ্জন তাঁর নিজস্ব ইতিহাস দৃষ্টির যুক্তি বিস্তারে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি জানাচ্ছেন, "এ বিষয়ে সর্বাগ্রে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম করিতে হয়। প্রাচীন বাংলার সাহিত্যে এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের সজাগ করিয়াছিলেন"। (ইতিহাসেরযুক্তি পৃ. ৪)

বিজ্ঞানবিদ্যার মতোই মানববিদ্যাতেও গবেষককে একটি অনুমিত প্রকল্প—হাইপথিসিস নিয়ে এগোতে হয়। সে প্রকল্প প্রামাণিক করে তোলবার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যকে গাঁথতে হয় অকাট্য যুক্তিসূত্রে। এই পদ্ধতিতে এক-একটি তত্ত্ব দাঁড়ায় শক্ত ভিতের উপরে। কিন্তু কোনো প্রতিপন্ন তত্ত্বকেই চূড়ান্ত, শেষ কথা যে বলা যায় না বিদ্যার সব শাখাতেই তার অনেক প্রমাণ মিলবে। বিশেষ করে সামাজিক ইতিহাসের গবেষণায় নতুন সম্ভাবনায় মুখ বন্ধ করা যায় না। কেউ বলতে পারেন না, শেষ কথা বলে দিলাম। মুক্তদৃষ্টি এই ইতিহাস চর্চায় অনড় সত্য প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যও নয়। একে 'বৈজ্ঞানিক প্রণালী'র মর্যাদা না দিলেও কিছু যায় আসে না। সরকারি ইতিহাস রচনা নয়, হরপ্রসাদের লক্ষ্য আপাত তুচ্ছ, গৌণের গৌণ নজিরগুলি বুনে তুলে একটা যুগের জীবন-স্পন্দন আমাদের উপলব্ধিতে সঞ্চার করে দেওয়া। বর্ধমানের সাহিত্য সম্মেলনে শাস্ত্রীমশায়কে ঠাট্টা করে যদুনাথ সরকার বলেছিলেন, আজকাল কেউ আর সীতাভোগ মিহিদানা খেতে চায় না, মুড়িমুড়কির দিকে নজর। ('হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ'-৪, পৃ. ৫৮)। ইতিহাসচর্চায় বিলেতের আমদানি 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস' তত্ত্বের চেয়ে গৌণ জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি নিয়ে সজীব মানুষের ইতিহাস রচনার আগ্রহ ক্রমেই মূল প্রবণতা হয়ে উঠেছে। এর মূলে হরপ্রসাদের কাজের প্রভাব

এবং রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট নির্দেশ, "ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়" ("ভারতবর্ষের ইতিহাস") কাজ করেছে। উত্তরতর-কালে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লেখেন, "ইতিহাস বিজ্ঞান নয়, কিন্তু সত্যে পৌঁছিবার বাঁধা রাস্তা যেমন বিজ্ঞানেরও নাই, তেমনি ইতিহাসেরও নাই। এইরূপ পাকা রাস্তা থাকিলে কি বিজ্ঞানে কি ইতিহাসে প্রতিভাবান্ ও প্রতিভাহীনের এক দর হইত।" ("বৈজ্ঞানিক ইতিহাস", 'সবুজপত্র', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪)।

এই ইতিহাসদৃষ্টি নিয়ে হরপ্রসাদ বাঙালির পরিচয় পরম্পরা সন্ধান করেন। তাঁকে অনুসরণ করে ফেলে আসা বাঙালি জীবনের সেই জগৎচিত্রে প্রবেশ করি। দেখব এই চর্চায় কেমন এক দেশি পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে এগিয়ে বাঙালি সমাজের পরতগুলি তুলে তুলে এক সজীব সমগ্রের অবয়ব সৃষ্টি করে তুলেছেন।

॥ ৪ ॥

বাংলার 'মানব-তত্ত্ব' নিয়ে সারা জীবনের কাজের ভিত্তিতে হরপ্রসাদ জীবনের শেষে একটি সংহত সামাজিক ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছেলেন—কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। সেই অসম্পূর্ণ লেখা তাঁর মৃত্যুর পরে "বাংলার সামাজিক ইতিহাসের মূলসূত্র" নামে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। (ফাল্গুন, ১৩৫৬)। লেখাটি অসম্পূর্ণ হলেও বেশ কিছু স্থির সিদ্ধান্তের বিবৃতি এতে আছে—যা এই আলোচনায় সামনে রাখা সঙ্গত। যেমন :

"মুসলমান অধিকারের ৪/৫ শত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল, লোক প্রায় বৌদ্ধই ছিল। হিওনসাঙ্গ [হিউ এন্‌ৎ সাঙ] বলিয়াছেন, কিরণ সুবর্ণ (কর্ণ সুবর্ণ), পৌন্ড্রবর্ধণ, কোমলিঙ্গ প্রভৃতি স্থানে অন্তত ১০ হাজার বৌদ্ধ মঠ ও প্রায় একলক্ষ ভিক্ষু ছিল। সেকালে বৌদ্ধদের ভিতর ভিক্ষু ছাড়াও গৃহস্থ পুরোহিতও অনেক ছিল। তাহাদ্গিকে আর্য বলিত। তাহারা ভিক্ষুদিগকে প্রণাম করিত, ভিক্ষুরা তাহাদিগকে প্রণাম করিত না। সুতরাং এই-সকল ভিক্ষু ও পুরোহিতদিগকে যাহারা ভিক্ষা দিত ও প্রতিপালন করিত তাহাদের সংখ্যা অনেক ছিল। কত তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না, তবে এক কোটির অধিক বৈ অল্প নহে। মোট লোকসংখ্যা কত ছিল জানা যায় না, তাহার কত অংশ বৌদ্ধ তাহাও জানা যায় না। তবে দেশটা বৌদ্ধপ্লাবিত ছিল।"

পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাস হয় না যারা বলেন তাঁরা অবশ্যই এমন আনুমানিক সিদ্ধান্তে আপত্তি তুলবেন, যথাযথ পরিসংখ্যান চাইবেন—যা সংগ্রহ করা কোনো গবেষণাতেই সম্ভব নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এগোন নিজস্ব পদ্ধতিতে। প্রশ্ন তোলেন, এমন ভাবে বৌদ্ধ-প্লাবন যদি ঘটে থাকে—তার কিছু চিহ্ন, কিছু অবলেশ তো থাকবে। জীবনাচরণের দিক থেকে আমরা যেমন এখন একজন হিন্দু বা মুসলমানকে চিহ্নিত করতে পারি, তখনকার সমাজে কি তেমনিভাবে বৌদ্ধ কে—এ প্রশ্নের নিরসন করা যেত। এই জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি নেপালের ও বাংলার সমাজের, বিশেষ করে হিন্দু জনবৃত্তের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি পিঁজে পিঁজে দেখেন। কিছু পুথিপত্রও তাঁর হাতে আসে।

সবধর্মের মানুষেরই দিনযাপনের কৃত্য নির্দেশ পাওয়া যায় নানা নামে। যেমন দশকর্মের বই। বৌদ্ধ আচার-বিধির একটি খণ্ডিত পুথি হরপ্রসাদের অন্যতম বিশিষ্ট আবিষ্কার। এ পুথির লেখক ততকর গুপ্ত। এশিয়াটিক সোসাইটিতে দেওয়া রিপোর্ট 'অন দি সার্চ ফর স্যান্‌সক্রিট ম্যানস্‌ক্রিপ্ট স্' (১৯০৬-০৭—১৯১০-১১)-এ ততকরগুপ্তর এই 'আদিকর্ম্মরচনা' পুথির বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, উদীচ্য বৌদ্ধ সমাজের জীবনাচরণ সম্পর্কে এত মূল্যবান্ বই আর পাওয়া যায় না। মুসলমান আমলের আগের বাঙালির সমাজ-বাস্তবতা বিশ্লেষণে হরপ্রসাদ তাঁর বিভিন্ন

CENTRAL LIBRARY

রচনায় 'আদিকর্ম্মরচনা' শ্লোক ধরে ধরে প্রয়োগ করেছেন। বইখানির মর্যাদা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সংশয়ের কারণ নেই। বিক্রমশীল মহাবিহারের বিখ্যাত পণ্ডিত শুভাকরগুপ্তর তত্ত্বধারণা নির্ভর করে ততকর 'অদিকর্ম্মরচনা'-র রয়ান প্রস্তুত করেছিলেন। রচনাটি নবম খৃষ্টাব্দের।

এইসব সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য এবং ইঙ্গিত নির্ভর করে সে সময়ের বৌদ্ধ প্লাবিত বাঙালি সমাজের গড়ন সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় একটা ধারণা-কাঠামো গড়ে দিয়েছিলেন।

বৌদ্ধ কে? এ প্রশ্নে হরপ্রসাদ প্রচলিত একটা ভুল ধারণা প্রথমেই ভাঙেন। বৌদ্ধ মানেই ভিক্ষু নয়। সংসার ত্যাগী ভিক্ষুদের নিয়ে তো একটা গোটা সমাজ দাঁড়ায় না। গৃহী মানুষ তো থাকবেই। চাষ আবাদ, ব্যাবসা বাণিজ্য, ধনসম্বল উৎপাদনের যাবতীয় কাজ চলবেই একটি সমাজে। শুধুই ভিক্ষু, শুধুই সন্ন্যাসী—এমন সমাজ হলে বাস্তব জীবনযাত্রা চলে কী করে! তাহলে দেখতে হয় বৌদ্ধধর্মাশ্রিত সমাজের থাকগুলি কেমন ছিল এবং কীভাবে এই থাকগুলি গঠিত হত।

বৌদ্ধ সমাজের গড়ন ব্যাখ্যায় হরপ্রসাদ গৌতমবুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের সাংগঠনিক কাঠামোর তাৎপর্য নির্দেশ করে লিখছেন, "তিনি (বুদ্ধদেব) রাজার ছেলে। রাজা হইবার সর্বশিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান যে গুণ দশজনকে লইয়া সুন্দররূপে কাজ চালানো তাহা ছাড়েন নাই। ভিক্ষুসংঘের পরম উন্নতির জন্য তাঁহার যেসব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকও তাঁহার সংঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর কাহারো হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পঞ্চশীল, অষ্টশীল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।" ("কোথা হইতে আসিল", 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ'-৩, পৃ. ৩০১)। এই "বন্দোবস্ত" "শীল" নির্ভর। কে কত "শীল" মেনে চলতে পারে, তার উপরেই নির্ভর করে সামাজিক মর্যাদা।

"শীল" কী?

যে কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ আত্মমুক্তির দিকে অগ্রসর হতে সমর্থ হয় তাকে বলা হয় "শীল"। "শীল" শব্দে বোঝায়, সুনীতি অবলম্বনে কায়িক-বাচনিক-মানসিক-সংযম অভ্যাস। সাধারণ গৃহস্থ পালন করবেন পঞ্চশীল। নিজেকে আত্মিক দিক থেকে আরও সমুন্নত করার জন্য কেউ অষ্টশীল, এমনকী দশশীলও নিতে পারেন। দশটি শীল বা সম্বর যথাক্রমে —

১। প্রাণীবধ থেকে বিরত থাকা, ২। অদত্তবস্তু না নেওয়া, ৩। ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা, ৪। মিথ্যা না বলা, ৫। মদ না খাওয়া, ৬। বিকালে আহার থেকে বিরত থাকা, ৭। নাচ-গান-বাজনা বা পুতুল নাচ দেখা থেকে বিরত থাকা, ৮। বিভূষণের জন্য মালা পরা, সুগন্ধ মাখা থেকে বিরত থাকা, ৯। উঁচু শয্যা, মহাশয্যা ব্যবহার না করা, ১০। সোনারূপো প্রতিগ্রহ থেকে বিরত থাকা। এইগুলি "শীল" বা "শিক্ষাপদ"। পালি 'বিনয়পীটকে' এই দশ শীলের উল্লেখ আছে। অন্য মূল গ্রন্থে কোথাও কোথাও "শীল" গুলি কিছুটা পৃথক।

যিনি ভিক্ষু হবেন তাঁকে সবকটি শিক্ষাপদ অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু গোটা সমাজ এত কঠিন নিয়মে বাঁধা যায় না। গৃহীদের জন্য আচরণবিধি শিথিল করতেই হয়। সংঘারামে ভিক্ষুরা থাকবেন। উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সঙ্গে তাঁরা গোটা সমাজের জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রণ করবেন। সংসার যাত্রায় জন্ম থেকে প্রয়াণ অবধি যাবতীয় অনুষ্ঠান ভিক্ষু বা ভন্তেদের নিয়ন্ত্রণে চালিত হবে। আচরণবিধি যতটা শিথিল করা যাবে সেই অনুপাতে মানুষকে টানা যাবে নিজেদের কোলে। তাই দেখা যায়, সকালে উঠে যে ত্রিরত্ন উচ্চারণ করে, বলে বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি—তাকেই বৌদ্ধ সমাজের মানুষ ধরে নেওয়া হত। বুদ্ধত্ব লাভের পর মৃগদাবে (সারনাথে) এসে ৬১ জন অর্হৎ-এর উদ্দেশে উচ্চারিত বুদ্ধদেবের উপদেশে

CENTRAL LIBRARY

প্রথম এই ত্রিশরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সকলকেই দশ শীল মানতে হবে এমন বাধ্যতা না থাকায় সহজেই বৌদ্ধ-সমাজ-ভুক্ত হওয়া যেত। বাংলার জনবৃত্তে তিন বৃত্তির মানুষ গরিষ্ঠ। কৃষক ধীবর আর আখেটিক (মৃগয়াজীবী)। ধীবর এবং আখেটিকদের জীবিকাই প্রাণী হত্যা। ত্রিশরণ নিয়ে বৌদ্ধ সমাজভুক্ত হলেও এঁরা "শীল" বা "সম্বর" পেতেন না। প্রাণী হত্যা ত্যাগ করলে "শীল" পেতেন। প্রথম "শীল" প্রাণীহত্যা না করাই গুরুত্ব পেত বোঝা যায়। এই একালেও যাঁরা বৌদ্ধধর্মে আশ্রিত আছেন তাঁরা বাড়িতে অন্তত এই বিধিটি মেনে চলেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগর-ইছাপুর অঞ্চলে বড়ো বড়ো বৌদ্ধ-বসতি আছে। এঁরা মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত চাকরিজীবী। আমিষাশী, কিন্তু বাড়িতে জ্যান্ত মাছ কাটা বারণ। প্রাণীহিংসা বর্জনীয়, কারণ বৌদ্ধ পরিচয়ের জন্য প্রথম "শীল" টি মানতেই হবে।

॥ ৫ ॥

বাংলায় মুসলমান অধিকারের আগে বৌদ্ধ ছিল, হিন্দুও ছিল। পরস্পরে সম্পর্ক কেমন ছিল— এই একটি প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন মুসলমান অধিকারের পরে ও বাঙালি সমাজে অনিবার্য নতুন বিন্যাসে কে কোথায় দাঁড়াল। তৃতীয় প্রশ্ন, অত প্রবল বৌদ্ধ প্রভাব কি সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হয়ে গেল— না হিন্দু সমাজে, এমন-কী মুসলমান সমাজেও বৌদ্ধ জীবনাচারের জের কিছু রয়ে গেল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করতেন, এই তিনটি প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে কখনও বাংলার সামাজিক ইতিহাস স্পষ্ট করে তোলা যাবে না। য়ুরোপের আমদানি ইতিহাসতত্ত্বে যেমন তথ্যপ্রমাণে ঠাসা বয়ান অভিপ্রেত তেমন করে কাজ করার মতো উপকরণ আমাদের আয়ত্তে নেই। ফলে আমাদের ইতিহাস চর্চায় ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করতেই হয়। সেই বিরল উপকরণের সমস্যা অনেকটা কাটে পরিব্রাজকদের বিবরণের সাক্ষ্যে। চীনা পরিব্রাজকেরা বড়ো সহায় এদিক থেকে—যদিও তাঁদের বিবরণে কিছু অতিকথা, কিছু গল্পকথা মিশে গেছে বোঝা যায়। তবুও ফা-হিয়েন, হিউ এনৎ সাঙ, ইৎ সিং, সেঙ-চি-দের বিবরণ এবং অনুষঙ্গিক পট্টোলি, ভূমিদানের নথি মিলিয়ে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের বাংলার একটি জগৎ-চিত্র রচনা করা যায়। এই পর্বে রাজবৃত্তে এবং জনবৃত্তে হিন্দুবৌদ্ধ প্রভাবের বিমিশ্রণ সর্বত্র। এরই মধ্যে রাজবৃত্তে হিন্দু প্রাধান্য, বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব করার নজির মেলে—যেমন রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ। যত্রতত্র বৌদ্ধদের নির্যাতন তো করতেনই, বৌদ্ধগয়ায় পবিত্র বোধি বৃক্ষটি উৎপাটন করিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনিই হয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এ হল রাজবৃত্তে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধদ্বন্দ্বের এক ছবি। আবার জনবৃত্তের টুকরো খবরে জানা যায়, জনসমাজের মধ্যে হিন্দু বৌদ্ধে তেমন রেষারেষি ছিল না, নির্বিবাদ সহাবস্থানই ছিল বলা যায়। বিংশ শতাব্দীতে আমাদের সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা মনে আসে। একালে সমাজের উপরতলায় রাজনীতির মারপ্যাঁচে দাঙ্গা লাগে, সাময়িক উত্তেজনায় ঘর পোড়ে, জীবনহানি হয়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সে বিদ্বেষ কিন্তু সমাজের জীবনযাত্রা কখনও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেয় না। চাষ আবাদ, কারু উৎপাদনের কাজ, সংসারের বেদনা ও আনন্দে তরঙ্গিত জীবনযাত্রা বহে চলে। হিন্দু মুসলমান শিখ আদিবাসী যে যার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পরস্পর সহযোগিতায় এক সুস্থির সমাজ-বিন্যাস বুনে চলে। মাঝে মাঝে গুজরাটের সাম্প্রতিক বীভৎস দাঙ্গা সত্ত্বেও। এমনই স্বাভাবিক, এই ভারতের আবহমান ঐতিহ্যে। হাজার-বারোশো বছর আগের সমাজে দুটি প্রধান ধর্মের প্রভাব ছিল। বৌদ্ধ এবং হিন্দু। চীন দেশের পরিব্রাজকেরা দেখেছেন, পুথিপত্রে আমরাও কিছু নজির পাচ্ছি, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ বিভাজিত সমাজ কেমন ছিল, হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ছিল, পাশাপাশি ছিল সৌগত ধর্মে বিশ্বাসী সমাজ, বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যাও

দিয়েছেন ফা-হিয়েন, হিউ-এনৎ-সাঙ। সৌগত সমাজে কি মহাযান আর থেরবাদী হীনযান সম্প্রদায়ে স্পষ্ট ভাগা-ভাগি ছিল? চৈনিক বিবরণ থেকে খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে গোটা উদীচ্যে, উত্তর-পূর্ব ভারতে যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি ছিল এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ নেই। অরক্ষণশীল মহাযানের উদার মানসিকতার কারণেই আদিম কৌম সমাজের তন্ত্রমন্ত্রের, মূর্তি কল্পনার নানা উপসর্গ প্রশ্রয় পায়। মহাযানের বিবর্তন হতে থাকে দ্রুত। বজ্রযান, সহজযান—এমন নানান্ শাখা প্রশাখায় সৌগতধর্মের যে চেহারা দাঁড়ায় তার সঙ্গে মূল বুদ্ধবাণীর, বৌদ্ধ তত্ত্ববিশ্বের কিছুই আর মিল পাওয়া যায় না। এই বজ্রযান-সহজযান-তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেরই ব্যাপক প্রভাব ছিল মুসলমান-পূর্ব বাংলায়। এঁদেরই ধর্ম-দর্শন-নিত্যকর্মের বিধি নিয়ে রচিত অজস্র পুথি পাওয়া গেল—যার মূলরূপ অবিকৃত রেখে অনেকগুলি টেক্সট সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছেলে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—বরোদার গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউটের প্রকাশ প্রকল্পে। বহুদিন তিনি বরোদার ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সাধনমালা' ২খণ্ড বৌদ্ধমূর্তিবিদ্যা চর্চার অনন্য সহায়। মূল বৌদ্ধধর্ম আদৌ দেববাদী ছিল না। সেই ধর্মে ঢুকে গেল অজস্র দেবদেবীর মূর্তি! 'সাধনমালায়' সংকলিত মূর্তি-ধ্যান-মন্ত্রের পরিমাণ দেখেই বিস্মিত হতে হয়, বৌদ্ধধর্মের এলাকায় এত মূর্তি ঢুকল কী করে। আবার এমন কিছু তান্ত্রিক মূর্তি কল্পনা আছে যা বৌদ্ধ হিন্দু দুয়েরই উপাস্য। যেমন তারা, জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী। নৃতত্ত্বের গবেষণায় এখন স্পষ্ট, এসব দেবতা মূলত আদিবাসী কৌমসমাজের সুপ্রাচীন ধর্মীয় কল্পনার উদ্ভাবন। ক্রমে কৌমসমাজের সঙ্গে উঁচু সমাজের মেলামেশার সূত্রে এসব দেবতা বৌদ্ধদের হাত-ফেরতা হয়ে হিন্দু সমাজেও মর্যাদা পেয়েছে। এই তত্ত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, পুরীর জগন্নাথ-বলরাম সুভদ্রা-সুদর্শন বিগ্রহ। সকল যুক্তিবাদী গবেষকই এখন জানেন, মূল দেবতা ছিলেন শবরদের পূজ্য। শবর জাতির সেই দেবতা কালক্রমে বৌদ্ধধর্মে গৃহীত এবং পরে হিন্দুর পরম আরধ্যি পুরুষোত্তম। নানা লোকশ্রুতিতে এই পুরুষোত্তমের সঙ্গে শবরদের সম্পর্ক ওতপ্রোত। কানিংহাম ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে বৌদ্ধ ত্রিরতের প্রতীক বলেছিলেন। অনেকেই মনে করেন এই মন্দির আগে বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং এটি ছিল মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি কেন্দ্র। ১২ বছর পর পর নতুন মূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠার সময়ে একজন ব্রাহ্মণ চোখঁবাধা অবস্থায় পুরানো মূর্তির ভিতর থেকে রেশমের কাপড়ে মোড়া কোনো বস্তু নতুন মূর্তির ভিতরে স্থানান্তর করেন। এই গোপন বস্তুটি কোনো প্রাচীন বৌদ্ধ স্মারক মনে করা হয়। ওড়িয়া লোকগীতিতে জগন্নাথ আর বুদ্ধ অভিন্নরূপে বন্দিত। অনার্য শবর ঐতিহ্যের দেবতা বৌদ্ধ-পূজিত এবং ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের বিষ্ণুর সঙ্গে মিশে গিয়ে এক সমন্বয়ী ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর জনপ্রিয় ওড়িয়া কবি নীলাম্বর তাঁর 'দেউল-তোলা-সুয়াঙ্গ' কাব্যের গল্পে এই সমন্বয়ের ভাবটি ধরে নিয়েছিলেন। পুরীর মন্দিরের বর্তমান রূপ আনুমানিক দ্বাদশ শতকের স্থাপত্য। একটি লোককথার সূত্রে এবং আজও প্রচলিত মন্দিরের বিধিব্যবস্থায় এই তীর্থের দেবতার সঙ্গে কৌম শবর সংস্রব বেশ বোঝা যায়। লোকথায় বলা হয়, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির তৈরি করিয়ে ব্রহ্মাকে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রণ করতে স্বর্গে গেলেন। এদিকে মন্দিরটি বালির মধ্যে তলিয়ে গেল। আর-এক রাজা নীলমাধব সে মন্দির উদ্ধার করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন আর নীলমাধবে শুরু হয় প্রচণ্ড বিবাদ। জিত হল ইন্দ্রদ্যুম্নর। দৈববাণী হল, বিগ্রহ এক নদীর মুখে গাছের গুঁড়ির আকারে দেখা দেবে। ইন্দ্রদ্যুম্নর সৈন্যরা সে গুঁড়ি তুলতে পারল না, তুলল শবর বিশ্ববসু আর ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি। রানী গুণ্ডিচার ইচ্ছায় এক বৃদ্ধ ছুতোর মূর্তি গড়তে এল। তার শর্ত, কাজ শেষ না হলে কেউ মন্দিরে ঢুকবে না। শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় ছুতোরকে আর পাওয়া গেল না। মূর্তি তখন আধ-গড়া। সেই আধ-গড়া তিন মূর্তিই

CENTRAL LIBRARY

ব্রহ্মা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে দিল—কৃষ্ণ বলরাম আর সুভদ্রা। নতুন দেবতা জগন্নাথ-কৃষ্ণের ইচ্ছায় ঠিক হল শবর বিশ্ববসুর বংশধরেরা প্রধান 'পুজারি' হবে, বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সন্তানের বংশধরেরা হবে 'পুরোহিত' এবং বিদ্যাপতির শবর স্ত্রীর সন্তানের বংশধরেরা হবে মন্দিরের পাচক। আজও মন্দিরের তিনস্তরের সেবকেরা এই তিন বংশধারার মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দেন।

পূর্বভারতের, বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতিস্তরে নানা উপাদান বিমিশ্রণের এমন নজির আর হয় না। নাড়াচাড়া করে উপাদান বিশ্লেষণ করলে অন্যসব ধমকর্মে পালপার্বণে এই একই বিশিষ্টতা প্রকাশ পাবে নিশ্চিত। প্রসঙ্গত মনে আসে, পুরীর মন্দিরে জাতপাতের বিচার নেই। একি চৈতন্যদেবের প্রভাবে না কি আগে থেকেই চল ছিল! শবর রক্তের উত্তরাধিকারী যেখানে অগ্রগণ্য 'পুজারি'—সেখানে জাতপাত আদৌ হয়তো বিবেচ্যই ছিল না কখনও। যেমন রাঢ় অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের বা চৈতিগাজনের অনুষ্ঠানে ওসব ভাগাভাগির কোনো জায়গা নেই।

নানান্ সূত্রের আভাস-ইঙ্গিত মিলিয়ে মুসলমান-পূর্ব বাংলার বা পূর্বভারতের এই যে জগৎ-চিত্র দেখছি, এই জগতে এক শশাঙ্ক ভিন্ন চরম বিধর্ম-বিদ্বেষী কোনো রাজা ছিলেন না। জনবৃত্তেও নিজ নিজ ধর্মকর্ম নিয়ে নির্বিরোধ জীবনযাত্রার ছবিটিই উজ্জ্বল। দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে একেবারে দেওয়াল তোলা বিভাগ ছিল না। দানধ্যানের বিবরণে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, সম্পন্ন-বৌদ্ধ সংঘে দান করছেন, পাশাপাশি ব্রাহ্মণকেও জমি দিচ্ছেন। যেমন বৌদ্ধ জয়নাথ, তিনি আবার বৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের প্রধান রাজকর্মচারী। ছোটো বড়ো রাজারা দুই ধর্মেরই পোষকতা করতেন এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর। হিন্দু বৌদ্ধ দুই সমাজ মিলিয়ে বাংলার বাস্তব। দুই সমাজের দৈনন্দিন জীবনাচরণে তফাত অনেক। কিন্তু সেই স্বতন্ত্রতা নিয়ে নিজের নিজের জীবনযাত্রা অবিরোধে বহে যেত—এও বাস্তব সত্য।

তত্ত্বদর্শনের স্তরে অবশ্য বিরোধ ছিল অনেক, থাকবারই কথা। হিন্দু বেদ অপৌরুষেয় মানে, বৌদ্ধ বেদ বিরোধী। হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রম মানে, বৌদ্ধরা বর্ণ বিচার না করেই ভিক্ষুপদ দিতেন। বয়স ২১ হলেই হল। হিন্দু সন্ন্যাস নিলে চতুর্বর্ণ-সমাজের বাইরে যেত, আর ফিরতে পারত না। বৌদ্ধ সংঘ ছেড়ে আবার সংসারে ফিরতে পারত। হিন্দু সন্ন্যাস নিলে তার যাবতীয় সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা পেত, বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে সংঘে এলে তার যাবতীয় সম্পত্তিতে সংঘের অধিকার বর্তাত। ধনীর সম্পত্তি সংঘে আনার জন্য ভিক্ষু করার ঝোঁক ছিল কি? যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে দেখিয়েছেন! সংঘের প্রবল প্রতাপ ছিল। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভিক্ষুদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ব্যাবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া—সংঘ এসব অধিকার ভোগ করলেও রাজার শাসন মানতেই হত। রাজা অসন্তুষ্ট হলে সংঘের বিষয় আশায় বাজেয়াপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিত। রাজার পরিপোষণে ব্রাহ্মণ প্রবল হয়ে উঠলে বৌদ্ধদের অস্বস্তিতে পড়া স্বাভাবিক। তাই বিচক্ষণ সংঘ-নায়কেরা সামঞ্জস্য রেখে অবিরোধে নিজেদের ধর্মকর্ম বজায় রাখা, যতটা সম্ভব জনসমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোয় তৎপর থাকতেন।

বেদ মানা-না-মানা নিয়ে মূল বিরোধ—যা দর্শনের বিভিন্ন শাখার বিচার-বিবেচনায় প্রতিফলিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। সব দর্শনের মধ্যে সাংখ্য সবচেয়ে পুরানো। অনেকে দেখান, বুদ্ধদেবের সাধনালব্ধ পরমার্থ জ্ঞানের ভিত্তি সাংখ্য মত। সাংখ্য বলে, সৎ থেকে সৎকাজের উৎপত্তি, প্রক্রিয়াটি কার্যকারণের। বুদ্ধ কিন্তু এই সৎকার্যবাদ অগ্রাহ্য করে ক্ষণিকবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। ন্যায়শাস্ত্র নিয়েও প্রবল বিরোধ। হিন্দু বৌদ্ধ দুই-ই ন্যায়ের আদি-মনীষী অক্ষপাদকে মানেন। কিন্তু ব্যাখ্যায় দুটি প্রতিমুখ তত্ত্ব দাঁড়িয়ে যায়। বাৎস্যায়ন অক্ষপাদের সূত্রগুলির টীকা করেন। সে টীকার বক্তব্য খণ্ডন করেন বৌদ্ধ দিঙনাগ। দিঙনাগকে খণ্ডন করেন উদ্যোতকর। এই 'খণ্ডন-মণ্ডণ'

CENTRAL LIBRARY

চলতেই থাকে। এত পাণ্ডিত্য বোধ হয় বুদ্ধদেব দেখান নি। তিনি নির্বাণের কথা বলেন। নির্বাণের পরে কী জিজ্ঞাসা করলে বুদ্ধদের বলতেন, সে জ্ঞানে তোমার কী প্রয়োজন। জন্ম-জরা-মরণ পেরিয়ে গেলে, সেই তো যথেষ্ট। 'শূন্য' নিয়েও তত্ত্ব করতে চাইতেন না। কিন্তু এইসব মৌলিক বস্তু নিয়ে হিন্দু বৌদ্ধে প্রবল মত বিরোধ দাঁড়িয়ে যায়। বুদ্ধির লড়াইয়ে দুই পক্ষেই তীক্ষ্ণ মেধার মানুষ অনেক। সে ইতিহাস ভারতীয় কালচারের উচ্চতম, সূক্ষ্মতম স্তরে উঠেছিল এ খুবই গৌরবের কথা। কিন্তু সে বুদ্ধির লড়াই সাধারণের জীবনকে কখনও তেমন প্রভাবিত করেনি। কোনো কালেই করে না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন, একই সমাজের দুই ভাগ হিন্দু আর বৌদ্ধে এক সময়ে আচার বিচারেও প্রচুর ফারাক ছিল। উপবাসের নিয়ম, কামানোর নিয়ম, বিছানা, পরিধেয়, স্নানের নিয়ম, মুখ ধোওয়া, কাপড় কাচা, তেলমাখা, শৌচ—সব বিষয়েই নিয়ম সব আলাদা আলাদা। কিন্তু তাতে জীবন যাপনের ধারা, বৈষয়িক কাজের ধারা কখনও আলাদা হয়ে যেত না। এই দূরের কালে বসে জেনে আমরা মজা পেতেই পারি, "বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠে পাইখানা থাকিত। হিন্দুদের কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ। তাহাদের পাইখানার ব্যবস্থা ছিল না। নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেখান হইতে তীর ছুঁড়িলে যেখানে গিয়া পড়ে, সেখানে তাঁহারা শৌচ করিতে যাইতেন।" কিংবা এই খবর, "স্মৃতিতে যদিও পাইখানার নাম পাওয়া যায় না, অশোক রাজার পাইখানা ছিল, তিনি সেখানেও রাজকার্য করিতেন।" এসব ব্যবস্থার জের এবং ভেদাভেদ কতদিন চলেছিল কে জানে, কিন্তু এতে সমাজ কখনও পুরোপুরি দুভাগ হয়ে যায় নি। ভারতে বা বাংলায় মুসলমান অভিযানের আগের জগৎ-চিত্র এমনই ছিল। সব ওলট-পালট হয়ে গেল মুসলমান অভিযানে।

নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, বৈদেশিক এই অভিযানের নায়কদের ভারতে দুই ধর্মের, হিন্দু ও বৌদ্ধের তফাত সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। বড়ো বড়ো বৌদ্ধ বিহার আক্রমণের মুখে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ভিক্ষুদের প্রাণ যায়। যাঁরা পুথিপত্র নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন তাঁরা উত্তরে চলে যান। নেপালে তিব্বতে অত বৌদ্ধ পুথিপত্র জমে ওঠার এটাই কারণ। জনসমাজে এই ওলট-পালটের সময়ে ঠিক কী ঘটছিল তার কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়া সম্ভব নয়। চোদ্দর পনেরোর শতকগুলির ইতিহাস "একেবারে সাদা"। তারই মধ্যে আবছায়া কিছু তথ্য নজরে আসে —যার সঙ্গে পরের পর্বের ইতিহাসের একটা সংযোগ যেন ধরা যায়। ভিক্ষুদের নিয়ন্ত্রণেই বৌদ্ধ-সমাজ চলত। বড়ো বড়ো বিহারগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। ভিক্ষুরা শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে দেশান্তরী হলেন। ফলে বাংলার সমাজের একটা বড়ো অংশ, বৌদ্ধ অংশ যে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায়, বাণিজ্যে, আর্থিক জীবনে এঁদের তো একটি মান্য ভূমিকা ছিল। এই দিশাহারা অবস্থায় নিশ্চয়ই এসব মর্যাদা-হারা মানুষ সামনে দুটি পথ খোলা দেখেছিলেন। হয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ, নয়তো, হিন্দু সমাজের অনাচারণীয় থাকে আশ্রয় নেওয়া। অবশ্যই বহু মানুষ তখন ইসলাম নিয়েছিলেন—না হলে দেশের জনস্তরের একেবারে নিচের থাকে, চাষাভুষোর মধ্যে এত সংখ্যায় মুসলমান এল কোথা থেকে? আবার হিন্দু সমাজের নিচের থাকে দেখা যাচ্ছে একই জাতের মধ্যে জলচল জল-অচল দুই উপবিভাগ। বৌদ্ধসমাজ থেকে যাঁদের হিন্দুসমাজে নেওয়া হল তাঁদের এইভাবে জল-অচল করে রাখা হয়েছিল। সামাজিক ইতিহাসের ভাবুকদের এই ভাবনায় সত্য আছে মনে হয়। নয়তো মুসলমান অধিকারের পরের হিন্দু সমাজে এত রকম থাক আসবে কেন। ব্যাপক ইসলামায়নের জোয়ারে হিন্দু সমাজের ভাঙন ঠেকাবার জন্য বৌদ্ধ সমাজকে নিজেদের মধ্যে টেনে নেওয়ার চেষ্টা খুব স্বাভাবিক। নানান্ বৃত্তিজীবী বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁরা ইসলাম নিলেন না তাঁরা হিন্দু সমাজে এলেন—কিন্তু এ সমাজে পুরো মর্যাদা পেলেন না।

CENTRAL LIBRARY

জল-অচল, অনাচরণীয় হয়ে রইলেন। এই পর্বটা পেরিয়েও কিন্তু কোথাও কোথাও ভাঙাচোরা বৌদ্ধ সমাজ টিকে ছিল। না হলে চূড়ামণি দাস 'গৌরাঙ্গবিজয়ে' (রচনাকাল আ. ১৫৪২-৫০ খৃ.) চৈতন্যের জন্মে মানুষের উল্লাস বর্ণনায় কেন লিখবেন,

বৌদ্ধ তার্কিক মৈমাংসিক বৈদান্তিক।
সভাকার নাটে কহে ইবে দেখি ধিক।।

তবে স্বতন্ত্র বৌদ্ধ সমাজ বলে সংগঠিত কোনো সমাজের অস্তিত্ব থাকা আর সম্ভব ছিল না। টিকে থাকলেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ধরনেই ছিল। ইসলামের চাপে হিন্দু-বৌদ্ধ একাকার হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক—এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপমাটি স্মরণীয়।

"ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, যদি একটি কাঁচপোকা ও একটি আরশুল্লাকে একটা শিশি বা বোতলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আরশুল্লাটা কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে; দুইটাই কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ইতর বিশেষ করা যায় না। মুসলমান অধিকাররূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই শত শত বছরের পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর-বিশেষ করা যায় না।" ভিক্ষু অভিভাবকত্ব-হারা বৌদ্ধ সমাজের অনেকটাই ইসলাম নিল, বাকিটা গ্রস্ত হল হিন্দু সমাজে। ফলে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাঙালি সম্পর্কে, হরপ্রসাদের ভাষায়, বলাই যায় "বাংলার হিন্দু ও মুসলমান একজাতিমাত্র"। যদিও সৈয়দ—কাজীরা আরবীয় রক্তের দাবিতে মুসলমান সমাজে আভিজাত্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা ছাড়েন নি।

তাহলে শেষ প্রশ্ন—বাংলায় যে অত সমুন্নত এক বৌদ্ধ কালচার গড়ে উঠেছিল, পাল রাজাদের বিশাল প্রতিপত্তি, তত্ত্ব—দর্শনের বিপুল চর্চা, বৈষয়িক জীবনে বৌদ্ধদের উজ্জ্বল ভূমিকা, বুদ্ধিজীবী বৌদ্ধ কায়স্থদের ব্যাপক প্রতিপত্তি—এসব কোনো চিহ্নমাত্র না রেখে সম্পূর্ণই লুপ্ত হয়ে গেল? রেশমাত্র রইল না? 'গ্যাগার ছোন্‌জুঙ্‌' ('ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস'—১৬৮০ খৃ.) গ্রন্থে তিব্বতি ঐতিহাসিক তারনাথ (জন্ম আ. ১৫৭৫ খৃ., মতান্তরে ১৫৭৩ খৃ.) বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, বাংলায় তার কোনো জের থাকবে না—অনেকেই এ খুব স্বাভাবিক নয় মনে করে সন্ধান-সমীক্ষা চালিয়ে এসেছেন। এই ধারার গবেষণা বিতর্কে ভরা। মতের একতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি তেমন। তবুও বাংলার সামাজিক ইতিহাসের আখ্যানে তার জায়গা আছে। শেষ কথা কেই-বা বলতে পারে জ্ঞানচর্চায়।

।। ৬ ।।

একটা বড়ো এবং প্রায় সর্বজনমান্য তথ্য আগে দেখেছি পুরীর জগন্নাথ নিয়ে। ধর্মীয় সংস্কৃতির মানচিত্রে ওড়িশা, বিশেষত জগন্নাথ-মন্দির সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ঐতিহ্য বাংলার বাইরে নয়। চৈতন্যের আগে বা পরে। এর পরেই বোধ হয় এক প্রধান প্রসঙ্গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কার ধর্মঠাকুরের পূজার ঐতিহ্য। শাস্ত্রীমশায়ের মতটি প্রকাশ পায় ১৮৯৭-এ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে। তাঁর লেখা 'রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল' প্রবন্ধ সেখানে পড়া হয় এবং তখন থেকেই সমূহ বিতর্ক চলে আসছে। এই বছরই এ বিষয়ে তিনি প্রকাশ করেন Discovery of Living Buddhishin Bengal পুস্তিকা। শাস্ত্রীমশাই দীর্ঘকাল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন, ধর্মঠাকুরের পূজা বাংলায় বৌদ্ধধর্মর অস্তিত্বের জীবন্ত প্রমাণ। ধর্মঠাকুর আসলে বুদ্ধ। "ধর্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্মের শেষ।" এই সিদ্ধান্ত উত্তরকালের গবেষকরা কেউই মানেন নি, কিন্তু এ নিয়ে গবেষণায় যে বিপুল রচনা জমে উঠেছে তার মধ্যে বাংলার ধর্মকর্মের বিমিশ্রিত চরিত্র সম্পর্কে সহমত

CENTRAL LIBRARY

প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রীমশায় নিজেও ইংরেজি পুস্তিকাটিতে ইঙ্গিত করেছিলেন, অনার্য কৌম সংস্কৃতির আদিস্তরের এক বা একাধিক দেবতাকল্পনা পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-ইসলামি প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে ধর্মপূজা রূপে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে। ধর্মঠাকুরই বুদ্ধ এ সিদ্ধান্ত শরচ্চন্দ্র রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য—এঁরা কেউ না মানলেও এঁদের সবারই গবেষণা এগিয়েছে শাস্ত্রীমশায়ে মিশ্রপ্রভাবের ইঙ্গিত ধরে। এই আকর্ষণীয় গবেষণার সার সংকলন করেছিলাম 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' তৃতীয় খণ্ডের প্রাসঙ্গিক তথ্যে, ২২২-২২৯ পৃষ্ঠায়। এখানে উল্লেখ করি, রচনা-সংগ্রহ সম্পাদনায় উপদেষ্টা ছিলেন সুকুমার সেন। মতান্তর হওয়ায় তিনি নিজের স্বাক্ষরে স্বতন্ত্র টীকা দিয়েছিলেন। যাঁর যাই মত হোক, এটা মান্য সত্য যে শাস্ত্রীমশায় মুসলমান শাসনকালের বাংলার ইতিহাসের এক নেপথ্য উন্মোচন করে দিয়েছিলেন ধর্ম-পূজার বৃত্তান্তে, যে বৃত্তান্তে "ব্রাহ্মণ্য" বস্তুটির কোনো জায়গা নেই। আজ যাঁদের ছোটো জাত বলা হচ্ছে তাঁরাই সে কাহিনীতে রাজারাজড়া। তাঁরাই পুজারি পুরোহিত। ধর্ম ঠাকুরের মূল পুরোহিত অবশ্যই হবেন ডোম জাতীয়। অবশ্যই হিন্দু সামাজিক কাঠামোর বাইরে এ বস্তুর অবস্থান। হিন্দু সমাজের বাইরে, অথচ মুসলমান নয়। তাহলে আর একটিই বিকল্প থাকে, বৌদ্ধের জের। এ যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এ রকম লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মচর্চার একটা জের বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতিতে রয়ে গেছে। লোক সঙ্গীতের ধারা উপধারায়, বিশেষ বিশেষ লোকধর্মের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সেই রেশ পাওয়া যায় আজও।

এসব উপাদান ধরে এক ধরনের গবেষণা চলে আসছে এবং বিংশ শতাব্দীর উত্তর অর্ধে অনেক যোগ্য গবেষক এই মাটির কাছাকাছি বয়ে চলা অব্রাহ্মণ্য ধারাটির বিশদ পর্যালোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত এইসব উপাদানের আড়ালের কিছু তত্ত্বকথা এখানে তোলা যায়।

মহাযানে ধর্মাচরণের কঠোর রীতিনীতি শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল। এই ধারায় বহু মনীষী দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা অসাধারণ মেধায় বৌদ্ধবিদ্যার মূল ধারণাগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মহাযানের দার্শনিক তত্ত্ব কাঠামো তৈরি করেছিলেন। সে অতি গৌরবের কথা। মহাযানে শূন্যতার তত্ত্বের সঙ্গে মিশেছিল করুণার তত্ত্ব। মানুষ সম্পূর্ণ নেতির দর্শনে ভরসা পায় না। মানবিক সম্পর্কের মধ্যে অবিরত মমতার টানাপোড়েন যে চলে—তাকে তো তুচ্ছ করা যায় না। সেই কারণেই বলতে হয়, স্বয়ং গৌতমবুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেও করুণার বশে মানুষের মধ্যে রয়ে গেলেন। করুণা-তত্ত্বের বিবর্তন বাংলার বৌদ্ধধর্মে অনেক দূর গড়িয়েছে। এই বিবর্তনেই এসেছে সহজযান। প্রবেশ করেছে তন্ত্র। তন্ত্র এক বহু প্রাচীন সাধন-পদ্ধতি। এ পদ্ধতি শৈব বৌদ্ধ বৈষ্ণব সকলেই নিয়েছে এক সময়ে। তন্ত্র বোধ হয় নির্দিষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিয়ে দিল, শূন্যের নামে, মায়ার নামে সব ভোগ-উপভোগ বর্জন করার কোনো অর্থ নেই। বরং ভোগের পথেই দৃঢ়চিত্ত মানুষের আধ্যাত্মিক উত্তরণ সম্ভব। সহজপন্থিরা বোঝালেন, মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপপুণ্য ধারণা নিরর্থ। যোগাচার দর্শনে বলা হয়েছিল, শেষ যা থাকে তা 'বিজ্ঞান' মাত্র। সহজ মতে বলা হল, কিছুই থাকে না, থাকে শুধু 'আনন্দ'। আনন্দ আর সুখ একই কথা। সুখ বা মহাসুখ। মহাসুখের চরম উপলব্ধি বোঝাতে বার বারই স্ত্রী পুরুষ যৌন মিলনানন্দের উপমা আনা হল। আর এল এ পথে গুরুর ভূমিকার কথা। গুরু ছাড়া গতি নেই। পরমসুখের পথে চরম উপলব্ধির গূঢ়তত্ত্ব কে বোঝাবে গুরু ছাড়া। "গুরুর প্রসাদেই পরমসুখ লাভ হয়।" তন্ত্র প্রভাবিত সহজযানের তত্ত্ব বোঝাতে শত শত পুথি লেখা হল ক্রমে। আবার সংস্কৃত ছেড়ে (পাণিনির তোয়াক্কা না করে লেখা সে অতি বিচিত্র সংস্কৃত!) দেশি চলিত ভাষায় কীর্তনের পদের মতো পদ বেঁধে

সহজপন্থিরা তাঁদের সাধনভজন ধ্যানধারণার কথা প্রচার করে বেড়াতেন। গুরু সিদ্ধাচার্যরাই কবি। চমৎকার চিত্রকল্পে সাজানো, গভীর অর্থবহ ভাষায় পদ লিখতেন এঁরা। ভাষার দুটি মাত্রা। আপাত অর্থের মাত্রা আর তত্ত্ব সংকেতের মাত্রা—যাকে বলা হত সন্ধা বা সন্ধ্যাভাষা। রাগরাগিনীতে নিপুণভাবে বিন্যস্ত। পটমঞ্জরি, বড়াড়ি, গুঞ্জরি, কামোদ, মল্লারি, দেশাখ, ভৈরবী, মালসী, বঙ্গাল—এমন-সব রাগ যার ধারাবাহিকতা আছে। এসব রাগ জয়দেব ব্যবহার করেছেন 'গীতগোবিন্দে', বড়ুচণ্ডীদাস ব্যবহার করেছেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'। তার মানে, রাজসভার কবি জয়দেব থেকে একেবারে ভিক্ষাজীবী সহজিয়ারা এবং পরের কালে পালাগান আর বৈষ্ণব কীর্তনেও এসব রাগ চলে এসেছে। কী বাজনা ব্যবহার করা হত সবজিয়াদের গানের সঙ্গে তারও ইঙ্গিত ওই পদাবলির মধ্যে মেলে: একতারা, বীণা, ঢোল, ডমরু, দুন্দুভি। এই সঙ্গীতিক বাহনে সহজিয়ারা দেশের মানুষকে "একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। লোকে যাহা চায় সহজিয়ার-তাহাই দিল; কেবল বলিল গুরুর কাছে উপদেশ লও।" (হরপ্রসাদ)। সহজিয়াদের এই তত্ত্বের গানই চর্যাপদ, বাংলাভাষায় লেখা আদিতম সাহিত্যকীর্তি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। লুইপাদ, সবরপাদ, বীণাপাদ, ভুসুকুপাদ, কৃষ্ণাচার্য—এসব সিদ্ধাচার্যরা যে বুদ্ধিমার্গের উজ্জ্বল গৌরবের অবস্থান থেকে বৌদ্ধধর্মদর্শনকে অনেক অনেক নিচে নামিয়ে এনেছিলেন, সন্দেহ নেই। অন্য দিকে আবার ভবিষ্যতে মানবসত্যের গভীর গভীর উপলব্ধি ধারণ করবে এমন এক কাব্যভাষার জন্ম দিয়েছিলেন—সে গৌরব তাঁদের প্রাপ্য। তাঁরা জানতেন না—যে ভাষার ধাত্রীত্ব করছেন নিজেদের রচনায়, সেই ভাষা দূর ভবিষ্যতে একদিন রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার আত্মপ্রকাশের ভাষা হবে।

সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মাচারের ভাঁজে ভাঁজে তান্ত্রিক আচার, তন্ত্রের সাধন পদ্ধতি মিশে গেল। সিদ্ধাচার্যদের চর্যাগানের ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থেকেছে। প্রমাণ তরাই অঞ্চল থেকে শশিভূষণ দাশগুপ্তর আবিষ্কার—যা 'নবচর্যাপদ' সংকলনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গানের ধারা যেমন হাজার বছর ধরে টিকে রইল তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধ্যানধারণার আড়ালে লোক জীবনের অবতলে ফল্গু ধারার মতো নাথপন্থ, শৈবতন্ত্র, সহজিয়া বৈষ্ণব, শাক্ততন্ত্র এমন নানান উপাসনা পদ্ধতির ধারা বহে চলেছে আবহমান। আউল বাউল কর্তাভজা কত উপাসক সম্প্রদায়! এদের ধর্মীয় উপলব্ধির প্রকাশ-মাধ্যম গান। এই গানের ভাষায় নান্দনিক অভিব্যক্তি আমাদের বড়ো আদরের বস্তু, সাহিত্যের সম্পদ। কিন্তু এসব গানের প্রচ্ছন্ন অর্থ, যা নাকি গুরু না ধরলে বোঝাই যায় না, যা ইদানীং আমাদের জানার মধ্যেও এসে গেছে অনেকটাই — তাকে দেহসাধনার, "পঞ্চকামোপভোগ"-এর চরম বিকার মনে করে কেউ কেউ বলেছেন, বৌদ্ধধর্মের সরলীকরণের নামে এ জিনিশ যা দাঁড়িয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা "ঘোমটা দেওয়া কামশাস্ত্র"। হরপ্রসাদ খুব বিরক্ত হয়ে লেখেন, " আমি বলি.... যেখানে কামশাস্ত্র শেষ হয়, সেইখানে বুদ্ধদিগের গুহ্যপূজা আরম্ভ।" কথাটা অত্যুক্তি নয়। যেমন "তথাগত গুহ্যক' নামের এক পুথিতে বলা হচ্ছে।

"হস্তিমাংসে হয়মাংসে শ্বানমাংসং তথোত্তমম্।"

হাতির মাংস, ঘোড়ার মাংস, কুকুরের মাংস সেই রকম উত্তম। (এ মাংস) ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই খাওয়া উচিত। তা না হলে অন্নই ভক্ষণ করবে।

"খাদাই হোক বা পেয়ই হোক অল্পমাত্রায় আহার করা উচিত ব্রতধারীর। বিষ্ঠা, মূত্র ও মাংস যোগ করে নিয়ম মতো তা প্রস্তুত করবে।"

"বুদ্ধ-জ্ঞান-সমুদ্রের যিনি প্রভু, তাঁর চারটি নিয়ম রক্ষা করো। বিষ্ঠা এবং মূত্র সর্বদাই গ্রহণ করতে হবে—এই হল অদ্ভুত গোপনীয় (গুহ্য) তত্ত্ব।"

আবার বলা হচ্ছে, "দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ" কোনো সদাশয় চণ্ডালের বারো বছরের কন্যাকে সাধক বিশেষভাবে প্রত্যহ নির্জনে সেবা (অর্থাৎ পরিচর্যা করবে)।" (সুকুমার সেনের অনুবাদ)।

নীতি নির্দেশটি পরিস্কার—দুষ্কর কঠোর নিয়ম করে সেবা করলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় না—সর্বপ্রকার কামোপভোগ করে যদি সেবা করো—তাহলে নিশ্চয় শিগ্‌গির সিদ্ধি লাভ হবে।

এ নিঘিন্‌নে যোগী সাধকদের কথার মধ্যে আরও কোনো সাংকেতিক অর্থ আছে কিনা কে জানে!

সাংকেতিক অর্থ থাক-বা-না-থাক—এই রাশি রাশি সহজিয়া পুথি রচয়িতাদের মধ্যে কোনো উচ্চাঙ্গের দার্শনিকতা ছিল না। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে কোনো রত্নাকর শান্তি, শীলভদ্র, নাগার্জুন, দিঙনাগ বা দীপঙ্করশ্রী জ্ঞান ছিলেন না। কোনো 'বোধিপথ-প্রদীপ' (দীপঙ্করশ্রী রচিত) লেখার সাধ্য ধরেন, এমন কারও আবির্ভাব হয়নি।

এই একবিংশ শতাব্দীতে প্রকটভাবে বাংলায় বৌদ্ধের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। চট্টগ্রামে যাঁরা আছেন বা চট্টগ্রাম থেকে যাঁরা বাংলা ভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে বসতি করেছেন, তাঁরা অনেক পরে—খুব বেশি হলেও চারশো বছর আগে আরাকান থেকে বৌদ্ধধর্ম লাভ করেন। এঁরা থেরবাদী—মহাযান বা সহজযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন।

বরং বলা যায় শাক্তদের কালীর সঙ্গে মিশে গেছে বৌদ্ধ তারা, বৈষ্ণব তীর্থ নবদ্বীপে রাসের সময়ে ধুমধাম করে যত রকম কালীমূর্তি পুজোর আয়োজন হয় তার মধ্যে পাওয়া যায় কোনো কোনো বৌদ্ধ দেবীর রূপান্তর। নবদ্বীপেই আছে সহজিয়া বৈষ্ণবদের গোপন সাধনপীঠ। সেখানে হয়তো মিলবে উপরে উদ্ধৃত 'তথাগত গুহ্যক' পুথির সাধন পদ্ধতির অবশেষ। মিলবে আউল বাউলদের মধ্যেও। ব্রাহ্মণ্য বিরোধী লৌকিক ধর্মের ধারাতেই বৌদ্ধপ্রভাব চিহ্নিত করা সম্ভব। আর গৃহস্থের জীবনে এত কাল পরে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের জের খোঁজা বৃথা। প্রকাশ্য সামাজিক জীবনে আরশুল্লার কাঁচপোকা হয়ে যাবার উপমাটাই সত্যি।

এই আখ্যান রচনায় আমি রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নীহাররঞ্জন রায় আর তারনাথ-এর লেখা ব্যবহার করেছি।

থেরবাদী দৃষ্টিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধচর্চার পর্যালোচনা

জিনবোধি ভিক্ষু

আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস-ঐতিহ্য নানা কারণে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। উপাদানের অভাবে সে ইতিহাস-উদ্ধার দুসাধ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ ইতিহাসের গতিধারা সম্যকভাবে অবহিত হতে না পারলে কোন জাতির অগ্রগতিসাধন সম্ভব হয়ে উঠেনা। ইউরোপীয় পন্ডিতগণ বিশেষ করে উনিশ শতক হতে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস-উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁরা বাঙ্গালীর সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম ইত্যাদিরও ইতিহাস সন্ধানে কঠোর শ্রম ও মেধার প্রয়োগ করেছিলেন। আমাদের ভারতীয় পণ্ডিতেরাও ইতিহাস-উদ্ধারের কাজে নেমে পড়েন। ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাবে আমাদের সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিকগণ জীবনের নানাক্ষেত্রে আমাদের গৌরবের দিকগুলো অবলুপ্তির অন্ধকার থেকে আলোর বৃত্তে নিয়ে আসেন।

ছাব্বিশ শতাব্দী পূর্বে উদ্ভূত বুদ্ধের চিন্তাধারা এ উপমহাদেশের জীবনধারায় গভীর ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারত-বাংলার গৌরবের অনেকগুলো দিক বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত। অথচ সে ইতিহাস চাপা পড়েছিল মাটির তলায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রাজেন্দ্রলাল মিত্র-রমেশচন্দ্র দত্ত-রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরো অনেকে ভারততত্ত্ব উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এঁদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথমতঃ বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম হন এবং এরই ধারাবাহিকতায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ধর্মসম্বন্ধীয় বৌদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। তাঁর সে পাণ্ডিত্য কিংবদন্তীর মতো বহুশ্রুত। তবে থেরবাদী দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত কোন-কোন ক্ষেত্রে বিরূপ বলে মনে হয়। এখানে সে সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করছি।

"এশিয়ার ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে মানুষের যা-কিছু কীর্তি এবং প্রকৃতির যা কিছু উৎপাদন অনুসন্ধানের জন্য ১৫ই জানুয়ারী ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোনস (১৭৪৬-১৭৯৪) এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করলেন।"[১] এই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ফলে ইউরোপীয়দের মধ্যে এশিয়া সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভারতীয় ইতিহাস রচনার ভিত্তি তৈরী করা এই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক ও ধর্মীয় নির্দশন গুলির প্রামাণিক কোন গ্রন্থ না থাকাতে বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত স্থানিস্লাস জুলিয়েন (Stanislas Julien) হিউয়েন সাং রচিত চৈনিক ভ্রমন কাহিনী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে ইউরোপীয়দের নিকট ভারতীয় ভৌগোলিক তথ্য উদ্ধারের পথ সুগম করেছিলেন।[২] এছাড়া ইউরোপীয়দের মধ্যে ভারতের তথ্যানুসন্ধানী দুইজন পণ্ডিত সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যাচর্চায় নিজেদের বিদ্যা, মেধা এবং শ্রম অকাতরে নিয়োগ করেছিলেন একজন "ডিপ্লোম্যাট স্কলার" ব্রায়েন হটন হজসন (Brain Houghton Hodgson ১৮০০-১৮৯৪), অপরজন "হারমিট স্কলার" আলেকজান্ডার চোমা দ্য কোরোস (Alexander Csoma de Koros.) এঁরা দু'জনই তিব্বত থেকে প্রচুর পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন। এ সব মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তিত রূপ সহজ যান-বজ্রযান শাস্ত্রগ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ। এই বিপুল অনুবাদ গ্রন্থাবলী দু'টো ভাগে বিভক্ত-কেঙ্গুর ও তেঙ্গুর। কেঙ্গুর বুদ্ধবাণীর তিব্বতী অনুবাদ, তেঙ্গুর বৌদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে লেখার সংগ্রহ। তিনশত চৌত্রিশখানি করে দুই প্রস্ত এই পুঁথির সংগ্রহ তিব্বতী বৌদ্ধশাস্ত্রের মহাকোষ। হজসন নেপালে বিভিন্ন পদে একটানা একুশ বছর চাকুরী করেন। শেষ পর্বে ১৮৩৩ থেকে ১৯৪৩ অবধি ভারত সরকারের রেসিডেন্ট হিসাবে ছিলেন। নেপালে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ টিকে আছে

এই অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি আঠারোটি প্রবন্ধ লেখেন।"[৩] আলেকজান্ডার চোমা দ্য কোরোস (Alexander Csoma de Koros) নামক জনৈক হাঙ্গেরীয় অধিবাসী আপন শিকড় সন্ধানে প্রথমে কাশ্মীরের লাদাখ এবং পরে তিব্বত গিয়ে তিব্বতী ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রথমে A Grammar of Tibetan Language in English এবং তিব্বতী অভিধান রচনা করেন। এই জ্ঞানসাধক কঠোর পরিশ্রম করে তিব্বত থেকে ৩২০টি পুঁথির অনুলিপি সংগ্রহ করে কলকাতায় আসেন।

সংস্কৃত, নেপালী এবং তিব্বতী ভাষায় রচিত পুঁথির বিশাল ভাণ্ডারে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির তথ্যাবলী সংরক্ষিত আছে জেনে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঐসব আকর থেকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার উপাদান উদ্ধারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিতগণও তাঁদের প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে এই ইতিহাস উদ্ধারে নিজেদের প্রতিভা প্রয়োগ করতে এগিয়ে এসেছিলেন উল্লেখ্য এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ১৬টি মূল নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল।[৪] এই নীতিগুলি ভারতীয় পণ্ডিতদের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির ছত্রছায়ায় ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা করেন।

রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রথম ভারতীয় পণ্ডিত যিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন (১৮৮৫)। প্রথমে তিনি প্রায় দশবৎসর (১৮৪৬-১৮৫৬) এই সোসাইটির কর্মসূত্রে জড়িত ছিলেন। তারপর তিনি এই সোসাইটির সহ-সভাপতি এবং সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি এই সোসাইটির সহিত জীবনের দীর্ঘ ৪৭ বৎসর নানা ভাবে যুক্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্র লাল মিত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে সোসাইটির কর্মকাণ্ডে পরিচিত করেছেন। এর আগে ১৮৮২খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহায়তার The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal প্রকাশিত করেন। বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষা গবেষনা ব্যাপারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে গুরু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তিনি সারা জীবন এই কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্র লাল মিত্রের আনুকূল্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মৃত্যুর পর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহকার্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি আজীবন এই সোসাইটির সহকারী সভাপতি। ১৯১৯-২০ এবং ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। সোসাইটির পুথি সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমন করেছিলেন। ১৮৭০-১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্র লাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে সোসাইটিতে রক্ষিত সংস্কৃত পুথি গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১০ খণ্ডে সংকলন এবং দশম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। পুথি সংগ্রহের প্রথমে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালে গমন করেন। তখন তিনি সিসিল বেণ্ডেল (Cecil Bandal-১৮৫৬-১৯০৬) নামক জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসেন। ঐতিহাসিক সিসিল বেণ্ডেল একদিন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন ভরতে এত সংস্কৃত পণ্ডিত রয়েছেন কিন্তু সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যায় কেউ উৎসাহী নন[৫]। বেণ্ডেল সাহেবকে আত্মপরিচয় দিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার নেপালে গিয়ে বেণ্ডেলের সহিত সংস্কৃতে "সুভাষিত সংগ্রহ" এবং দোঁহাকোষ পঞ্জিকা সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তৃতীয়বার নেপাল গিয়ে বাংলাভাষার

CENTRAL LIBRARY

প্রাচীন নিদর্শন "চর্য্যাচর্য বিনিশ্চিয়" এবং উহার সংস্কৃত টীকার পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন।[৬] ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চতুর্থবার নেপাল গিয়ে তিনি সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ বিষয়ক পুঁথি সংগ্রহ করে "বৌদ্ধ বাতিক গ্রস্ত' বলে পরিচিত হয়েছিলেন।[৭]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত নৈহাটিতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর ভট্টাচার্য বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম রায়কমল ন্যায়রত্ন এবং মাতার নাম চন্দ্রমুনী দেবী। প্রথমে হরপ্রসাদের নামকরণ করা হয়েছিল শরৎনাথ। একবার কঠিন রোগ থেকে হর প্রসাদ সেরে উঠেন, এই বিশ্বাসে তাঁর নূতন নামকরণ করা হয় হরপ্রসাদ। শৈশবে হরপ্রসাদ তাঁর পিতাকে হারিয়ে লেখাপড়ায় বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হন। ১৮৬৬ খ্রিস্টব্দে তিনি বিদ্যাসাগর ছাত্রাবাসে থেকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। বিদ্যাসাগর ছাত্রাবাসে তিনি কয়েক মাস ছিলেন। ১৮৬৬ হতে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কৃতিত্বময় ছাত্রজীবনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মূলত সংস্কৃত কলেজে এবং অংশতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে লেখাপড়া করেন। সেই সময়ে বি.এ. শ্রেণীতে সংস্কৃত বিষয় পড়তে হত সংস্কৃত কলেজে এবং ইংরেজী বিষয়গুলি প্রেসিডেন্সি কলেজে।[৮] প্রাচীন পণ্ডিত বংশের ছেলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু কলকাতায় নতুন পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৎকালীন দুইজন ভারত জিজ্ঞাসু পাশ্চাত্য শিক্ষায় মার্জিত তীক্ষ্ণ মনীষা রমেশ চন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯০) এবং রাজেন্দ্র লাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) এর সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের অনুপ্রেরণায় তিনি ভারতীয় বিদ্যাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের মধ্যপ্রদেশে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। সম্বোধি লাভের পর ৪৫ বৎসর তিনি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রচলিত ভাষায় তাঁর ধর্ম প্রচার করে এক বিরাট ভিক্ষুসংঘের সৃষ্টি করেছিলেন। তৎকালে লিখন পদ্ধতির কোন সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খলিত পদ্ধতি না থাকাতে ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধের বাণী শ্রবন করে তাহা শ্রুতিতে ধারণ করে রাখতেন এবং গুরু পরম্পরা শিক্ষা করতেন। এতে গুরুদের মধ্যে বুদ্ধের মৌলিক আদর্শ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হওয়াতে ভিক্ষুসংঘ বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আরও নানা কারণে বৌদ্ধধর্ম ভারত হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে দুইটি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। (১) শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে প্রচলিত থেরবাদী বৌদ্ধধর্মকে প্রাচ্য বৌদ্ধবিদ্যা বলা হয়। (২) কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি উত্তরপূর্ব দেশের সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যাকে উদীচ্য বৌদ্ধবিদ্যা বলা হয়। প্রাচ্যের থেরবাদী বৌদ্ধেরা পালি ভাষায় সংকলিত মূল বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক মান্য করে বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করে আসছেন। উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ভিক্ষুসংঘ সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত ও প্রবর্তিত বিধিবিধান অনুশীলন করে আসছেন। এর ফলে বৌদ্ধধর্মের মূল দর্শনে এবং আচরণে অনেক প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আগমন ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে এঁদের মাধ্যমে ইউরোপে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম পরিচিতি লাভ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের পূর্বে ইউরোপীয়দের নিকট সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম অজ্ঞাত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতদের যৌথ উদ্যোগে সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যার চর্চা শুরু হয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতীয় সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যা চর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। এখানে আমরা হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ এর গ্রন্থাবলী এবং ড. বারিদ বরণ ঘোষ সম্পাদিত "বিষয় বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের আজকের আলোচ্য "থেরবাদী দৃষ্টিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীয় বৌদ্ধবিদ্যা পর্য্যালোচনা" প্রবন্ধের বিষয় উপস্থাপন করবো।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত "বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন"[৯] এই প্রবন্ধটিকে প্রথমে আমাদের আল্যোচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচনা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত প্রীতির কারণে শাস্ত্রী মহোদয়কে উক্ত প্রশ্ন আলোড়িত করা স্বাভাবিক। এখন এই নিবন্ধ হতে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"বুদ্ধদেব কোন ভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বিবাদ-বিসংবাদ আছে, এবং এখন পর্যন্ত কত ভাষায় বৌদ্ধধর্মের বই লেখা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও আমাদের দেশের লোক খবর বড়ো কম রাখে। বর্মা, শ্যাম, আনাম, চাঁটগাঁ আরকান দেশে বৌদ্ধধর্ম সিংহল দ্বীপ হইতে আসিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের পুথি এখন প্রায়ই পালি ভাষায় লেখা। সিংহলি পণ্ডিতেরা বলেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষাতেই ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।" এখন উক্ত উক্তির প্রত্যুত্তরে শাস্ত্রী মহোদয় বলেছেন— "কথাটা অত সহজ নয়। তার কোন প্রমাণ নাই। পালি ভাষাটা কি? কোথা হইতে আসিল? কোন দেশে ইহার উৎপত্তি হইল? সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিংহলের লোকে বলে, "সা মাগধী মূল ভাষা নরা যা আদিকল্পিতা"। মাগধী বা পালি ভাষা আদি কল্পের মূল ভাষা, একথা বিশ্বাস করিতে পারি না, সিংহল দেশের লোক বিশ্বাস করিতে পারে—ভারতেবর্ষের লোক বিশেষত: ব্রাহ্মণেরা পারে না।" এখানে শাস্ত্রীমহোদয় অকপটে স্বীকার করেছেন: ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধ যে পালি ভাষায় বক্তৃতা করেছেন, এটা স্বীকার করতে পারে না। তারপর শাস্ত্রী মহোদয় অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন। তিনি একথা বলেছেন যে পাণিনি ব্যাকরণে "ভাষা" শব্দের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত ভাষা বলে কোন ভাষার উল্লেখ করেন নাই।" পাণিনি ব্যাকরণে কিন্তু আর একটা ভাষার বহু উল্লেখ আছে। তাহাকে বলে ছান্দস ভাষা।" কিন্তু তিনি এই ছান্দস ভাষাকে বেদের ভাষা বলতে দ্বিধাবোধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন,—"আমার বোধ হয়, ব্যাস এই ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।" সংস্কৃত ভাষা প্রবর্তনের পূর্বে বৈদিক ভাষায় একটা পৃথক অস্তিত্ব ছিল।

এখানে বৌদ্ধবিনয়ের চুল্লবর্গ নামক পুস্তক হতে একটা উদ্বৃতি দেয়া হচ্ছে। "সেই সময়ে যমেড় ও তেকুল নামক ব্রাহ্মণ জাতীয় মিষ্টভাষী এবং মধুরস্বর বিশিষ্ট দুই সহায় ভিক্ষু ছিলেন। তাঁরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে তাঁরা ভগবানকে বল্লেন—"প্রভু নানা নামের, নানা গোত্রের, নানা জাতির, নানা কুলের প্রব্রজিত ভিক্ষুগণ স্বকীয় ভাষায় বুদ্ধবচন দূষিত করছেন। অতএব প্রভু! বুদ্ধবচন আমরা ছন্দে আরোপিত করে ছান্দস ভাষায় পরিবর্তিত করব। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত অন্যায় বলে প্রকাশ করেছিলেন,—মোঘ পুরুষ, কেন তোমরা বল আমরা বুদ্ধবচন ছন্দে আরোপিত করে ছান্দস ভাষায় (বৈদিক ভাষা) পরিবর্তিত করবো। তোমাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে না; বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানেব আ অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এইভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করেছিলেন, "ভিক্ষুগণ" বুদ্ধ বচন ছন্দে পরিবর্তন করতে পারবে না, যে আরোপ করবে তার "দুষ্কট" আপত্তি হবে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, স্বীয় ভাষায় বুদ্ধবচন শিক্ষা করবে।" বুদ্ধের এই বিনয়বিধান থাকা সত্ত্বেও মহাসাংঘিক ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধবচন মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকে আরোপিত করেছিলেন। সম্রাট কনিষ্কের সময় সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষুসংঘ বৌদ্ধধর্মের ত্রিপিটকের সূত্রপিটককে "উপদেশ শাস্ত্র' নাম দিয়ে এক লক্ষ সংস্কৃত শ্লোক, বিনয়পিটককে "বিনয় ভাষা" নাম দিয়ে একলক্ষ শ্লোক এবং অভিধর্মপিটকের "অভিধর্ম বিভাগ শাস্ত্র" নাম দিয়ে একলক্ষ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছিলেন। ত্রিপিটকের সকল অর্থকথা সংকলন করে সংস্কৃত ভাষায় "বিভাষাশাস্ত্র" নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল[১০]। তৎকালীন বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষায় মূল সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলি

CENTRAL LIBRARY

যথাযথ প্রতিফলিত হয় নাই। তাই এই বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষায় মূল সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের ধাতুগত ও শব্দগত ব্যুৎপত্তিগত রচনা শৈলীর বিধিবিধান অনুশীলিত হয় নাই। তবে তৎকালীন প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার সহিত মিল পাওয়া যায়। তাই এই সংস্কৃত ভাষাকে 'মিশ্রসংস্কৃত' বা 'বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষা' অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধধর্ম প্রাচ্যদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। চৈনিক পরিব্রাজকগণ এবং তিব্বতী পণ্ডিতগণ এই মিশ্র সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম তাদের নিজ-নিজ ভাষায় অনূদিত করেছিলেন। ভারত হতে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হলে চৈনিক ও তিব্বতী ভাষায় প্রাচীন মিশ্র সংস্কৃত ভাষা হতে রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় এই উদ্ধার কার্যে বিশেষ অবদান রাখতে গিয়ে সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যার প্রতি একটু বেশি করে বলে ফেলেছেন।

এখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত "মানুষ ও রাজা" নামক প্রবন্ধ হতে বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে[১১]। এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহোদয় বিশ্বজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম, বিশ্বাস ও জাতির ধ্যান ধারণার অবতারণ করে বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব পর্যালোচনা করার প্রয়াসী হন। তিনি প্রথমে সংস্কৃতে রচিত মহাসাংঘিকদের "মহাবস্তু" অবদান গ্রন্থে বর্ণিত জগৎসৃষ্টিতত্ত্বের কথা উল্লেখ করেন। পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে মহাবস্তুর বর্ণনাটি প্রাচীন বলেই তাঁর বোধ হয়। তারপর তিনি পালি দীর্ঘনিকায়ের "অগ্‌গঞঞ" সূত্রকে বুদ্ধের গল্পছলে উপদেশ বলে আখ্যায়িত করেন। এখন আমি এই প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত দিচ্ছি—

যে কেহ মহাবস্তু অবদানের" রাজবংশের আদি অধ্যায়টি ও অগ্রণ্যসূত্রটি মন দিয়ে পাঠ করিবেন, তাহারই মনে হইবে, মহাবস্তু দেখিয়াই এই সূত্রটি তৈয়ারী হইয়াছে। রাজবংশের কথা বলিতে গেলে রাজা কেমন করিয়া হইলেন সেটা জানিবার ইচ্ছা আপনিই হয়। —আরো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চারিবর্ণের কথা, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ বড়ো কিনা, এ সকল কথার মীমাংসা কি এই গল্পের দ্বারা হইতে পারে, এযেন গনশের মাথায় গজ মুণ্ড দেওয়া। ভাষা দেখাইলেও বোধ হয় মহাবস্তু আগে ও সূত্রটি তাহার পরে।"

ত্রিপিটকের দীর্ঘনিকায়ে একাধিক সূত্রে জগৎ বিবতর্নের কথা উল্লেখ আছে। এই পদ্ধতিতে অগ্গঞঞ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। মহাবস্তু অবদানে বর্ণিত জগৎসৃষ্টি কথা বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথা নহে। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে সত্ত্বগণ যতদিন পর্যন্ত নির্বাণ প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তারা ভবাগ্রহতে অবীচী নরক পর্যন্ত একত্রিশ লোকভূমির যে কোন একটি লোকভূমিতে অবস্থান করে থাকে[১২]। এই একত্রিশ লোক ভূমিকে চার ভাগে ভাগ করা রয়েছে। যথা— (১) অপায় ভূমি, (২) কামসুগতি ভূমি, (৩) রূপাবচর ভূমি এবং (৪) অরূপাবচর ভূমি। আবার অপায় ভূমি চার ভাগে বিভক্ত। কামসুগতিতে ৭টা স্তর, রূপাবচর ভূমিতে ১৬টা স্তর এবং অরূপাবচর ভূমিতে ৪টা স্তর আছে। অগ্গঞঞ সূত্রে যে আভাস্বর সত্ত্বদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা রূপাবচর ভূমির ৬ষ্ঠ স্তরের সত্ত্বগণ। বৌদ্ধ সাহিত্যমতে এই স্তরের সত্ত্বগণ স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষ, মনোময়, প্রীতিভক্ষ এবং শুভাস্থায়ী হয়। কিন্তু শাস্ত্রী মহোদয় মহাবস্তু অবদান থেকে তাদের "কামচর" বলেও উল্লেখ করেছেন। এখানেই শাস্ত্রী মহোদয়ের সহিত থেরবাদীদের তফাৎ। রূপাবচর ভূমির সত্ত্বগণ ধ্যানী ও ব্রহ্মচারী। তাদের পক্ষে "কামচর" হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। বৌদ্ধসাহিত্যে জগৎ বিবতর্নের কালকে "কল্প" গণনার মাধ্যমে করা হয়। তাতে সৃষ্টি প্রলয়ের কাল অতি বিস্তৃত। তাই সংক্ষিপ্তভাবে মহাবস্তুতে জগৎসৃষ্টির কথা বৌদ্ধসাহিত্যের বিস্তারিত বর্ণনার সহিত তুলনা হতে পারে না।

"কোথা হইতে আসিল" প্রশ্ন উথাপন করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে

CENTRAL LIBRARY

বিভিন্ন প্রকার আলোচনার সূত্রপাত করেন।[১৩] এখানে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিতে তিনি এত শঙ্কিত যে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি হতে একটা স্বতন্ত্র সংস্কারমুক্ত অবিসংবাদিত মতবাদ হিসাবে স্বীকৃতিদানে প্রবল মানসিক পীড়ায় আহত হওয়ার কথা প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাই তিনি "কোথা হইতে আসিল" প্রবন্ধ অবতারণা করে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে তিনি বৌদ্ধধর্মকে অহিংসা পরম ধর্ম রূপে আখ্যায়িত করে বুদ্ধ পশুবধ বন্ধ করার মানসে তাঁর মত প্রচার করেছেন। এতে ভারতীয় হিন্দু সংস্কারে বেদের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপিত হয়েছে বলে তিনি এই প্রস্তার অগ্রহনীয় করার জন্য কতগুলি প্রশ্ন উথাপনা করেছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বুদ্ধের মতবাদের সহিত উপনিষদের অদ্বৈত মতের মিল প্রদর্শন করার জন্য রামানুজ, শংকর প্রভৃতি মহাপুরুষদের উদাহরণ তুলে ধরেন। তারপর তৃতীয় মত এইযে বৌদ্ধধর্ম সাংখ্য মতের পরিণাম। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব হতে ভারতে সাংখ্য মত প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ সাংখ্যমতের প্রচলিত বিষয়বস্তু তাঁর নিজের মত করে প্রচার করেছিলেন।

এমন কি চতুর্থ মতে শাস্ত্রী মহোদয় ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের প্রতি দ্বেষবশত বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচার করেছেন বলে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন নি। পঞ্চম প্রকার মতে বুদ্ধ অনার্য শাক্য বংশের সন্তান। তাই ব্রাহ্মণ্য বিরোধী ধর্ম প্রচার করতে বুদ্ধ সক্ষম হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন। তা'ছাড়া বুদ্ধের লুম্বিনী কাননে জন্ম, বোধিদ্রুম মূলে সম্বোধি লাভ এবং দুইটা শালবৃক্ষের মধ্যখানে পরিনির্বাণ লাভ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট নেহাৎ অলৌকিক কাহিনী বলে মনে হওয়াতে তিনি এই ঘটনাকে কল্পকাহিনী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধ গ্রীকজাতির একজন সার্থক অনুসরণকারী হিসাবে প্রমাণ করতে গিয়ে শাস্ত্রী মহোদয় গ্রীকজাতির ভারত আগমনের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেন। এমনকি বুদ্ধ "থাড়ু" নামক এক উপজাতির ধর্মকে সংস্কার করেছেন বলেও যুক্তি প্রদর্শন করেন। ইক্ষাকু বংশের উল্লেখ বেদে থাকাতে শাস্ত্রী মহোদয় বুদ্ধকে আর্য জাতির বংশধর স্বীকার করেন। যাগযজ্ঞ পশুবলি ভারতে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব হতে প্রচলিত ছিল। তাই বুদ্ধ হঠাৎ করে পশুবলির বিরোধিতা করেন নি বলে শাস্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন। উপনিষদের অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি যুক্তি যে বুদ্ধকে প্রভাবিত করতে পারে নি, তাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংখ্যমত যেহেতু বৈদিক আর্যমত নহে, বুদ্ধের ধর্ম আর্যমত হতে পারে না। তাছাড়া ভিক্ষুদের ত্রিচীবর পরিধানও আর্য বিরোধী। হিন্দু ব্রাহ্মণদের মত বৌদ্ধভিক্ষুদের মধ্যে পৈতার স্থান নাই এবং মাথার এক গুচ্ছ চুল বা টিকি রাখার মানসিকতাও নাই। তাই তিনি অনেক প্রশ্ন তুলে বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দুধর্মের সহিত কোন মিল দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শাস্ত্রী মহোদয় আরও কতগুলি যুক্তি উত্থাপন করেছেন। পূর্ব ভারতে আর্যদের প্রভাব অনার্যদের চাইতে কম ছিল বলে বুদ্ধ অনায়াসে পূর্বভারতে তাঁর ধর্ম প্রচার করতে কোন বাধার সম্মুখীন হন নি। তাছাড়া পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্ম ছাড়া আরও অনেক মতবাদ অতি সহজেই প্রচারিত হয়েছিল। যেমন মক্খলি গোসাল, মহাবীর নির্গ্রন্থ, পুরানো কাশ্যপ, অজিত কেশকম্বল, সঞ্জয় বেলট্টি পুত্র, পকুদ কাত্যায়ন প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকদের মত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রী মহোদয় বৌদ্ধধর্মের অন্যতম ভিত্তি "মধ্যম পন্থা"—এর উল্লেখ করে বৌদ্ধধর্মকে একটা স্বতন্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এখন আমরা শাস্ত্রী মহোদয়ের আরেকটা প্রশ্ন 'বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার গুরু কে'? সম্বন্ধে আলোচনা করবো (১৩) বুদ্ধের গুরু কে প্রশ্নের উত্তর আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা 'কোথা হইতে আসিল' প্রশ্নের আলোচনার মধ্যে পাওয়া যাবে। এখানে মহাবর্গ গ্রন্থ হতে বুদ্ধ উপক নামক আজীবকের প্রশ্নোত্তরের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি—

"জিন যারা জয়ী তারা, জিত অরি রিপুঞ্জয়,
মাদৃশ যে জিন তারা, সিদ্ধ করি আসবের ক্ষয়।
আছে যত পাপ কর্ম, সব আমি করিয়াছি জয়,
তাইত, উপক! তোমা দিই আমি জিন পরিচয়।"[১৪]

বৌদ্ধ কাহাকে বলে? প্রশ্ন উত্থাপন করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লক্ষ করেছিলেন যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার এতই বেশী হয়েছিল যে এশিয়ার প্রায় দেশেই বৌদ্ধ আছে। মধ্যপ্রাচ্যেও বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য কম নয়। তবে বৌদ্ধধর্মের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বৌদ্ধ ধর্ম অনুশীলন করে থাকেন। তাই তাঁর মনে প্রশ্ন: বৌদ্ধ কাহাকে বলে? আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে বৌদ্ধধর্ম বর্তমান বিশ্বে দুই ধারায় অনুশীলন হচ্ছে: (১) প্রাচ্য ও (২) উদীচ্য। প্রাচ্য বৌদ্ধেরা পালিতে ত্রিপিটকের বর্ণিত বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন করে থাকেন। উদীচ্য বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন করে থাকেন। এই দুই ধারার মধ্যে প্রাচ্যবৌদ্ধেরা ত্রিপিটকের বিনয় মতে বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের শরণাগত হয়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিসাবে পরিচিত। তারা একমাত্র বুদ্ধকে শরণ করে নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য সচেষ্ট। এদিকে উদীচ্য বৌদ্ধেরা বিভিন্ন মূর্তিতে বুদ্ধত্ব আরোপ করে বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করে থাকেন। থেরবাদী বৌদ্ধেরা প্রথমে বুদ্ধমূর্তি তৈরী করতে দেখা যায় না। মহাযানীদের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভিন্ন বুদ্ধ মূর্তি পূজা থেরবাদীদের নিকট অবৌদ্ধসুলভ বলে পরিগণিত। থেরবাদীদের নিকট বোধিসত্ত্বের বোধিচর্চা অর্থর পারমী পূরণ করে বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা। মহাযানীদের বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার। দালাই লামা একজন অবলোকিতেশ্বরের অবতার।

আমি এখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম হতে গৃহীত "নির্বাণ" সম্বন্ধে ধারণা, ত্রিশরণগমনে ধর্মের প্রাধান্য, জাতক ও অবদানের তথ্য ইত্যাদি বিষয়ে মূল থেরবাদী আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

"নির্বাণে"র বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যায় শাস্ত্রী মহোদয় বৌদ্ধ ধর্মমতকে নিহিল বা বিনাশবাদ হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য বিবিধ যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছিলেন। থেরবাদী বৌদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তি হল অনিত্য, দুঃখ অনাত্মা। এই অনাত্ম নিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের মতবিরোধ। হিন্দুধর্মে অনাত্মবাদের কথা নাই। তাই অনাত্মবাদের অর্থ বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ বলে চিহ্নিত করতে তিনি নির্বাণকে শূণ্যতা বলে ধরে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে শূণ্যতা নির্বাণ সাক্ষাতের একটি মার্গমাত্র। শূন্যতা, অনিমিত্ত, অপ্রনিহিত ইত্যাদি তিন মার্গের যে কোন একটি মার্গকে অবলম্বন করে নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য প্রচেষ্টা করতে হয়।[১৫] বিভিন্ন নদী দিয়ে জল যেমন মহাসমুদ্রের একই জলে পতিত হলে মহাসমুদ্রের জল একই হয়ে যায়, সেই বিভিন্ন মার্গের মাধ্যমে নির্বাণ সাক্ষাৎ করে একই নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে শূন্যতার দ্বারা নির্বাণকে ক্লেশশূন্য বুঝানো হয়েছে। তারপর শাস্ত্রী মহোদয় মহাযানী বোধিচিত্তে নির্বাণ সাক্ষাতের স্বরূপ উত্থাপন করে সংস্কৃত বৌদ্ধধর্মের কষ্টকল্পিত দশভূমির ধারণার কথা বলেছেন। থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে এরূপ কোন ভূমির উল্লেখ নেই।[১৬] হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ত্রিশরণগমন নিয়ে যে পার্থক্য আছে শাস্ত্রী মহোদয় ব্যাখ্যা করতে চেষ্ট করেছিলেন। তিনি প্রথম তার লিখিত "কাঞ্চনমালা" নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে বুদ্ধের আগে ধর্মকে ত্রিশরণগমনের স্থান দিয়েছেন[১৭]। তার ধারনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি মহাযানীদের কথা উত্থাপন। করে বলেছেন বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম মহাযানে বড়ো। তাই তিনি বুদ্ধকে ত্রিশরণগমনে দ্বিতীয় স্থানে স্থাপিত করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে বুদ্ধ ধর্মকে মহাযানীরা বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং একথা বলেছেন মহাযানে শাক্যমুনির অবস্থা

একটু শোচনীয়। তিনি একটি মানুষী বুদ্ধ[১৮]। থেরবাদীমতে বুদ্ধ "ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র" প্রবর্তন করে বৌদ্ধধর্মক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একমাত্র সম্যক্ বুদ্ধের দ্বারা এই সূত্র প্রবর্তন করা সম্ভব। অন্য কারও দ্বারা সম্ভব নয়। "হীনযান ও মহাযান" প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন যে হীনযানে 'বীর্য' শব্দটি নাই। মহাযানের পারমিতার নামই বীর্য। ত্রিপিটকের "বুদ্ধবংসো" নামক পুস্তকে বুদ্ধকারকধর্ম হিসাবে দশ পারমী, দশ উপপারমী এবং দশ পরমার্থ পারমীর বিশদ আলোচনা আছে।[১৯]

শাস্ত্রী মহোদয় "জাতক ও অবদান" নামক প্রবন্ধে কতগুলি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিকট ধর্মোপদেশ ছলে তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত দিয়ে তাদের ধর্মজ্ঞানে উদ্দীপিত করতেন। এই ধর্মোপদেশগুলি বৌদ্ধেরা জাতক বলে থাকে। জাতকের সংখ্যা পালি ভাষার গ্রন্থে ৫৫০টি বলে উল্লেখ থাকলেও পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ ৫৪৭টি জাতক অর্থকথার বঙ্গানুবাদ করেছেন। শাস্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন—'মহাযানী লোকেরা কিন্তু জাতকের উপর তত আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ এক জাতকমালা ছাড়িয়া দিলে, উহাদের আর জাতক নাই, এই "জাতক মালা" আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, এখন উহার নাম হয় "বোধিসত্ত্বাবদান মালা"। ....আর্যশূরের বহির নাম "জাতক মালা" আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, তখন উহার নাম হয় "বোধিসত্ত্বাবদান মালা"। ইহা দেখিলেই বোধ হইবে যে মহাযানীরা জাতক শব্দটা পছন্দ করিতেন না। উহারা জাতকের স্থানে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন। ....অবদান শব্দে সংস্কৃত ভাষায় মহৎ কার্য বুঝায়[২০]। মহাযানের অবদান শুধু বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কথা নয়, আরও অনেক মহাপুরুষের পূর্বজন্মের কথা আছে। যেমন—অশোক রাজা পূর্বজন্মের কোন বুদ্ধকে এক মুষ্টি ধূলা দিয়া তৃপ্ত করিয়াছেন, তাই আর এক জন্মে তিনি চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং অবদান শব্দ যতটা ব্যাপক, জাতক শব্দ ততটা নয়। মহাযানে অবদানের অনেক পুস্তক আছে। আর্যশূরের "অবদান শতকে' এইরূপ ১০০টা অবদান আছে। দিব্যাবদান মালার ৩৭টি অবদান, ভদ্রকল্পাবদানে ৩৫টি জাতক আছে। .... ক্ষেমেন্দ্রব্যাস দাশ রচিত বোধিসত্ত্বদান বইতে ১০৮টি অবদান এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথিতে ৫১-১০৮ অবদান আছে। কেম্ব্রিজের পুঁথিতে ৪১-১০৮ অবদান আছে। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহোদয় তিব্বত হইতে এক খানি পুথি আনাইয়াছিলেন তাহাতে ১-৪৯ টি অবদান আছে। জাতক অর্থ কথা[২১] গ্রন্থে প্রত্যেক জাতকের পাঁচটি অংশ আছে। যথা (১) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু-বুদ্ধ কখন কাকে উদ্দেশ্য করে ঘটনার অবতারণা করেছিলেন (২) অতীত বস্তুঃ পূর্ব জন্ম কাহিনী (৩) ব্যাকরণঃ জাতকের উপদেশ (৪) গাথাঃ জাতকের মূল বস্তু ও (৫) সমাধানঃ জাতকে বর্ণিত ব্যক্তি/প্রাণীদের পরিচয়। উপরিউক্ত আলোকে চিন্তা করলে জাতকের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহিত অবদানের তফাৎ সহজে প্রতীয়মান হয়[২২]।

শাস্ত্রী মহোদয়ের রচিত "মহাযান কোথা হইতে আসিল" "সহজযান" বৌদ্ধধর্মের অধঃ পাত' "বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল" প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস "বেনের মেয়ে" পড়লে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির কারণগুলি, বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার বিবর্তনগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্য হতে উদ্ধার করা যায়। সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের সহিত থেরবাদী বৌদ্ধদের এই পর্যায়ে বিশেষ সম্পর্ক না থাকাতে এইগুলির সঙ্গে থেরবাদী বৌদ্ধদের সহিত তুলনা করার অবকাশ নেই।[২৩] উপসংহারঃ থেরবাদী দৃষ্টিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধচিন্তাধারার পর্যালোচনা করতে গিয়ে এটাই প্রতীয়মান হয় যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃতে একজন অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অসীম ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রম করে সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য আপন মেধা ও প্রতিভাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি তিনি ইংরেজী

CENTRAL LIBRARY

ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বৈশিষ্ট্যগুলিও অবহিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন।

সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হতে গিয়ে তিনি পালিভাষায় লিখিত ত্রিপিটকে আলোচিত থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম সম্যকভাবে আলোচনা করেননি। তিনি সংস্কৃত বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তদুপরি তিনি বংশানুক্রমে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, উপরন্তু পালি ভাষায় লিখিত থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের সম্যক পরিচয় পাননি। তাই থেরবাদী দৃষ্টিতে সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যা চর্চায় তাঁর যে মত পরিস্ফুট হয়ে উঠে তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এই পার্থক্যগুলি এই আলোচনায় প্রদর্শন করেছি। অবশ্য তিনি যে একজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ—প্রথম খন্ড, সম্পাদনা-সত্যজিত চৌধুরী, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, কলিকাতা ১৯০১, ভূমিকা পৃ: ৩৪।

২। কুশীনগর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ পশ্চিম রাজ্য পুস্তক পর্যদ ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ১০৯।

৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ ৩য় খন্ড পশ্চিম রাজ্য পুস্তক পর্যদ, কলিকাতা-২০০০, ভূমিকা পৃষ্ঠা ২৭।

৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্য কর্ম-শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার, বাংলা একডেমী, ঢাকা ১৯৯২ পৃষ্ঠা ১৪৭।

৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ ৩য় খন্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ৩১পৃষ্ঠা।

৬। বিষয় বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সম্পাদিত, ড. বারিদবরণ ঘোষ, কলিকাতা-২০০২ পৃষ্ঠা ১৩২।

৭। হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা-সম্পাদনা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহাবোধি বুক এজেন্সী কর্তৃক সংস্করণ, কলিকাতা ২০০২, মুখবন্ধ পৃষ্ঠা ৪।

৮। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ ৩য় খন্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ পৃষ্ঠা ৩২।

৯। চুল্লবর্গ-অনুদিত, ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাথের, রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৭৫।

১০। বাংলাদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম বিকাশে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবিরের অবদান- ডা: সিতাংশু বিগাশ বড়ুয়া, শাসন সেবক সংঘ, চট্টগ্রাম ২০০১, পৃষ্ঠা ১৬।

১১। বিষয় বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ড. বারিদবরণ ঘোষ পৃষ্ঠা ১০৫।

১২। অভিধম্মার্থ সংগ্রহ—শ্রী বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী, মহামুনি পাহাড়তলী, রাউজান ১৯৪০, পৃষ্ঠা ১৪৬।

১৩। বিষয় বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ড: বারিদবরণ ঘোষ, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১০৫।

১৪। মহাবর্গ—প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, সেবা সদন পটিয়া, চট্টগ্রাম-১৯৩৭, পৃষ্ঠা ৮।

১৫। মহাবর্গ—প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৫।

১৬। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ শ্রী বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৯৯।

১৭। কাঞ্চন মালা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ—১ম খন্ড, প্রাগুপ্ত পৃষ্ঠা ১৫০, ১৬৫।

১৮। বিষয় বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ড: বারিদবরণ ঘোষ, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৪৭।

১৯। বুদ্ধ বংসো- শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন-১৯৩৪, পৃষ্ঠা ৪৮-৫২।

২০। বিষয় বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ড: বারিদবরণ ঘোষ, প্রাগুপ্ত, বিষয় বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ড: বারিদবরণ ঘোষ, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৮৯।

২১। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৬১।

২২। পালি সাহিত্যের ইতিহাস—ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮০।

২৩। নির্বাচিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সংস্কৃতিক চিন্তা-সম্পাদিত, সত্যজিত চৌধুরী ও বিজলী সরকার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমী, কলিকাতা-২০০২।

CENTRAL LIBRARY

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম

শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার সূত্রেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) বৌদ্ধ বিদ্যার সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর ইতিহাস সচেতন অনুসন্ধিৎসা যুক্ত হয়েছিল ভারতবর্ষের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে। ভারতবর্ষের মানুষের মনের গতি কোন দিকে প্রসারিত হতে চেয়েছে তা খুঁজে বের করা তাঁর অন্বিষ্ট কর্মের একটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের অগতানুগতিক আনুপূর্বিক একটি আলোচনা তিনি বাংলা সাময়িক পত্রের পাতায় বৃহত্তর পাঠক সমাজের জন্য প্রকাশ করেছিলেন। নামকরণের অভিনবত্বে তত্ত্ব ও বিষয় ব্যাখ্যার অসাধারণ নৈপুণ্য ও সাফল্যে এবং ভাষার সরসতায় তা হয়ে উঠেছিল হৃদয়গ্রাহী। ইংরেজী বাংলা মিলিয়ে প্রায় সব প্রবন্ধ এর আগে প্রাসঙ্গিক তথ্য সহ আলোচিত হয়েছে।* এছাড়া Northern Buddhism (Indian Historical Quarterly, 1925) নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা করে উপসংহারে বলেছেন যে মহাযানমতের রূপান্তরিত সর্বশেষ যে ধারা তাতে শাক্যমুণি বা বুদ্ধের নামচিহ্ন ও নেই—একদিন যার নামে ভারতবর্ষে ও প্রায় সমুদয় এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল তার বিবর্তিত রূপ তুলে ধরার জন্যই উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম (Northern Buddhism) প্রবন্ধটির গুরুত্ব সমধিক।

১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে দক্ষিণী বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্মের চর্চা শুরু হয়। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এই বিতর্কের ফলে দুটি ধারা সৃষ্টি হয়। দক্ষিণী বৌদ্ধদের অবলম্বিত পথকে স্থবিরবাদ বা থেরবাদ নামে অভিহিত করা হয়। উনিশ শতকে ভারতবর্ষের পন্ডিত এবং ইয়োরোপীয় পন্ডিতদের মধ্যে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের চর্চা ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে শিক্ষিত জনসমাজেও প্রচলিত ধারণা ছিল যে এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলোতেই বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে এবং এদের সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলো পালি ভাষায় লেখা। এই থেরবাদী ধারার নিয়ম শৃঙ্খলা খুবই কঠোর, এর নৈতিকতা খুবই উচ্চ স্তরের। তাঁরা এটা কল্পনাও করতে পারতেন না যে বৌদ্ধধর্মের আরও একটি বলিষ্ঠ ধারা রয়েছে যেখানে কৃচ্ছ্র সাধনের মাত্রা শিথিল, যেখানে মূর্তিপূজা হয় এবং সব ধরণের ভোজন কৃচ্ছ্রতা প্রায় পরিত্যক্ত। তাদের গ্রন্থ মিশ্র সংস্কৃতে লেখা। হরপ্রসাদের মতে, "Yet the votaries of Northern Buddhism are much larger in number, its philosophy is much deeper, the paraphernalia of worship are more imposing, and its history exceedingly interesteing."[১]

উনিশ শতকের দিকে উদীচ্য বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব উদঘাটিত হলেও তার চর্চা শুরু হয় তৃতীয় চতুর্থ দশক থেকে। এই চর্চা থেকে উত্তর ভারতের সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যের ইতিহাস নানা ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে।

১৮১৬ খ্রিঃ নেপালের সঙ্গে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চুক্তি সাধিত হলে নেপালীরা তাদের রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এর উপস্থিতি মেনে নেয়। এই বৃটিশ প্রশাসক ব্রায়ান হটন হজসনের উদ্যোগে মুন্সি অমৃতানন্দ নেপালে তৎকালে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'ধর্মকোষ সংগ্রহ' নামে এই গ্রন্থ হজসনের জিজ্ঞাসাকে আরো উদ্দীপিত করে তোলে। অমৃতানন্দের সহায়তায় হজসন নেপাল থেকে বহু পুথি সংগ্রহ করেন। পরে সেই সংগৃহীত পুথি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি ও আয়ারল্যাণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে প্রদান করা হয়। পরে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৮৮২

CENTRAL LIBRARY

সালে Nepalese Buddhism নামে এশিয়াটিক সোসাইটি (অব বেঙ্গল) থেকে একটি বর্ণনামূলক তালিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালে সি. সি. বেন্ডেল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুথির একটি বর্ণনামূলক তালিকা প্রকাশ করেন। বেন্ডেলের তালিকাভুক্ত পুথিগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম বাংলায় রচিত কিছু পুথি রয়েছে যা বাংলার মুসলমান অধিকারের পূর্বে রচিত।

আলেকজান্ডার চোমা ডি কোরোস (১৭৮৪-১৮৪২) এর তিব্বতি পুথির সংগ্রহ তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বিচিত্র তথ্যে সমৃদ্ধ যা পরবর্তীকালের পন্ডিতদের বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার সহায়ক হয়েছিল। তিব্বতি বৌদ্ধ পুথির সংগ্রহ প্রকাশের পরে উত্তর ভারতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া গেল যা প্রায় নির্বাণোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। অষ্টম শতাব্দী থেকে চীনাদের ভারতে আসায় ছেদ পড়ে-বৌদ্ধধর্মও উত্তর ভারতে তখন নামে মাত্রই প্রচলিত ছিল। অবশ্য চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন, য়ুয়ান চোয়াঙ ও ইৎ-সিং এর ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ভারতীয় জনসমাজে ধারণা, জন্মেছিল যে, অষ্টম শতকে শংকরচার্যের আবির্ভাবের ফলে ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তী চার পাঁচশ বছর পরেও ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে বৌদ্ধধর্ম বিকশিত হওয়ার অবিসংবাদিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'ললিতবিস্তর' ও 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা' নামে দুটি গ্রন্থ বিবলিওথেকা সিরিজ থেকে প্রকাশ করেন। ললিতবিস্তর বুদ্ধের জীবনী আর অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা মহাযান মতের সূত্র গ্রন্থ। সেনার্ট প্রকাশিত 'মহাবস্তু অবদান' উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ যা মিশ্র সংস্কৃতে লিখিত। এই ভাষাকে Sanskritised vernacular or vernacularised sanskrit বলা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশিত 'স্বয়ম্ভুপুরাণ' সত্যব্রত সামশ্রমী কর্তৃক প্রকাশিত জৈন শাস্ত্রীয় গ্রন্থভূক্ত 'করণ্ডব্যূহ' প্রভৃতি গ্রন্থ উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের বহু তত্ত্ব ও তথ্যে পূর্ণ। প্রফেসর কাউয়েল এবং নীল প্রকাশিত 'দিব্যাবদান' জাতকের মতই বুদ্ধের নানা জন্মের কাহিনীর সংকলনগ্রন্থ।

এইসব গ্রন্থের মধ্যে মহাবস্তু অবদান মহাসাংঘিকদের প্রাচীণতম 'বিণয়' এর ধারক। মহাসাংঘিকরা খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। মহাসাংঘিকরা লোকোত্তরবাদী, তারা বুদ্ধকে অপার্থিবরূপে দেখেছে। মহাবস্তু অবদান গ্রন্থ বুদ্ধের জীবনী। তাঁর স্বর্গ থেকে অবতরণ, মাতৃগর্ভে প্রবেশ, জন্মগ্রহণ, তাঁর চলাফেরা, খাওয়া, শোয়া, বসা সবই অপার্থিব। তিনি কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, কিন্তু এক অলৌকিক শক্তির সাহায্যে তিনি সব প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মহাবস্তু অবদানের সংগ্রাহক অথবা রচয়িতা বুদ্ধের অতিলৌকিক চরিত্রের মহিমা সর্বত্রই বজায় রেখেছেন। অন্যদিকে ভিন্ন মতাবলম্বীরা তাঁকে অপার গুণসম্পন্ন মানুষ বলেই ধারণা করত। এই মতানৈক্য প্রায় বৈপ্লবিক এবং সুদূর প্রসারী। পরবর্তীকালে বুদ্ধ তাঁর মানুষী রূপ হারিয়ে মুক্তির 'উপায়' হয়ে উঠলেন। কালক্রমে বহু কল্পিত বুদ্ধ অথবা ধ্যানী বুদ্ধের ধারণা জন্ম নিল। এই ধ্যানী বুদ্ধের ধারণা ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে দার্শনিকতায় যুক্ত হয়ে পড়ে। উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তারা বুদ্ধকে 'সর্বজ্ঞ' মনে করে। অতিলৌকিক শক্তির ধারক এই বুদ্ধের বহু নাম রয়েছে। আবার তারা বিশ্বাস করে এই বুদ্ধেরও পূর্বে শত শত বুদ্ধ ছিলেন। দক্ষিণী বৌদ্ধরা প্রথমে তিনজন, তারপর আটজন এবং সর্বশেষ চব্বিশ জন বুদ্ধের অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে। অর্হৎরা নিজেরা মুক্ত হতে পারে, কিন্তু অন্যকে মুক্ত করতে পারে না, মহাবস্তু মতে যে কেউ মুক্ত হলেই অন্যকেও মুক্ত করতে পারে, "তীর্ণো তরায়েয়াম, মুক্তো মোচয়েয়াম"। সময় এবং স্থান সম্বন্ধেও উদীচ্য মতাবলম্বীরা মানুষের সীমিত

ক্ষমতায় যতদূর পর্যন্ত অসীমকে ধরা যায় তার জন্য উদগ্রীব। দক্ষিণী মতে বিশ্বাসীরা শাক্যমুনির জীবন সম্বন্ধেই কেবল আগ্রহী, অন্যপক্ষ মনে করে শাক্যমুনি কপিলাবস্তুতে বুদ্ধত্ব অর্জন করবেন, এক পর্যায়ে তারা এমনও বলে যে কপিলাবস্তুতে শত শত শাক্যমুনি রয়েছেন। সুতরাং দুটি বিভাজিত ধারায় পরিণত হওয়ার জন্য কেবল ছোটখাট দশটি নিয়মের ব্যতিক্রম একমাত্র কারণ নয়। কিছু ভিক্ষু শিং এর মধ্যে লবণ সঞ্চয় করে রাখত, কেউ কেউ দুপুরের পরে পানীয়ের সঙ্গে দই মিশিয়ে পান করত। এরকম অতি সাধারণ কিছু নিয়ম ভঙ্গের জন্য এমন হয়েছিল তা বলা যায় না। কারণ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বুদ্ধ শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ নিয়মের প্রতি যেন বেশি গুরুত্ব দেওয়া না হয়।

বৈশালীর লিচ্ছবিরা এবং তাদের আত্মীয় বজ্জিরা খুবই উদ্যমী একটি জাতি। তারা অল্পদিন আগেই যাযাবর অভ্যাস পরিত্যাগ করলেও কিছুটা অনিয়ন্ত্রিত রয়ে যায়। তারা বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টি ভঙ্গিকে প্রসারিত করতে চেয়েছিল এবং তাতে সমর্থও হয়েছিল। 'মহাবস্তুর' ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এটি মিশ্র ভাষায় লিখিত, এতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা প্রায় একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে মনে হয় এটি একটি কৃত্রিম ভাষা। হরপ্রসাদ মনে করেন যে, এটি উত্তর ভারতের তৎকালীন মুখের ভাষা (Spoken Language) যা পাণিনি, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলির নিয়মকানুনের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণের শুদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়েছিল। খ্রিষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকে লিখিত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের সাক্ষ্যে জানা যায় সেই সময়ে ভারতে সাতটি ভাষা প্রচলিত ছিল এবং প্রত্যেকটিরই সংস্কৃত এবং প্রাকৃত অর্থাৎ শুদ্ধরূপ এবং সাধারণ রূপ চলিত ছিল। এই সাতটি ভাষাই ছিল ভৌগোলিক ভাষা। মহাবস্তু গ্রন্থটি কৌশল এবং বজ্জি অধ্যুসিত অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাকরণ অসিদ্ধ ভাষায় লিখিত হয়েছে। এর ভাষা কৃত্রিমও নয় কিংবা 'vernacularised Sanskrit' অথবা Sanskritised Vernacular ও নয়। প্রায় একই রকম ভাষায় 'ললিতবিস্তর' 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' ইত্যাদি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সাঁচী, ভারহুত, মথুরায় সংক্ষিপ্ত দানপত্রের ভাষাও অনুরূপ। এতে বোঝা যায়, নির্বাণোত্তর কালে যখন উদীচ্য বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে বিতর্ক বা ভিন্ন মতের উদ্ভব হয়েছিল তখন তাদের প্রচলিত ভাষার প্রকৃতি ছিল এরকম।

সুতরাং মহাবস্তু রচনা ও সংকলনের কাল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেই হওয়া সম্ভবপর। কারো কারো মতে এটি খ্রিটিয় তৃতীয় শতকে রচিত অথবা সংকলিত হয়েছিল। কেননা এতে যোগাচার শব্দটি রয়েছে। বৌদ্ধ যোগাচার মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তৃতীয় শতকে। হরপ্রসাদ মনে করেন, যোগাচার মতের অনুসারীরা নির্বাণোত্তর তৃতীয় শতকেই তাদের নিজস্ব মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ অধিকাংশ ভিক্ষুরাই বিরোধিতা করেছিল। মহাবস্তু গ্রন্থে যোগাচার শব্দটি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নামে ব্যবহৃত হয়নি। ছয় শত বছর পরে এদের গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এটা অর্থহীন। কেননা এটা সুবিদিত যে, একশত কিংবা দেড়শত বছরের মধ্যেই মহাসাংঘিকরা ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

সুতরাং মহাবস্তু দেশীয় ভাষায় লিখিত উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থ। যখন সংস্কৃত বৈয়াকরণরা কঠিন নিয়মশৃঙ্খলার সাহায্যে ভাষার পরিশুদ্ধ রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন। এঁদের মধ্যে পাণিনি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষে, ক্যাত্যায়ন খ্রি. পূ. চতুর্থ শতকে, ব্যাড়ি খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে এবং পতঞ্জলি খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতকে তাঁদের ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন।

অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের সমৃদ্ধিতে পৌঁছেছিল। কিন্তু অশোকের সমস্ত উদ্যোগই ছিল থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের জন্য। বিরুদ্ধবাদী ধারার জন্য নিরূপিত কঠোর নিয়মাবলী প্রমাণ করে যে উদীচ্য ধারাটির প্রতি বিশেষ আনুকূল্য দেখানো হয়নি। অশোকের রাজত্বকালের

সতেরো বছরে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতির সভাপতি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাতে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত বিতর্কের সূত্রগুলো বর্ণনা করা হয়েছিল। বিভজ্জবাদীদের যে দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা ছিল থেরবাদীদের দলছুট একটি ধারা। এতে বৌদ্ধদের বিশটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার (থেরবাদী-১২, মহাসাংঘিক-৬, স্থানীয়-২) কথা বর্ণিত হয়েছে। অশোকের মহাসঙ্গীতিতে উদীচ্য মতের বৌদ্ধদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তারা এতে অংশগ্রহণও করেনি, এর অস্তিত্বও স্বীকার করেনি। কিন্তু সঙ্গীতির সভাপতি তিস্য মোগ্গলীপুত্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের মতগুলো বিতর্কিত করে উপস্থাপন করেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'কথাবত্থু'। সুতরাং বৈশালীর বিরুদ্ধ মত এবং অশোকের মহাসঙ্গীতির মধ্যকালীন সময়েও আরও অনেক বিভাজন বৌদ্ধদের মধ্যে ঘটেছিল।

শুঙ্গ বংশীয় রাজা পুষ্যমিত্রের আমলে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নির্জিত হয়, বিহারগুলো ধ্বংস করা হয়। থেরবাদী বৌদ্ধরা দক্ষিণে এবং উদীচ্য ধারা উত্তর পশ্চিমে চলে যায়। ভারতবর্ষের প্রায় সবদিকেই তারা পালিয়ে যায়। মিলিন্দ পনহো গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ এবং নাগসেনের সংলাপ থেকে বোঝা যায়, ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যের বাইরে বিদেশী দখলদারদের অঞ্চলে বৌদ্ধরা তাদের মূল ভূখণ্ডের তুলনায় অনেক বেশি সম্মান ও সমাদর ভোগ করত।

সাতকর্ণিরা ব্রাহ্মণ এবং শক রাজা নহপণ এবং তার জামাতা উৎসবদত্ত ব্রাহ্মন্য ধর্মের প্রতি অনুগত ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বহু পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কিন্তু মগধ এবং মধ্য ভারতে তার পরিমাণ খুবই কম। খ্রিষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে উদীচ্য বৌদ্ধরা পাঞ্জাবে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। পার্থীয়, গ্রীক, ইয়েচি এবং কুষানদের মুদ্রা ও শিলালিপিতে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক প্রমান পাওয়া যায়। তারা সম্ভবত কুষান সম্রাট কনিষ্ককে তাদের ধর্মমতে ধর্মান্তরিত করে। এটি উদীচ্য বৌদ্ধদের জন্য এক বিরাট বিজয়। কণিষ্কের সাম্রাজ্য বিন্ধ্যপর্বত থেকে আলতাই পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়েই উদীচ্য বৌদ্ধরা মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করে। তারা ভারতীয় সভ্যতাকে তুর্কী এবং তোখারাদের মধ্যেও প্রচার করে যা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করে তারা চীনদেশের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে চীন সাম্রাজ্যে তাদের ধর্মমত প্রচারিত হয়।

'লঙ্কাবতার' 'গন্ডব্যূহ' 'শ্রীঘনসূত্র' ইত্যাদি গ্রন্থগুলো কনিষ্কের সময়কালের পূর্বেই রচিত হয়েছে। তার মধ্যে 'লঙ্কাবতার' তর্কবিদ্যা ও দর্শনের বিষয় নিয়ে রচিত। লঙ্কাবতার গ্রন্থটিকে নেপালীরা মহাযান সূত্র বলে বিবেচনা করে, অন্যদিকে সুজুকি একে প্রাক নাগার্জুন ও প্রাক মহাযানী বলে মনে করেন। গন্ডব্যূহ'র ক্ষেত্রেও তাই মনে করেন। যুয়ান চোয়াঙ এর মতে কাশ্মীরে কনিষ্ক একটি বৌদ্ধ সঙ্গীতির আয়োজন করেছিলেন যাতে উদীচ্য বৌদ্ধরা আমন্ত্রিত হয়েছিল। পাঁচ শত বৌদ্ধ ভিক্ষু সমবেত হয়ে উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ করে 'বিভাষা' নামে একটি ভাষ্য রচনা করেন। এই বিষয়ে চীনা অনুবাদ ছাড়া অন্যত্র কোন সন্ধান পাওয়া যায়না। যুয়ান চোয়াঙের ভাষ্য অনুযায়ী কনিষ্কের সভায় ভারতীয় পন্ডিতদের মধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু অশ্বঘোষ, অত্রি এবং অগ্নিবেশ রচিত ভেষজশাস্ত্রের সম্পাদক চরক এবং সাংখ্য কারিকার ভাষ্যকার মাথর ছিলেন উল্লেখযোগ্য। অশ্বঘোষ অযোধ্যার সাকেত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর মায়ের নাম ছিল সুবর্ণাক্ষী। সুজুকি অশ্বঘোষ রচিত 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদ সূত্র' অনুবাদ করেছেন। তাঁর মতে অশ্বঘোষ মহাযান মতে বিশ্বাসী। কিন্তু মহাযান মতের বিকাশ তখনও হয়নি। অশ্বঘোষের দুই যুগ পরে তার বিকাশ ঘটে। ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষায় লেখা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্য দুটিতে মহাযান মতের কোন ছায়া নেই। কিন্তু উদীচ্য বৌদ্ধমতের নিদর্শন আছে; যেমন

CENTRAL LIBRARY

বুদ্ধ তাঁর সৎ ভাই নন্দকে বলছেন, "তুমি তোমার কর্তব্য করেছ, এখন তুমি মুক্ত, যাও ধর্মোপদেশ প্রচার কর এবং অন্যদের মুক্ত কর।" এই নির্দেশ মহাবস্তু গ্রন্থে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীর মতই। ব্রাহ্মণ্য আইন ও বেদগুলো সম্বন্ধে অশ্বঘোষের প্রভূত জ্ঞান ছিল। তিনি স্পস্টভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন বুদ্ধের ধর্ম কপিলের সাংখ্য মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্য মতে একজন সাধক কেবল প্রাপ্ত হতে চান। কিন্তু বুদ্ধ দেখলেন যে কোন সত্তাই অসীম অথবা অবাধ নয়। সেই জন্য বুদ্ধ কপিলের মতকে পরিমার্জন করে আত্মার অস্তিত্বকে ধ্বংস করেন। দক্ষিণাঞ্চলে যেমন উদীচ্য বৌদ্ধ মতের অনুসারী দেখা যায়, তেমনি উত্তরাঞ্চলে দক্ষিণী বৌদ্ধদের দেখা মেলে। লঙ্কাবতার এবং গন্ডব্যূহ গ্রন্থে তার প্রমান রয়েছে। কিন্তু মহাযান মতের দুজন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা এসেছেন দক্ষিন দেশ থেকে। নাগার্জুন এবং তাঁর শিষ্য আর্যদেব। আর্যদেবের জন্ম স্থান কাঞ্চী। নাগার্জুন শূন্যবাদ প্রচার করেছিলেন। শূন্যবাদই মহাযান ধারার প্রধান সূত্র।

নাগার্জুন মহাযান মতের খ্রিষ্ট না হলেও কমপক্ষে তাঁকে সেন্ট পল মনে করা হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রজ্ঞাপারমিতা নামে বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের স্বল্পাক্ষরা থেকে একশত পঞ্চাশ, সাতশত, পনেরশত, আট হাজার, দশ হাজার, পঁচিশ হাজার, একলক্ষ, একলক্ষ, একলক্ষ পঁচিশ হাজার পর্যন্ত শ্লোক রয়েছে বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, মূল রচনাটি এক লক্ষ শ্লোকে রচিত। নাগার্জুনের কিছু পরে মৈত্রেয়নাথ 'অভিসময়ালঙ্কার কারিকা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা যোগাচার মত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই কারিকা অনুযায়ী 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' সূত্রের কিছু পরিবর্তন করা হয়। পরে তা আরো বিস্তারিত করে কারিকা অনুযায়ী আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে পঁচিশ হাজার শ্লোকে রচনা করা হয়। এইসব কারিকা গ্রন্থের শেষে বলা হয়েছে যে নাগার্জুন উত্তর ভূখন্ড থেকে 'প্রজ্ঞাপারমিতা উদ্ধার করেন। প্রজ্ঞাপারমিতার অর্থ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। সেটা কী? সর্বজ্ঞান। সর্বজ্ঞান কী? জগতপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব যে শূন্য সে সম্বন্ধে জ্ঞান। যে কোন প্রপঞ্চ পরীক্ষা করলেই দেখা যায় তার কোন ভিত্তি নেই। আত্মার কোন ভিত্তি নেই সবকিছুই শূন্যে গিয়ে সমাপ্ত হয়। শূন্য কী? এটা কি অস্তিত্ব? এটা কি অনস্তিত্ব? নাকি অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সমন্বয়? না এর কোনটাই নয়। তাহলে শূন্যতা কী? এটা অব্যাখ্যেয়, অনির্বচনীয়, যাকে ধারণা করা যায় না, অকল্পনীয়। এটাকে তূরীয় বলা যায় যা ইন্দ্রিয়কে, প্রবৃত্তিকে উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যায়।

নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব মহাযান মতের প্রবক্তা। চীনারা তাঁকে গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করে। তাঁর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে 'চিত্তবিশুদ্ধি-প্রকরণ' এবং 'চতুঃশতিকা'। চিত্তবিশুদ্ধি-প্রকরণ মহাযান মতের ধারক। 'চতুঃশতিকায় সাংখ্য এবং বৈশেষিক মতের বিরুদ্ধে আর্যদেব তাঁর নিজের মত প্রকাশ করেছেন। নাগার্জুন এবং আর্যদেব বৌদ্ধদর্শনের মাধ্যমিক শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা একই সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান মতের বোধিসত্ত্বযানেরও প্রতিষ্ঠা করেন। সব উদীচ্য বৌদ্ধ মহাযান মতের অনুসারী নন। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ দিনগুলিতে উদীচ্য বৌদ্ধদের সবগুলো শাখা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাদের মহাযানীদের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা হয়েছে। শরৎচন্দ্র দাশের Indian Pandits in the Land of Snow (1983) গ্রন্থ প্রসঙ্গে জানা যায় যে, খ্রিষ্টিয় এগার শতকে বিক্রমশিলায় মহাসাংঘিকদের একটি বড় মঠ ছিল। নাগার্জুন ও আর্যদেবের পর মৈত্রেয়নাথ বিজ্ঞানবাদ অথবা যোগাচারের উপর কিছু কারিকা রচনা করেন। বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকেই শূন্যবাদ নিয়ে পরিতৃপ্ত ছিল না। শূন্যবাদ কী? বুদ্ধিহীন, বোধহীন শূন্যই কি নির্বাণ? নির্বাণ প্রশ্নে তাদের মনে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। যে কোন প্রপঞ্চের ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বে বৌদ্ধরা আস্থাবান। মৈত্রেয়নাথের মতে, পরমার্থ শূন্য ছাড়া

CENTRAL LIBRARY

আর কিছু নেই। কিন্তু শূন্যের একটি চেতনা থাকতে হবে। তাঁর মতে তৃরীয় চেতনার ধারাটিই শূন্যের স্থান অধিকার করে। এটিই বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার মত। খ্রিষ্টিয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতকে অসঙ্গ এই মত প্রতিষ্ঠা করেন। এটা সুবিদিত যে, অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র পরিমার্জন ও বিস্তারিত করে 'পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' রচনা করা হয়েছিল মৈত্রেয়নাথেরই কাবিকার সহায়তায়। সুতরাং অসঙ্গের পূর্বে মৈত্রেয় নামে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। অসঙ্গের ভাই বসুবন্ধু হীনযান মতের সমর্থক ছিলেন, পরে অসঙ্গ তাঁকে মহাযান মতে-দীক্ষিত করেন। বসুবন্ধু 'অভিধর্মকোষ' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁরা গুপ্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। অসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর ছাত্র দিঙনাগ ভারতীয় প্রাচীন তর্কশাস্ত্রকে প্রত্যক্ষ ও অনুমান নির্ভর বিশুদ্ধ তর্কশাস্ত্রের স্তরে উন্নীত করেন। অসঙ্গ, বসুবন্ধু ও দিঙনাগের মধ্য দিয়েই বৌদ্ধদের মধ্যে মৌলিক চিন্তাদর্শের সমাপ্তি ঘটে। ফা-হিয়েন যুয়ান চোয়াঙ এবং ইৎসিং এই পণ্ডিতদের আমলেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

সপ্তম শতকে মুসলমানরা কাস্পিয়ান সাগর এবং আরাল হ্রদের চারদিকের সব প্রাচীণ রাজ্যগুলো, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়। পুরোহিতবর্গ এবং জনসাধারণ এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে হিমালয় অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ নারী ও পুরুষ দেবতার উপাসনা জনসাধারণকে শেখায় যা তান্ত্রিক সাধনার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য। এই অভিবাসী পুরোহিতদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ 'মহাসুখবাদ' এর ধারণা লাভ করে; বৌদ্ধরা এই ধারণা গ্রহণ করে নিজেদের বিশ্বাস ও ধর্মকে আকর্ষণীয় করে তোলে। যে-কোন প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের মন্ত্রগুলো আয়ত্ত করে তার সত্য অনুধাবন করার জন্য বহু বছরের সাধনার প্রয়োজন। এজন্য একটি সংক্ষিপ্ত উপায় তৈরি করা হল। স্বল্পশিক্ষিত মানুষকে শেখাবার জন্য 'প্রজ্ঞাপারমিতা-হৃদয়' নামে একটি মন্ত্র তৈরি করা হল যা সারা দিনে বহুবার জপ করলে এই গ্রন্থ পাঠ এবং উপলব্ধিতে ফলপ্রদ হবে। ষষ্ঠ শতকের ধরনে লেখা এরকম একটি মন্ত্র জাপানের হরিয়ুজি মঠে পাওয়া গেছে। এরকম একই ধরনের মন্ত্র আবিষ্কার প্রায় কয়েক শতাব্দী ধরেই চলল। শত শত 'ধারনী' এবং 'হৃদয়' মন্ত্র সৃষ্টি হতে লাগল।

অষ্টম শতকে উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মকে সংগঠিত করে বজ্রজান মার্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ছেলে পদ্মসম্ভব তিব্বতকে বজ্রযান মার্গে দীক্ষিত করেন। তাঁর জামাতা বিক্রমপুরের শান্তরক্ষিত মন্ত্রযান ও বজ্রযান বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কন্যা যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে এই ধর্ম ভারতে প্রচার করেন। তাঁকে সকল শ্রেনীর বৌদ্ধরা 'ভগবতী' বলে মান্য করত। তাঁর 'অদ্বয়সিদ্ধি' নামে গ্রন্থটি দার্শনিক মত ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এই সময়ের (অষ্টম শতকের) প্রথম দিকে কুমারিল ভট্ট এবং শতাব্দীর শেষে শংকরচার্য বাংলা, মগধ এবং উড়িষ্যা ছাড়া ভারতের প্রায় সব অংশে বৌদ্ধ প্রভাব নিবাকরনে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সময়েই তিব্বত ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। বুদ্ধের কঠোর তপশ্চর্যার আদর্শ মহাযানদের মধ্যে বহু আগেই হারিয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায়, বৌদ্ধদের একটি শাখা পঞ্চকামোপভোগ করার উপরে জোর দিল। প্রথমে পঞ্চইন্দ্রিয় ভোগ এবং সবশেষে নারী সঙ্গ উপভোগ। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার চরমে পৌঁছে সহজ যান মুক্তির উপায় খুঁজল ইন্দ্রিয় বাসনার নিবৃত্তির মধ্যেই। বজ্রযানী এবং সহজযানীরা বাংলা ভাষায় লিখত। এগারশতকের বিখ্যাত পণ্ডিত যিনি (অতীশ দীপঙ্কর ৯৮০-১০৫২) তিব্বতকে মহাযানী মতে ধর্মান্তরিত করেছিলেন তিনিও বাংলায় লিখতেন। তাঁর রচনা পাওয়া না গেলেও তার গুরু রত্নাকর শান্তির রচিত প্রাচীন বাংলা চর্যাপদ পাওয়া গেছে। বজ্রযান এবং সহজযান বারো শতকের শেষ পর্যন্ত টিকেছিল। এই সময়ে মুসলমান অভিযানের ফলে

সমগ্র দেশ তাদের অধিকারে আসে। মগধ, নালন্দা ওদন্তপুরী, বিক্রমশীল সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পূর্ববঙ্গে বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম বিকশিত হয়েছিল, জগদ্দল বিহার ছিল বৌদ্ধ বিদ্যা চর্চার প্রধান কেন্দ্র যেখান থেকে তিব্বতিরা সংস্কৃত থেকে তিব্বতি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ করত।

১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে বৌদ্ধরা বাংলাদেশে তাদের শেষ অবস্থান হারিয়ে নেপালে পালিয়ে গেল। নেপালীরা বলে থাকে, ভারতবর্ষ থেকে নেপালে দুটি অভিবাসন হয়েছে, একটি ৮০০ বছর পূর্বে, অন্যটি ৬৫০ বছর পূর্বে। এই সময়ে ছয়জন মানুষ এসেছিলেন যাদের নামের শেষে 'বজ্র' শব্দটি যুক্ত ছিল। এই ছয়জন অভিযাত্রী রচিত গান নেপালীরা কোন অর্থ না বুঝেই গাইত। এঁদের মধ্যে একজন 'বজ্রযোগী' মূর্তি নিয়ে এসে তা সাংখু শহর নামক স্থানে স্থাপন করেছিলেন। উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উদীচ্য ও দক্ষিণী বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়। পঁচিশ শত বছরের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ত্রিশরণ তত্ত্বের যে বিবিধ রূপান্তর ঘটেছে তাঁর সংক্ষিপ্ত রূপ এভাবে বর্ণনা করা যায়। দক্ষিণী বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ এই ত্রয়ী, ধর্মচক্র প্রবর্তনের সময় এই ক্রমানুসারে ঘোষণা করা হয়েছিল। ক্রমশ এটা ইংরেজি W বর্ণের রূপ লাভ করে এবং কয়েক শতাব্দী পরে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম মূর্তিরূপে পুরীতে পূজিত হতে শুরু করে।

কিন্তু উদীচ্য বৌদ্ধধর্মে এই ত্রিশরণ যথাক্রমে ধর্ম, বুদ্ধ, সংঘে রূপান্তরিত হল, বুদ্ধের উপদেশ তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হল। উদীচ্য বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ এবং তাঁর বাণী লোকোত্তর মহিমাই লাভ করেছিল। মহাযান মতে, বিমূর্ত ভাবনা যুক্ত হয়ে ত্রিশরণ রূপান্তরিত হল প্রজ্ঞা, উপায় এবং বোধিসত্ত্ব (করুণা) রূপে। বস্তুত এগুলো সত্য-এছাড়া কিছু মধ্যবর্তী স্তরও রয়েছে। শাক্যমুনি বৌদ্ধ ত্রিত্ববাদ থেকে দূরে সরে গেলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ, পঞ্চ তারা এবং পঞ্চ বোধিসত্ত্ব সবাই শর্তহীন, সার্বভৌম, সীমাহীন শূন্যের প্রতিনিধি। স্বয়ম্ভু ক্ষেত্রে বিরাট স্তূপটির চারদিকে এই মূর্তিগুলো রয়েছে; কিন্তু শাক্যমুনি কলমহাতে মানুষী মূর্তিরূপে প্রবেশ দ্বারে স্থাপিত। প্রজ্ঞা, উপায় এবং বোধিসত্ত্ব এই ত্রিত্ব তত্ত্ব থেকে ধর্মকায়, নির্মাণকায় এবং সম্ভোগকায় এর ধারণা বিকাশ লাভ করে। এই ধারণাগুলো ভারতেরই, কিন্তু সুজুকির মতে তা পরবর্তী কালের পূর্বাঞ্চলীয় বৌদ্ধধর্মের চীনা ও জাপানী ধারারই বিকশিত রূপ।

পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ, পঞ্চ বোধিসত্ত্বের একত্রিত রূপ যখন ব্রোঞ্জে ও পাথরে স্থানান্তরিত হল তখন তা হয়ে দাঁড়াল হেরুক ও বজ্রবারাহী; তাদের বোধিসত্ত্ব হচ্ছে লোকেশ্বর। কিন্তু বজ্রযান মার্গে হেরুক কখনই এককভাবে নয়, তার সহসঙ্গী বজ্র-বারাহীর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ধৃত। পরবর্তীকালের মহাযান মার্গের প্রজ্ঞা ও উপায় যুক্তভাবে মুক্তআত্মার প্রতীকরূপে শূন্যের প্রতিরূপ বজ্রবারাহী অথবা নিরাত্মা (নৈরাত্মা) দেবীর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় মূর্ত হয়েছে। শাক্যমুনির নামে যে ধর্ম প্রচলিত পরবর্তীকালে তার কোন রূপের মধ্যেই তার স্থান নেই।

কিন্তু এই ত্রি-রূপের সবচেয়ে সুন্দর এবং শেষ ব্যাপারটি হচ্ছে সদাক্ষরী মহাবিদ্যা। এতে সাধারণ শ্বেত মার্বেলে মনিধর, পদ্মপাণি, এবং সদাক্ষরী মূর্তি রচিত হয়েছে। মূর্তিগুলোর মধ্যে শেষেরটি স্ত্রী দেবতা। এই ত্রি-রূপ মূর্ত হয়েছে মরমী সংকেতমন্ত্র 'ওম মনিপদ্মে হুঁ' সহযোগে।

Northern Buddhism (I.H.Q., 1925) প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উদীচ্য বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব, বিকাশ এবং পরবর্তীকালের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বর্ণনা দিয়েছেন। বলা যায় সেকালে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাদানের আলোকে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম, উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম, শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, মহাযানমত, বজ্রযান ও সহজযান ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের কালানুক্রমিক রূপান্তরগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ আদ্যোপান্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে হরপ্রসাদ তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ

ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বৌদ্ধধর্মের হাজার হাজার বছরব্যাপী এই রূপান্তরের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধেও কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বৈশালীতে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে যে মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে বৌদ্ধ সংঘ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বৈশালীর লিচ্ছবি এবং বজ্জি বংশ স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি ছিল, হরপ্রসাদের ভাষ্য অনুযায়ী তারা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করেছিল। যাযাবর জাতি সাধারণত স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে থাকে। অজাতশত্রু তাদের উচ্ছেদ করবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধের পরামর্শ যাঞ্চা করলে বুদ্ধ তাদের স্বাধীনতা যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেই মনোগত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেছিলেন।[২] সম্ভবত তারাই মহাসভায় অপেক্ষাকৃত নিয়মশৈথিল্য সাধনে উৎসুক ছিলেন। হরপ্রসাদের মতে, তারা বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই দ্বিতীয় মহাসভায় যে ভিন্ন মতের উদ্ভব ঘটেছিল তার পরিপোষণ ঘটতে থাকে প্রায় কয়েকশ বছর ধরে। অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে থেরবাদীদের প্রাধান্য ঘটে, অশোক তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করে ভারতে ও ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য প্রভূত উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

হরপ্রসাদ 'মহাবস্তুঅবদান' গ্রন্থসহ ললিতবিস্তর ও 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' এর ভাষাকে দেশীয় ভাষা বলেছেন। একে একসময় সাধারণভাবে গাথা ভাষা বলা হত। এতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এর যথেষ্ট গুরুত্ব হয়েছে। এই ভাষায় সংস্কৃতে অবহেলিত হয়ে যাওয়া আদি-ভারতীয় আর্যভাষার বাকরীতির ছোটখাট বৈশিষ্ট্য এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষার বাগধারার অনেক 'নবাঙ্কুর' রয়েছে।[৩] সংস্কৃত ও প্রাকৃত গাথা ভাষার বিচার প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর অভিমত এই যে, "The Buddhism for a time (2nd cen, B.C. 3rd cen, A.C.) almost side by side with their literary work in Pali, sought to approximate the Prakrits they were familiar with the Sanskrit as used by the Brahmans; and this resulted in the curious dialect, called gatha or Mixed Sanskrit, or Buddhist Sanskrit, from its very nature a most artifical mix-up often with false Sanskritisation of Prakrit forms, and this is the language which is found in works like the 'Lalita-vistara', the "Mahavastu and the 'Divyavadana'. The same thing was done in the Chanceries of kings and in the public recording of events, as is evidenced from inscriptions of the period'.[8] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জগদ্বিখ্যাত গবেষণার বেশ কিছুকাল আগেই মহাবস্তুর ভাষাকে মিশ্র 'দেশীয় ভাষা' আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি একে কৃত্রিম ভাষা মনে করেননি। কোশল ও বজ্জি অধ্যুসিত অঞ্চলের উদীচ্য মতানুসারী ব্যক্তিবর্গ তাদের অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাকরণ-অসিদ্ধ ভাষায় মহাবস্তু রচনা করেছে বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা জানি, ১৭৪-১৫৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে মধ্য এশীয় যাযাবর শ্রেণীর সীথীয় (Scythian) গোষ্ঠীর একটি শাখার অন্তর্ভূক্ত শকরা ভারতবর্ষে আসে। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত (১৫০ খ্রি. পূ.) পতঞ্জলির মহাভাষ্যে শকদের উল্লেখ আছে। শকরা পর পর তিনটি পর্যায়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। খ্রি. পূ. প্রথম শতাব্দী অথবা খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শুরুতেও শকদের কয়েকটি দল ভারতে প্রবেশ করে। কনিষ্ককে কেউ কেউ শক-জাতির মানুষ বলতে আপত্তি করলেও তিনি সাধারণত শক-রাজা বলে অভিহিত। ভারতীয়রা শক এবং কুষানদের মধ্যে বিশেষ তারতম্য করত না। য়ুয়ান চোয়াঙের মতে কনিষ্ক কাশ্মীরে (মতান্তরে জালন্ধরে) বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির আয়োজন করেছিলেন। এটি চতুর্থ এবং সর্বশেষ মহাসঙ্গীতি। এতে মহাসাংঘিকরা বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহাসাংঘিকরা উদীচ্য মতের ধারক। অনুমান করা যায়, উদীচ্য

CENTRAL LIBRARY

ধারার চিন্তায় যে প্রসারতা ছিল তার সঙ্গে বহিরাগত জনগোষ্ঠীর মানুষগুলোর সংস্কৃতি, দর্শন ও ধর্মবোধের একটা সমন্বয় ঘটেছিল। এই সমন্বয় ও সংমিশ্রণের ফলে উদীচ্য ধারাটি থেকে মহাযান মতের বিকাশ সাধিত হয়েছিল। কারণ এই খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই মধ্য এশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতের নানাবিধ সংযোগ ঘটে। ৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দুজন ভারতীয় বৌদ্ধপন্ডিত বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে চীনদেশের হান বংশীয় সম্রাটের রাজধানীতে পৌঁছেন। এঁদের নাম কাশ্যপ মাতঙ্গ, ও ধর্মরক্ষ।[৫] তান্ত্রিক বামাচার, যা পরবর্তী কালের রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষ মার্গ রূপে দেখা দিয়েছিল তাতে চৈনিক সংস্কৃতির ছাপ আছে। চীনা ঋষি লাউ-ৎসের আলোচিত তাও-বাদ বা ঋতবাদ অথবা নির্গুণ-সগুণ-ব্রহ্মবাদ, পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে অন্যরূপে গ্রহণ করে, এবং তান্ত্রিক বামাচার ও অন্য গুহ্য সাধানার মধ্যে এই অর্বাচীন তাও বাদের প্রভাবও নাকি সুস্পষ্ট।[৬] নাগার্জুন প্রজ্ঞাপারমিতা নামে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন মহাযান মতের প্রধানমতম সূত্র গ্রন্থ বলে তা বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের স্বল্পাক্ষরা থেকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শ্লোক কল্পনা করা হলেও অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থটিই পণ্ডিতমহলে আদৃত হয়েছে। এতে বত্রিশটি অধ্যায় রয়েছে।[৭] দ্বিতীয় ও তেইশতম অধ্যায় এর শিরোনাম শক্র (শক + র কর্তৃ বা কর্ম)। শক্র হচ্ছেন ইন্দ্র, যিনি দেবতাদের রাজা ও প্রধান। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দর্শন মূলক বিষয়ের ব্যাখ্যার দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হয়েও এই শব্দটি ব্যবহারের গুরুত্বটা কিছু পরিমানে ব্যাখ্যা করা যায়। মনিয়র উইলিয়মস্ তাঁর অভিধানে উল্লেখ করেছেন 'শক' শব্দ পৌন্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড, কম্বোজ, যবন, পারদ, পহলব, চীনা কিরাত, দরদ ও খস জাতির সঙ্গেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, according to vp iv 3 king sagar attempted to rid his kingdom of these tribes, but did not succeed in destroying them all they are some times regarded as the followers of saka or Sal-vahana and are probably to be indentified with the Tartar or Indo Scythians who overran India before the Aryans.[৮] আমরা জানি খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ শকদের অধিকারভুক্ত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় নাটকে 'শকার' চরিত্র শকদের চরিত্রের প্রতিরূপ। তেমনই শক্র (শক + র) শব্দ গঠনে জাতিবাচক 'শক' শব্দ কৌতূহলোদ্দীপক। শক্র শব্দ দেবরাজ ইন্দ্র অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাহলে ইন্দ্র বা শক্র কি ভারতবর্ষে আর্যআগমনের পূর্বে ইন্দো সীথীয় কোন প্রবলপরাক্রম গোত্র প্রধান বা অধিপতির সমার্থক কিংবা খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান কোন প্রবলপ্রতাপ নরপতির মহিমা দ্যোতক? তারই গৌরব ইন্দ্রের উপরে আরোপিত হয়েছে?

তন্ত্রাচারের মূল ধারাটি বহির্ভারত থেকে এসেছে বলে হরপ্রসাদ তাঁর অন্যান্য রচনায়ও বলেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাহমোহন রায় তন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; নিজে তন্ত্রসাধনা করতেন বলেও জানা যায়। তার মুখে উচ্চারিত শ্লোকটি হল এরকম,

গৌড়েনোৎপাদিতা বিদ্যা মৈথিলীপ্রবলীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ংগতা।[৯]

অর্থাৎ তন্ত্র ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই বিকশিত হয়েছিল। একথা বলা যায়, তন্ত্রাচারের বীজ ভারতবর্ষের আদিম, মাতৃপ্রধান সমাজের অভ্যন্তরে সুপ্ত ছিল; বহির্ভারতীয় উপাদানযুক্ত হয়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মকে আশ্রয় করে তা আরও বিকশিত ও পল্লবিত হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিশরণ তত্ত্বের বিবিধ রূপান্তর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কয়েক শতাব্দী পরে উড়িষ্যার বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ যথাক্রমে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামরূপে পূজিত হতে শুরু করে।

CENTRAL LIBRARY

'জগন্নাথের ত্রিমূর্তি, রথযাত্রা, বিষ্ণুপঞ্জর প্রবাদ, বর্ণবিচার পরিহার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বৌদ্ধভাব পরিলক্ষিত হয়। ....বৌদ্ধেরা সচরাচর ধর্মকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করেন, প্রস্তরেও ধর্মের স্ত্রীমূর্তি খোদিত দৃষ্ট হয়। নেপালে ধর্ম 'পারমিতাপ্রজ্ঞা রূপিনি দেবী। খুব সম্ভব ইনিই জগন্নাথের সুভদ্রা... তবেই হইতেছে জগন্নাথের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা বৌদ্ধদের বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম'।[১০] অক্ষয়কুমার দত্ত তার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১২৮৯) গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "জগন্নাথ ক্ষেত্রটি পূর্বে একটি বৌদ্ধক্ষেত্রই ছিল এই অনুমানটি জগন্নাথ বিগ্রহ-স্থিত উল্লিখিত বিষ্ণুপঞ্জর। ...চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিইএনথ-সঙ্গ উৎকলের পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতটে (অর্থাৎ উড়িষ্যার যে অংশে পুরী সেই অংশে) চরিত্রপুর নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। ...উহার নিকটে পাঁচটি অত্যুন্নত স্তূপ ছিল। শ্রীমান এ, কনিংহেম অনুমান করেন, তাহারই একটি অধুনাতন জগন্নাথের মন্দির। স্তূপের মধ্যে বুদ্ধাদির অস্থি কেশাদি সমাহিত। এই নিমিত্তেই, জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণুপঞ্জরের অবস্থিতি বিষয়ক উল্লিখিত প্রবাদ প্রচালিত হইয়াছে।'[১১]

উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের সর্বশেষ রূপান্তরিত ধারার প্রতিনিধি রূপে হরপ্রসাদ সদাক্ষরী মহাবিদ্যা মূর্তির কথা বলেছেন। এই মূর্তির পায়ের তলায় ওম মনিপদ্মে হুঁ (হৃদপদ্মে ধর্মের মনি) মন্ত্র ক্ষোদিত আছে। তিব্বতীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হবার পরে তাদের ধর্মসাধনায় কিছু কিছু নতুন উপাদান যুক্ত হয়ে তা একটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। 'ওম্ মনিপদ্মে হুঁ' মূলত জপমালামন্ত্র, এর নিগুঢ় অর্থ বোঝা দুষ্কর।

উদীচ্য বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব আবিষ্কার, তার উদ্ভব ও বিকাশের কাল, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ধারার তত্ত্ব, বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরিত বিভিন্ন ধারা সংক্ষেপে বর্ণনা করে হরপ্রসাদ ভারতবর্ষের বিশাল একটি জনগোষ্ঠীর আচরিত জীবনের একটি পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে প্রায় পঁচিশ'শ বছর ব্যাপী একটি জঙ্গম, পরিবর্তমান মানবগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ইতিহাস আমরা পাই। এই রূপান্তরের পেছনে অবশ্যই কিছু রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। হরপ্রসাদের রচনায় তার কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। আধুনিক অনুসন্ধিৎসু ইতিহাস গবেষকের অন্বেষায় সেই অনালোকিত জগৎটি ক্রম-উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র :

* শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যধর্ম (ঢাকা, ১৯৯২)।

১। H.P. Shastri, Northern Buddhism (Indian Historical Quarterly, 1925) p. 18.

২। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৌদ্ধধর্ম (দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৩৯৯), পৃ. ১২০।

৩। সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পাদিত) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (৩) (নৈহাটি, ১৯৮৪) পৃ. ২৫৪।

৪। Suniti Kumar Chatterji, The Origin and Development of the Bengali Language (1926) [Allen and Unwin, 1970]. p. 53.

৫। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (ভূমিকা), প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দেশবিদেশের সংস্কৃতি (কলকাতা, ১৯৮৫) পৃ. ৬।

৬। ঐ, পৃ. ১৩।

৭। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা (কলকাতা, ১৯৭০)।
অধ্যায়-১/ সকল প্রণালীর জ্ঞানের চর্চা।
অধ্যায়-২/ শক্র (Sakra) (দেবতাদের প্রধান)
অধ্যায়-৩/ অপরিমেয় গুণের আধার পারমিতার জন্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

অধ্যায়-৪/ গুণসমূহের পরিঘোষণা

অধ্যায়-৫/ গুণ অথবা জ্ঞান পারমিতার বিপ্লব

অধ্যায়-৬/ ত্যাগ এবং আনন্দ

অধ্যায়-৭/ নরক (প্রজ্ঞাপারমিতা স্তোত্র)

অধ্যায়-৮/ পবিত্রতা (প্রজ্ঞাপারমিতার পবিত্রতা ও গভীরতা)

অধ্যায়-৯/ প্রশস্তি

অধ্যায়-১০/ মানসিক গুণসমূহের পরিঘোষণা

অধ্যায়-১১/ মারের বিবিধ কার্যকলাপ

অধ্যায়-১২/ জগৎ প্রদর্শন (বুদ্ধদের জননী প্রজ্ঞাপারমিতা)

অধ্যায়-১৩/ অচিন্তনীয় (প্রজ্ঞাপারমিতার অচিন্তানীয়, অতুলনীয়, অপরিমেয়, অগণিত গুণ)

অধ্যায়-১৪/ পরিসামা (অতীত ও ভবিষ্যত পূনর্জন্ম)

অধ্যায়-১৫/ দেবতারা

অধ্যায়-১৬/ গুনাগুণ

অধ্যায়-১৭/ অপরিবর্তনীয়তার গুণ, প্রতীক ও চিহ্ন।

অধ্যায়-১৮/ শূন্যতা

অধ্যায়-১৯/ গঙ্গাদেবী

অধ্যায়-২০/ দক্ষতার উপায় আলোচনা (শূন্যতা এবং বাস্তবতার সীমা)

অধ্যায়-২১/ মারের কার্যকলাপ (সত্যবাদিতার মহিমা ও জাদুকরী ক্ষমতা)

অধ্যায়-২২/ সুবন্ধু

অধ্যায়-২৩/ শক্র (বোধিসত্ত্বদের শ্রেষ্ঠ অবস্থান)

অধ্যায়-২৪/ আত্মগর্ব (মূর্খতা) (মার কতৃক প্রচারিত হওয়ার পক্ষে বোধিসত্ত্বদের অবজ্ঞা)

অধ্যায়-২৫/ প্রশিক্ষণ

অধ্যায়-২৬/ মায়া (মায়াবৎ) (শক্র কতৃক বোধিসত্ত্বদের প্রশংসা)

অধ্যায়-২৭/ মর্মস্থল (নানাবিধ বিপত্তিতে বোধিসত্ত্বদের সাহসিকতা)

অধ্যায়-২৮/ অভিকীর্ণ কুসুম (অভিকীর্ণকুসুমের ভবিষ্যতবাণী)

অধ্যায়-২৯/ প্রবেশদ্বারসমূহ

অধ্যায়-৩০ সদাপ্ররুদিত (প্রজ্ঞাপারমিতা সন্ধানের জন্য সদাপ্ররুদিতের প্রস্তুতি)

অধ্যায়-৩১/ ধর্মোদগত (তথাগতদের আসা-যাওয়া)

অধ্যায়-৩২/ সমর্পণ (সদাপ্ররুদিত কাহিনীর সমাপ্তি)

৮। Sir Monier Monier Williams, Sanskrit English Dictionary (Oxford, 1974) p. 1045.

৯। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী (২য় খন্ড), কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ২৮১-২৮২।

১০। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ২১৬-২১৭।

১১। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম করুণা সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৬) পৃ. ৩১০।

CENTRAL LIBRARY

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : আধুনিক মনন

সুমিতা চক্রবর্তী

একজন লেখক আধুনিক মনের মানুষ কীনা—এ প্রশ্নের উত্তরে আধুনিকতা কাকে বলে সে বিষয়ে বিশ্লেষণ থাকা সংগত। কিন্তু যেহেতু আজকের পাঠকের কাছে সেই সব লক্ষণ নির্দেশ আর ততটা আবশ্যিক নয়, প্রায় সকলেরই জানা আছে আধুনিকতার মূল সূত্র—তাই এই বিশ্লেষণের অংশটি বর্জন করা গেল। অতি সংক্ষেপে, দুটি তিনটি বাক্যে কেবল বলা যেতে পারে যে, পরম্পরা বাহিত শাস্ত্রীয় বিধান, আপ্ত বাক্য এবং লোকাচারকে মেনে চলবার বাধ্যতার পরিবর্তে সেগুলিকে প্রশ্ন করবার মনই হল আধুনিকতা। পারিপার্শ্বিকের বাস্তবতাকে স্বীকার করা; মানব-স্বভাব ও মানব-সমাজের ত্রুটি এবং অসুন্দর দিকগুলিকে স্বীকার করা; তার প্রতিরোধে যুক্তি, তথ্য, বিচার সহযোগে সংগঠিত হওয়া—এই হল আধুনিকতা। জীবন-যাপনে অলৌকিকতা আর আধ্যাত্মিকতাকে স্বীকার না করে যুক্তিসিদ্ধ মানবিক শুভবোধকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই আধুনিকতা। এজন্যই রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি যথার্থ—আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। এজন্যই ভারতচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন চিরকালের আধুনিক মনের ধারক ও উদ্‌গাতা। এই মিছিলেরই এক যাত্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্রথমে তাঁর জীবন থেকে আধুনিকতার বোধ আহরণের সূত্রগুলি দেখে নিতে পারি। কৌলিক উপাধি ভট্টাচার্য। বাংলার প্রাচীন পণ্ডিত বংশ, বিদ্যাজীবী ব্রাহ্মণ। কিন্তু পরিবারটির ঐতিহ্যের মধ্যেই কিছুটা মুক্ত বাস্তব-বুদ্ধির আভাস ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন কৌলীন্য-প্রথা বাঙালি সমাজকে আবদ্ধ ও সংকীর্ণ করে রেখেছে তখনই এই বংশের এক আদি-পুরুষ কুল ভঙ্গ করে বিবাহ করেছিলেন। অন্ধভাবে তাঁরা আচার পালন করতেন না—তার আরও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তাঁদের পরিবারে ছিল। হরপ্রসাদের প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণও বিবাহে কৌলীন্য প্রথা মানেননি।

মাণিক্য তর্কভূষণ পলাশির যুদ্ধের পর খুলনা জেলার ভদ্রাসন ছেড়ে নৈহাটিতে বসবাস শুরু করেন। স্বগ্রামে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা এবং বিষয়-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু অসাধারণ দূরদৃষ্টি-বলে তিনি বুঝেছিলেন যে ভবিষ্যতে কলকাতার কাছাকাছি গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতেই বিদ্যাচর্চার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। তাঁর এই ভবিষ্যৎ-ভাবনা সুফল-প্রসারী হয়েছিল। নৈহাটিতে টোল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে যাতায়াত করতেন কলকাতায়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যর উইলিয়াম জোন্‌স-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। হিন্দু-আইনের ব্যাখ্যায় বিচারপতি জোন্‌স তাঁর সাহায্য নিতেন।

মাণিক্য তর্কভূষণের পৌত্র রামকমল ন্যায়রত্নের ছয় পুত্রের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন শরৎনাথ। জন্ম ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর। একবার কঠিন অসুখে শিবের প্রসাদে সেরে উঠেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় হরপ্রসাদ। হরপ্রসাদের বড়ো দাদা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চুতর্করত্ন কিছু দিন সংস্কৃত কলেজে কাজ করবার পরে বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতে কান্দি স্কুলে হেডপণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনিও আধুনিক মনের বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন বলে বিদ্যাসাগরের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভালোভাবে ইংরেজি শেখেন এবং তাঁর সূত্রেই ভট্টাচার্য পরিবারে ইংরেজি চর্চা শুরু হয়।

হরপ্রসাদের যখন আট-নয় বছর বয়স তখনই পরপর তাঁর পিতা রামকমল এবং উপার্জনকারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমারের মৃত্যু হয়। আর্থিকভাবে বিপন্ন পরিবারটিকে কান্দি ছেড়ে

CENTRAL LIBRARY

আবার নৈহাটিতে ফিরে আসতে হয়। বিদ্যাসাগর তখন হরপ্রসাদকে স্বগৃহে রেখে সংস্কৃত কলেজে ভরতি করে দেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা হরপ্রসাদের মনের আধুনিকতাকে পরিপুষ্ট করে।

হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন। তাঁর অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হলেও যুক্তিহীন রক্ষণশীলতার সমর্থক ছিলেন না। তিনি ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত ছাত্রজীবনে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রগতিশীল কেন্দ্র কলকাতায় নিজের মনকে গড়ে নেবার অবকাশ পেয়েছিলেন। তাঁদের পরিবারেও ছিল মুক্ত পরিবেশ। তাঁর দুজন দাদা এবং ছোটো ভাই মেঘনাথ সংস্কৃতের বদলে ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং উপার্জনের চেষ্টায় বাংলার বাইরে চলে যান।

মেধাবী ছাত্র হরপ্রসাদ ইংরেজি, সংস্কৃত এবং বাংলা—তিনটি ভাষাই ভালোভাবে পড়েছিলেন। ছাত্রবয়সেই পরিচিত হন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। সদ্য বি.এ. পাস হরপ্রসাদের প্রবন্ধ 'ভারতমহিলা' প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (মাঘ-চৈত্র ১২৮২ বঙ্গাব্দ)।

হরপ্রসাদ যখন বিধিবদ্ধ ছাত্রজীবন শেষ করেন তখন তাঁর বয়স চব্বিশ। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সূত্রে কলকাতার বিদ্বান-মহলে তখনই তিনি পরিচিত। সেই সময়ের দুই দিকপাল গবেষক রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রমেশচন্দ্র দত্ত—দুজনেই গবেষণা-সহকারী হিসেবে তাঁকে পেতে চান। দুজনের সঙ্গেই কাজ করেছিলেন হরপ্রসাদ। রমেশচন্দ্রের সংস্পর্শে থেকে তিনি ভারতীয় জীবনের বাস্তব ভিত্তি—যেমন সামাজিক পরিকাঠামো, কৃষিজাত এবং বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত উৎপাদন, জমি-বণ্টন-ব্যবস্থা, খাজনা-সংক্রান্ত আইন-কানুন ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ অনুবাদের বিস্তারিত টীকাও তিনি প্রস্তুত করেন। অনেক কাল আগেই হরপ্রসাদ একটি প্রবন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে—বেদ অপৌরুষেয় নয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে এসে হরপ্রসাদ ভারত বিদ্যার এবং প্রাচ্য তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করেন। ঐতিহাসিক তথ্যের আহরণ এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ; সেই বিশ্লেষণের পথে প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা তিনি অর্জন করেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে নিয়ে আসেন এশিয়াটিক সোসাইটিতে। সেখানে খ্যাতিমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে কাজ করে যেমন তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তেমনই পুথি পাঠ, পুথি সম্পাদনা, পুথি-তালিকা প্রণয়ন; পালি, অবহট্ট, হিন্দি, মৈথিলি, গুজরাতি, রাজস্থানি ভাষা সম্পর্কেও তিনি সুদক্ষ হয়ে ওঠেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। সেখানে বাংলা ভাষার নির্দিষ্ট বানান ও ব্যাকরণ-বিধি সম্পর্কেও তিনি বেশ কিছু কাজ করেছেন। বহু পত্রিকায় তিনি লিখেছেন এবং বহু গ্রন্থে নিজের পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর দৃঢ়-মুদ্রিত করে গেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আধুনিক মনটিকে বোঝাবার জন্য আমরা তাঁর লেখা একটি মৌলিক গ্রন্থ এবং কয়েকটি প্রবন্ধকে অবলম্বন করব।

মৌলিক গ্রন্থটির নাম 'বাল্মীকির জয়'। তুলনামূলকভাবে তাঁর এই রচনাটি কম পরিচিত। অথচ হরপ্রসাদের সমাজমনস্ক প্রগতিশীল চিন্তনের অপূর্ব দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থটি।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় 'বাল্মীকির জয়' প্রকাশিত হয় (১৮৮০-১৮৮১)। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (১৮৮১)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৬ এবং ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। এই সংস্করণগুলি সবই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী'তে এরপর বইটি স্থান পায়। তারপর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ রচনাবলী' প্রথম সম্ভারে 'বাল্মীকির জয়' মুদ্রিত হয়। সাম্প্রতিকতম সংস্করণটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাবে। প্রকাশ কাল ডিসেম্বর ১৯৮০। আমাদের ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি এই সংস্করণ থেকেই গৃহীত। অতঃপর আমরা 'বাল্মীকির জয়' রচনাটির পরিচয়দানসূত্রে লেখাটির আধুনিকতা কোথায় তা অনুভব করবার চেষ্টা করব।

'বাল্মীকির জয়' কোন্ জাতীয় রচনা তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় এই বইটির যে সমালোচনা লিখেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল—"দুঃখের বিষয়, সমালোচনা আরম্ভ করিয়া, আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, এখানি কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা পদ্যে লিখিত নহে... ইহা নাটক নহে...। ইহাকে নবেলও বলিতে পারিলাম না, কেন না ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টসিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথা আছে কিন্তু পুরাণ নহে; দিগ্বিজয়ের কথা আছে কিন্তু ইতিহাস নহে; একটি সৃষ্টির বিবরণ আছে কিন্তু বিজ্ঞান নহে; নক্ষত্রনীহারিকার কথা আছে কিন্তু জ্যোতিষ নহে; ...। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।"

'বাল্মীকির জয়' একটি কল্প-কাহিনি। তিন প্রধান চরিত্র—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং বাল্মীকি। চরিত্রগুলি পুরাণ থেকেই গৃহীত। বশিষ্ঠ নিষ্ঠাবান কট্টর ব্রাহ্মণ; বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রাজা, ব্রাহ্মণদের কিছুটা প্রতিস্পর্ধী; বাল্মীকি এক দস্যু। কিন্তু রচনাটির পুরাণ-লগ্নতা এইটুকুই। চরিত্রগুলিকে নিয়ে যে গল্পটি বানিয়েছেন হরপ্রসাদ সেটি তাঁর কল্পনার সৃষ্টি। আগে আমরা আখ্যানটি সংক্ষিপ্ত রূপে উপস্থাপিত করছি।

প্রথমে ঋভু নামক সত্তাদের উল্লেখ করেছেন লেখক। তাঁরা অ-লৌকিক সত্তা। মানুষের মৃত্যুর পর, যাঁরা সৎকার্য সাধন করেন তাঁরা বেদ অনুসারে "ছায়াপথেরও ওপারে কোনো সুখময় ভবনে বাস করেন।" তাঁরা ছায়া-শরীর কিন্তু চেতনাসম্পন্ন। কখনও কখনও তাঁরা জন্মস্থান দর্শনে আসেন। তেমনই এক রাত্রিতে ঋভুরা এসে হিমালয়ের শিখরে শিখরে দাঁড়ালেন। তাঁরা ঐকতানে শুরু করলেন অপরূপ সংগীত। সেই গান মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল সকলকে। কিন্তু তা বিশেষভাবে মুগ্ধ করল তিন জন ব্যক্তিকে। সেই তিন জন হলেন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, দিগ্বিজয়ী রাজা বিশ্বামিত্র এবং দস্যুবৃত্তিতে নিরত বাল্মীকি।

এই তিনটি চরিত্রকে পুরাণের আখ্যান থেকে গ্রহণ করলেও এরপর এই চরিত্রগুলিকে যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন এবং সক্রিয় করে তুলেছেন হরপ্রসাদ তার সঙ্গে পুরাণের কাহিনির কোনো সাদৃশ্য নেই। এই রচনা-বিধৃত সমস্ত আখ্যানটিই হরপ্রসাদের কল্পনা-সম্ভূত এবং চিন্তন সমৃদ্ধ।

ঋভুগণের ওই গান এমন একটি সুরকে পরিব্যাপ্ত করে দিল সমগ্র বিশ্ব-চরাচরে—যেখানে সেই সুরের মায়ায় সকলের মনে জেগে ওঠে অনির্বচনীয় এক ভ্রাতৃভাব। এক গভীর ও ব্যাকুল মিলনের বাণী ধ্বনিত এবং অনুরণিত হতে লাগল ভূতল-পরিমণ্ডলের প্রতিটি ধূলিকণায়, প্রতিটি বায়ুস্তরে। হরপ্রসাদের ভাষায় আমরা সেই একতার আহ্বানকে বাণীবদ্ধ হতে দেখি—

"সুর যত জমিতেছে, কেবল যেন বলিতেছে ভাই ভাই ভাই। ঋভুরা যেন বাহু প্রসারণ করিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খেচর, জলচর সকলকে ডাকিতেছে এসো ভাই ভাই, এসো ভাই ভাই, এসো ভাই ভাই। সবাই ভাই। সুর জমিতেছে, যেন আরো ডাকিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

পৃথিবী সুদ্ধ যেন বাজিয়া উঠিল ভাই ভাই। ব্রহ্মাণ্ড হইতে যেন প্রতিধ্বনি আসিল ভাই ভাই। পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম যেন গভীর স্বরে বলিল ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।"

এই সংগীত শুনে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির মনে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি জাগ্রত হল। এইখানে হরপ্রসাদ এই তিনটি চরিত্রকে মানব সভ্যতার তিনটি চালক শক্তির রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদে প্রথমে বড়ো হরফে বাংলায় লেখা ছিল 'বাল্মীকির জয়'। তার নীচেই কিছুটা ছোটো ইংরেজি হরফে লেখা ছিল 'THE THREE FORCES'। তার নীচে বন্ধনীভুক্ত ছিল তিনটি শব্দ 'Physical, Intellectual and Moral'। হরপ্রসাদ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির চরিত্রকে যথাক্রমে এই তিনটি শক্তির প্রতিভূ রূপে গ্রহণ করেছেন।

হরপ্রসাদের এই পরিকল্পনা অবশ্য খুব সফল হয়েছিল বলে মনে হয়নি অনেকের কাছেই। বঙ্কিমচন্দ্র তীক্ষ্ণ ভাষায় এবং তির্যক কটাক্ষে সমালোচনা করে বলেছিলেন—"গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে এক প্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, 'The Three forces—Physical, Intellectual, and Moral'. ইংরেজি ভাষায় শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া থাকি। Force-ত কিছু দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাট মূর্ত্তি—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি! যদি বল এই তিনটিই আমার Force, আমার উত্তর, তোমার Force লইয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দাও, আমি এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা করিব।"

বস্তুতই যে-কোনো পাঠকেরই ধন্দ লাগতে পারে। বশিষ্ঠকে Physical অর্থাৎ শারীরিক শক্তি, বিশ্বামিত্রকে Intellectual অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্ত শক্তি এবং বাল্মীকিকে নৈতিক শক্তি রূপে উপস্থাপিত করবার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং বশিষ্ঠকে বুদ্ধির শক্তি এবং বিশ্বামিত্রকে বাহুবলের প্রতীক রূপে দেখালেই হয়তো যথাযথ হত। এ বিষয়ে হরপ্রসাদ কী ভেবেছিলেন তা আমরা পরে কিছুটা অনুমান করবার চেষ্টা করব। কিন্তু বঙ্কিমের সমালোচনার সত্যতা স্বীকার করতেই হবে। প্রচ্ছদে, শিরোনামের সঙ্গে ওই তিনটি ইংরেজি শব্দের যোগে রচনাটিকে সর্বায়ত রূপক হিসেবে না দেখালেই সংগত হত। সম্ভবত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাশ্চাত্য কাব্যরীতির অনুসরণে একটি পুরোদস্তুর 'অ্যালিগরিক্যাল' বা রূপক-রচনা হিসেবে লেখাটিকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'বাল্মীকির জয়' বিধিবদ্ধ রূপক না হয়ে সাংকেতিকতার আভা বিচ্ছুরিত করে দিয়েছে।

ঋভুদের গান বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং বাল্মীকির মনকে কীভাবে আলোড়িত করল, কীভাবে তাঁদের মনে বিশ্বের ভ্রাতৃভাব সম্পর্কিত চেতনা পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল—তার সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি প্রদান করেছেন হরপ্রসাদ—

"বশিষ্ঠের মনে আত্মপ্রসাদ—আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাদ মিটাইয়া তুলিয়াছি। আমি সব ভাই ভাই করিবার যোগাড় করিয়াছি।

বিশ্বামিত্রের মনে আত্মগরিমা—আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এক করিয়া আনিয়াছি, আমার শাসনে সব ভাই ভাই হইয়া যাইবে।

আর বাল্মীকির অন্তরের অন্তরে ভাবনা কি? বিষম আত্মগ্লানি। হায়! আমি কি করিতেছি, আমি কেবল আমার ভাইয়েদের সর্বনাশ করিতেছি!!!"

এখানে আমরা স্পষ্টই দেখছি—বিশ্বামিত্র বাহুবলের কথাই বলেছেন নিজের শক্তি হিসেবে। আর, বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ মেটানোর কাজটিকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপিত হবার প্রথম পদক্ষেপ বলে ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ বুদ্ধিবলই প্রধান হয়েছে সেখানে। বাল্মীকির ক্ষেত্রে সংশয়ের অবকাশ কম। গানের সুরে দস্যু বাল্মীকির চিত্তে দেখা দিয়েছে অনুশোচনা এবং আত্মগ্লানি। সেখান থেকে নৈতিক শক্তির উৎসারণ ঘটা স্বাভাবিক।

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনার পর প্রবন্ধ পাঠকদের মনে হতে পারে—এখানে হরপ্রসাদের আধুনিক মনের পরিচয় কীভাবে সপ্রমাণ হয়েছে। সেই প্রমাণের ক্ষেত্রটি আসে আরও কিছুটা পরে। বইটির প্রথম খণ্ডে ঋভুদের সংগীত বর্ণনা এবং তিন প্রধান চরিত্রের মনে সেই সংগীতের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে শুরু হয়েছে চরিত্রগুলির সক্রিয়তা অর্থাৎ ঘটনার আরোহণ পর্ব। সেখানে পথিমধ্যে চলতে চলতে দেখা হয়েছে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের। তাঁদের দুজনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও ক্ষত্রিয় শক্তির অবস্থান তথা অভিপ্রায়কে অনাবৃত করে দিয়েছেন তিনি। ঋভুদের গানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাঁদের বাক্যালাপে উঠে আসে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে ভ্রাতৃভাবের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করবার বাসনার কথা। আমরা বিশ্বামিত্রের মন্তব্যগুলিই আগে দেখি। তিনি ভ্রাতৃভাব স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দিগ্‌বিজয়ের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

"দিগ্বিজয়ে সমস্ত পৃথিবীতে একজন রাজা হন, এবং এক রাজার অধীনে সমস্ত জাতিতে ঐক্য সংস্থাপিত হয়।"—বশিষ্ঠ যখন বলেছেন জেতা ও বিজিতদের মধ্যে বিদ্বেষভাব থাকবে, তার ফলে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হতে পারবে না তখন জেদি বালকের মতো বিশ্বামিত্র বার বার বলেছেন একই কথা—"আমার সংস্কার এই দিগ্বিজয় ভিন্ন অন্য কিছুতেই পৃথিবীতে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্যবন্ধন হইতে পারে না। দিগ্বিজয়ী রাজা পিতার ন্যায় সমস্ত প্রজাকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করেন, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই হইয়া উঠে।" বশিষ্ঠ যখন বলেছেন যে, দিগ্‌বিজয়ে মানুষের শরীরকে জয় করা সম্ভব হলেও তার দ্বারা মনের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় না; তখন বিশ্বামিত্র অসংকোচে উত্তর দেন—"মনে যাহাই থাকুক প্রকাশ হইতে দিব না।" এ হল চিরকালের স্বৈরাচারী শাসকের উক্তি। 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যে দুর্যোধনের সংলাপেও একই কথা বসিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—"অব্যক্ত নিন্দায়/কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজ মর্যাদায়/ ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে।" বশিষ্ঠ যখন বলেছেন মনের বিদ্বেষভাবের ফলে দেশে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে; তখন বিশ্বামিত্রের জবাবটি অতুলনীয়—"আপনি মনে করিবেন না, এই হস্তে ধনুর্বাণ থাকিতে প্রজারা বিদ্রোহী হইতে পারিবে।" মানব-সভ্যতায় যে শক্তিমান সে সর্বদাই নিজেকে এইভাবে অপ্রতিরোধ্য প্রশাসক বলে মনে করে এবং সেই শাসন ব্যবস্থাকেই মনে করে সর্বোত্তম উপযোগিতা সম্পন্ন। সত্যজিৎ রায় 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে এই বক্তব্যেরই চলচ্চিত্র-রূপ দিয়েছেন।

বিশ্বামিত্রের এই সমগ্র প্রস্তাবের উত্তরে বশিষ্ঠ যে প্রশ্নটি করেছেন সেটিকেই বলা যেতে পারে নিপীড়িত মানুষের সরলতম প্রতিবাদী প্রশ্ন—"যদি ধনুর্বাণ দ্বারাই ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিতে হইল, তবে তাহাকে কি ভ্রাতৃভাব বলা যাইতে পারে?" —এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না বিশ্বামিত্রের কাছে।

কিন্তু আমাদের মনে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা স্মরণে রেখে লেখক সম্পর্কে সেই পুরোনো প্রশ্নটি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বিশ্বামিত্রের পূর্বোক্ত সমস্ত বাক্যই বাহুবলকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তা হলে হরপ্রসাদ কেন বিশ্বামিত্রের শক্তিকে 'ইনটেলেকচুয়াল ফোর্স' বলে অভিহিত করলেন? 'ফিজিক্যাল ফোর্স' বলে উল্লেখ করলেন না? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আমাদের জানা নেই। তবু আমরা অনুমিত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে মানব-সমাজে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের উপায় হিসেবে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের পরিকল্পনাটি জেনে নেওয়া দরকার।

বশিষ্ঠ বলেছেন—"মানুষে যতক্ষণ নিজে নিজের জন্য চিন্তা করিতে শিখে, ততক্ষণ দুই মানুষকে এক করা কাহারো সাধ্য নয়। অতএব স্বাধীন চিন্তাস্রোত দূর করাই সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন। নীচ জাতির যাহাতে স্বাধীনচিন্তা না থাকে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।" বশিষ্ঠের এই

উক্তিতে 'নীচজাতি' শব্দটির প্রয়োগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বশিষ্ঠের চিন্তনে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় সমাজকে জাতিগতভাবে 'উচ্চ' এবং 'নিম্ন' বলে চিহ্নিত করা এবং নীচ জাতীয় ব্যক্তির চিন্তন-ক্ষমতাকে রুদ্ধ করে দেবার চেষ্টা করা। ভ্রাতৃভাব স্থাপনের এই অদ্ভুত উপায়ের স্বৈরাচারী কূটকৌশল কেবল ভারত নয়, বিশ্বের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারতের মতো জাতিভেদের ভিত্তিতে না হোক, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সাধারণ মানুষকে এভাবেই ভাবতে শেখানো হয়েছিল যে, রাজা এবং যাজকেরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁদের বিধানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হতে পারবে না কোনো কথই। আমাদের স্মরণে আসতে পারে জোন অভ আর্ক-এর মৃত্যু-দৃশ্যটি। ধর্মযাজকদের উপেক্ষা করে ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছে বলে দাবি করেছিল সেই কিশোরী। তারই ফলে স্বদেশীয় ধর্ম ব্যবসায়ীদের হিংস্র প্রতিশোধস্পৃহাতেই জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিল সে। বুদ্ধিজীবীর দল এভাবেই সাধারণ দুর্বল জনগণকে বঞ্চিত করে এসেছে চিরকাল।

কিন্তু কীভাবে মানুষের চিন্তন-ক্ষমতা রুদ্ধ করবেন ব্রাহ্মণেরা—এই প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ ব্যক্ত করেছেন তাঁর কৌশল—"বুদ্ধিবলে কিনা হয়? আমি বাল্যকাল হইতে তাহাদের মন অন্যপথে ফিরাইয়া দিব। ভোগসুখে রত করাইব। মনের মধ্যে অন্য চিন্তা জন্মিতে দিব না। একেবারে গ্রন্থাদি পাঠ হইতে বঞ্চিত করিব।"

এর উত্তরে বিশ্বামিত্র একটি আশ্চর্য উক্তি করেছেন। হৃদয়ে আলোড়ন তোলে বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য। তিনি বলেন—"আপনি মনে করিয়াছেন তাহাতেই আপনারা কৃতকার্য হইতে পারিবেন? আপনাদের পরম শত্রু আকাশ আছে দেখিতেছেন না? অনন্ত আকাশের দিকে একবার চাহিলে স্বাধীন চিন্তা যে আপনি উদ্বেল হইয়া উঠে।" বস্তুত স্বৈরাচারী শাসকেরা বিরল কল্পনাশক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন। আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এবং হিটলার—সকলেরই এই কল্পনা-প্রতিভা ছিল। এজন্যই তাঁরা ভাবতে পেরেছিলেন যে এক জীবনে জয় করবেন সমগ্র বিশ্ব। সামরিক শক্তি-বলে হবেন বিশ্বের বিধায়ক। কীভাবে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তা তাঁরা জানতেন। নিজেদের বাস্তব বুদ্ধিতে তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, একমাত্র বাহুবল তথা সামরিক শক্তির বলেই মানুষকে অধীনে রাখা যায়। তাঁদের এই চিন্তন ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি আজও। বিত্তবলে পৃথিবী শাসন করবার ক্ষমতা অর্জন করবার পরেও দুর্বল দেশের উপর নিত্য আধুনিকতম বিস্ফোরক বর্ষণ করে যায় সম্পদশালী রাষ্ট্রশক্তি। আমরা সাম্প্রতিকতম বর্তমানে প্রতিদিনই তা দেখছি।

বশিষ্ঠের যুগ ছিল আলাদা। অথবা বলা যায়, বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধির প্যাঁচ রাষ্ট্রীয় প্রশাসকের চিন্তার ধরন থেকে স্বতন্ত্র। তাই তাঁরা মগজ ধোলাইয়ের পদ্ধতিকেই সূক্ষ্মতর করে তোলবার চেষ্টা করেন। বিশ্বামিত্রের অভ্রংলিহ উক্তির প্রতিক্রিয়ায় বশিষ্ঠ যা বলেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য—"আমরা তাহারো বন্দোবস্ত করিয়াছি। অনন্ত আকাশের দিকে কাহাকেও চাহিতে দিব না। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেবতা বসাইব! আকাশের তারার সহিত মনুষ্য অদৃষ্টের একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিব। অন্তরীক্ষ বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া দিব। যে ভাবে আকাশের দিকে চাহিলে স্বাধীন চিন্তা প্রবল হয়, সে ভাব তাহাদের মনেও আসিতে দিব না। সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়, সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করিয়া দিব। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার এমনি বাঁধাবাঁধি করিব যে ব্রাহ্মণ ছাড়া কাহারো এক পাও যাইবার ক্ষমতা রাখিব না। অথচ ব্রাহ্মণ রাজাও হইবে না।"

এই ব্রাহ্মণ্য বিধানের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বামিত্রের জবাবটি আমাদের ভারী মনের মতো হয়—"হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি। বিটলামি করিয়া জগৎ বশ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু বিটলামিতে কয়দিন লোকে ভুলিয়া থাকিবে?"—চিরদিন যে লোকে এই প্রতারণায় (বিশ্বামিত্রের

ভাষায় 'বিটলামি') ভুলে থাকেনি— আজকের মানব-সভ্যতায় সব মানুষের সম অধিকারের নৈতিক স্বীকৃতি তারই প্রমাণ।

এখন আমরা ফিরে যাব সেই কূট প্রশ্নটিতে—যেটি সংগতভাবেই তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বশিষ্ঠের শক্তিকে বাহুবল বা 'ফিজিক্যাল ফোর্স' বলে কেন নির্দেশ করলেন হরপ্রসাদ; কেনই বা বিশ্বামিত্রের শক্তিকে বললেন 'ইনটেলেকচুয়াল ফোর্স'! হয়তো এই আপাত ভ্রান্তির মধ্যেই নিহিত আছে হরপ্রসাদের গভীর কটাক্ষ। ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে সাধারণ সরল মানুষকে শাস্ত্রীয় বিধানের প্রতারণার ফাঁদে ফেলে যেভাবে নিম্নশির করে রাখবার প্রক্রিয়া স্থাপিত হয়েছিল ভারতের মতো দেশে, তার উৎসমূলে চতুর ষড়যন্ত্র থাকলেও মুক্তবুদ্ধিকে শাসিত রাখবার সেই বিধান প্রবল পরাক্রান্ত শারীরিক বলের মতোই চেপে বসেছিল সমগ্র জাতির মানসিকতায়। হিন্দুত্বের মেরুদণ্ড দুর্বল করেছে এই বর্ণাশ্রম। সাধারণ মানুষের কাছে লৌহশৃঙ্খলের মতোই, নিশ্ছিদ্র কারাগারের মতোই মানসিক অবরুদ্ধতা চাপিয়ে দিয়েছে এই বিধান। তাই সাধারণ মানুষের কাছে বশিষ্ঠের পরিকল্পিত ওই ব্রাহ্মণ্য বিধান গায়ের জোরের মতোই 'ফিজিক্যাল ফোর্স' রূপে প্রতিভাত হয়েছে চিরকাল।

অপর পক্ষে বিশ্বামিত্র একদিকে যেমন সমর শক্তিতে আস্থা রেখেছিলেন, অন্যদিকে তাঁর সমগ্র কর্ম-প্রাণনার উৎস ছিল একটি মেধা-সম্ভূত প্রশ্ন। প্রশ্নটি এই —ব্রাহ্মণ্য-বিধান-নির্দিষ্ট উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের শাসক-শাসিত সম্পর্কটিকে কি বিচলিত করা যায় না? বিশ্বামিত্র যুদ্ধ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর আসল প্রতিবাদটা ছিল ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তন-সঞ্জাত প্রতিবাদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কামধেনু-সংক্রান্ত বিবাদের বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তৃতীয় খণ্ডে বিশ্বামিত্রের তপস্যারত মূর্তির চিত্র এঁকেছেন। বিশ্বামিত্রের তপস্যায় স্বর্গ বিচলিত; ব্রাহ্মণেরা ভীত; ব্রহ্মর্ষিরা তাঁকে তপস্যাবিমুখ করতে চান।

এরপর হরপ্রসাদ পুরাণ-আখ্যান থেকে সরে এসেছেন। পুরাণে আছে বিশ্বামিত্র নির্মাণ করেছিলেন এক নতুন পৃথিবী। ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবীর মতো সব কিছুই সেখানে ছিল। কিন্তু সব কিছুরই মান ছিল ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবীর তুলনায় কিছুটা উন। মানুষ কিছুতেই ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী হতে পারে না—এই প্রতিপাদ্যই পুরাণের গল্পটির মূল বক্তব্য।

হরপ্রসাদের আখ্যানে দেখতে পাই—বিশ্বামিত্রের তপস্যায় ভীত হয়ে দেবতা এবং ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার নেতৃত্বে বিশ্বামিত্রকে বর দিতে চাইলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাতে সম্মত না হয়ে তাঁরা বিশ্বামিত্রকে দিতে চাইলেন রাজর্ষির সম্মান। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র সে সম্মান প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সংকল্প করলেন যে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবেন তিনি। কিন্তু সেই পৃথিবী কেমন হবে তার প্রথম সূত্রটি অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রথমেই ব্রহ্মা সহ অন্যান্য দেবতা এবং ঋষিদের শুনিয়ে দিলেন বিশ্বামিত্র—

"কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্ব-প্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মাত্ব চাহি, তোমাদের খোশামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। ...ব্রাহ্মণ আমার চক্ষুশূল হইয়াছে।"

এখান থেকে হয়তো আমরা অনুমান করতে পারি কেন বিশ্বামিত্রকে 'ইনটেলেকচুয়াল ফোর্স' বা মেধাশক্তির প্রতিভূরূপে মর্যাদা দিয়েছিলেন হরপ্রসাদ। প্রথমত, মানুষকে ভাবনা-চিন্তা এবং ক্রিয়ার দিক থেকে পঙ্গু করে রাখবার চেষ্টা করে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র, সেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন বিশ্বামিত্র। তাঁর স্বাধীন চিন্তার শক্তি প্রমাণিত হলে এই বিদ্রোহে। তারপর তিনি গড়ে তুললেন নতুন পৃথিবী। মানুষের স্বাধীন কর্মশক্তিরও বিকাশ প্রমাণিত হল তাতে। এজন্যই

বিশ্বামিত্রকে মেধাশক্তির চরিত্রবল অর্পণ করলেন হরপ্রসাদ। একথা স্বীকার্য যে, প্রথম থেকেই এই দুটি শক্তির পার্থক্য খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়নি। সম্ভবত এজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিকল্পনার সমালোচনা করেছিলেন।

চতুর্থ খণ্ডে আছে বিশ্বামিত্রের নির্মিত নতুন পৃথিবীর বিবরণ। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে সে পৃথিবী অতুলনীয়। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল মানুষের পক্ষে যথাযথ। হিংস্র জন্তু ছাড়া প্রকৃতির যা কিছু সুন্দর সবই সেই পৃথিবীতে আছে। বায়ু সুগন্ধী, জল সুপেয়, ফলাদি শস্য সুপ্রচুর। গ্রীষ্মকালে মানুষের পথ চলতে যাতে কষ্ট না হয় সে জন্য প্রতিটি রাস্তা ছিল আচ্ছাদিত। সেই আচ্ছাদনের উপর দ্বিপ্রহরে বরফ বিছিয়ে দেওয়া হত। হরপ্রসাদের কল্পনায় 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' কেমন হওয়া উচিত তার একটি ইঙ্গিত আমরা এখানে পাই। তাঁর পৃথিবীতে প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা। হরপ্রসাদ লিখেছেন—"যাহাতে সকল লোকেরই বুদ্ধিবৃত্তি সমানরূপে পুষ্ট হয়, বিশ্বামিত্র তাহার জন্য চারিদিকে বিদ্যালয়, কলেজ নির্মাণ করিয়া দিলেন।" —এজন্যই বিশ্বামিত্র 'ইনটেলেকচুয়াল ফোর্স'।

অবশ্য কল্পনাকে খানিকটা বলগা-ছাড়াও করে তুলেছেন হরপ্রসাদ। তাঁর পৃথিবীতে বিবাহ নেই, কিন্তু প্রেম আছে। সেখানে মানুষ স্বেচ্ছাক্রমে সহবাস করে। স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়। হরপ্রসাদের আধুনিকতার মাত্রা কোথায় পৌঁছেছিল সেই উনিশ শতকে তা ভাবলে আমাদের স্তম্ভিত হতে হয়। কিন্তু তাঁর কল্পনার দুর্বলতা এইটুকু যে, তিনি পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর পৃথিবীতে—প্রশাসকের অস্তিত্ব ছাড়াই। তাঁর পৃথিবীতে মানুষ জিতেন্দ্রিয়; মানুষ চির বন্ধুত্বপূর্ণ চিত্তের অধিকারী; মানুষ সর্বদাই জ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চায় নিমগ্ন। সেখানে চির শান্তি বিরাজ করে। সেখানে জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারটি ভারী আশ্চর্য—

"বিশ্বামিত্রের দেশে মানুষ মরিত না, উহারা এক পৃথিবী হইতে অন্য পৃথিবীতে চলিয়া যাইত; এইরূপে সাত-আটবার ঘুরিয়া আবার সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইত। বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে জন্ম দুই প্রকার। পুনরাবর্তন জন্ম আর নূতন জন্ম; নূতন জন্ম সংখ্যায় সংখ্যিত ছিল, রোজ সেই কয়টি করিয়া নূতন জন্ম হইত; বাকি পুনরাবর্তন জন্ম। বিশ্বামিত্রের পৃথিবী অল্পকাল ছিল, অধিক নূতন জন্ম হইলে কি হইত বলা যায় না।"

এই চতুর্থ খণ্ডেরই শেষ অংশে আখ্যানের মধ্যে বাল্মীকিকে দেখি। বাল্মীকি সেই অলৌকিক সংগীতের সুরে হৃদয়ের পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন। দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে অনুতপ্ত হৃদয়ে ঘুরছিলেন পথে পথে। সেই সময় সহসা একদিন তাঁর সামনে ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটি পাখি নিহত হল অপর এক ব্যাধের শরসন্ধানে। বাল্মীকি উচ্চারণ করলেন সেই অমর শ্লোক—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং..."। সেই বাণীর মহিমান্বিত আকর্ষণে সরস্বতী আবির্ভূত হয়ে বীণা দান করে গেলেন বাল্মীকিকে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড দুটিকে বলা যায় আখ্যানের শীর্ষবিন্দু। ঈশ্বরের সৃষ্ট পুরোনো পৃথিবীতে দস্যু-দলের অত্যাচার ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল; পৃথিবী হয়ে উঠল অরাজক এবং ভয়ংকর। কিন্তু বাল্মীকির হৃদয়ে তখন প্রকৃত কবিত্ব জেগে উঠেছে—যার দ্বারা মানুষে মানুষে মৈত্রী স্থাপিত হবার সম্ভাবনা। তিনি বীণা হস্তে গান গেয়ে পৃথিবীর বিপন্ন মানুষকে সেবা করবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ষষ্ঠ খণ্ডে দেখা যায় বিশ্বামিত্র তাঁর নতুন পৃথিবীতে সুখী হলেও ক্রমশ একাকীত্ব অনুভব করতে লাগলেন। তিনি চেষ্টা করলেন পৃথিবী থেকে তাঁর একদা স্বস্থান কান্যকুব্জ নগরীকে সম্পূর্ণ তুলে এনে নিজের পৃথিবীতে স্থাপন করতে। সেই চেষ্টা প্রতিহত করলেন ব্রহ্মা। ফলে ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র বাস্তব বিস্মৃত হয়ে গদা ঘূর্ণিত করতে শুরু করলেন। দুই পৃথিবীতেই প্রলয় উপস্থিত হল। বিশ্বামিত্রের পতন হল তাঁর নিজের পৃথিবী থেকে। আমাদের স্বীকার করতে হয়

যে বিশ্বামিত্রের মেধাশক্তি হৃদয়ের প্রশান্তি আর চিত্তের প্রজ্ঞার অভাবে স্থায়ী সুফল অর্জন করতে পারল না—এই সত্য হরপ্রসাদকেও মানতে হয়েছে।

ঈশ্বরের পৃথিবীতে অশান্তির অবসান-কল্পেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবার আয়োজন হতে লাগল। আকাশ পথে পড়তে পড়তে সেই যজ্ঞকুণ্ডে এসে পড়ল বিশ্বামিত্রের প্রায়-নিষ্প্রাণ দেহ। ইতোমধ্যে বাল্মীকি বীণা-ঝংকৃত সংগীতে মন্দ্রিত করে তুলেছেন পৃথিবীর আকাশ-বাতাস। তাঁর গানের বিরাম নেই। প্রকৃত অনুশোচনা থেকে তাঁর হৃদয়ে জন্ম নিয়েছে প্রকৃত সেবা-ধর্মের ব্যাকুলতা। তাঁর গান যিনি শোনেন তাঁরই হৃদয়ে জাগে করুণা এবং ভ্রাতৃভাব। যজ্ঞকুণ্ডে যখন বিশ্বামিত্র এসে পড়েছেন তখন তাঁকে ঘিরে ধরলেন ব্রহ্মাসহ অপর ব্রাহ্মণেরা। বাতাবরণে বাল্মীকির গান। সকলেরই হৃদয়ে ভ্রাতৃভাব জাগল। বিশ্বামিত্র ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উদার হৃদয়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁকে ব্রাহ্মণত্ব দানে সম্মত হলেন। অতঃপর কীভাবে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ করলেন বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি—তিন জনে মিলে। বাল্মীকির শক্তি কেবল হৃদয়ের শক্তি। সাম্য-মৈত্রী-করুণা নিষিক্ত ভ্রাতৃভাবের বিকাশ ঘটানো ছাড়া আর কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর। এখানেই শেষ হয়েছে সপ্তম খণ্ডটি।

অষ্টম খণ্ডে উপসংহারে লেখক দেখিয়েছেন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকির পরামর্শেই রামরাজ্য পরিকল্পিত হল। নারায়ণ রাম অবতারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন। রামনাম-গানে মানবচিত্তে শান্তি, প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন বাল্মীকি। আখ্যানের মধ্য-পর্বে হরপ্রসাদের চিন্তন-মনন ও কাব্য-পরিকল্পনা যে উচ্চতায় উন্নীত হয়েছিল তা শেষ খণ্ডে ধরে রাখা যায়নি। কাজটি দুরূহ ছিল। তবে তাঁর বক্তব্য যথার্থই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই রচনায়। হরপ্রসাদশাস্ত্রী বলতে চেয়েছেন যে নৈতিক শক্তিতেই মানুষের মনে যথাসম্ভব ভ্রাতৃভাবের উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভব।

বক্তব্যের মধ্যে খুব যে নতুনত্ব আছে তা নয় কিন্তু আখ্যানটির পরিকল্পনায় বর্ণাশ্রম প্রচলিত থাকা হিন্দু সমাজ ও মানব-সম্পর্ক বিষয়ে যে-মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছেন তাকে সাম্প্রতিকতম সমাজ-চিন্তনের অনুপাতেও সমুজ্জ্বল আধুনিক বলে চিনে নিতে আমাদের মুহূর্ত বিলম্ব হয় না।

CENTRAL LIBRARY

হরপ্রসাদনির্মিত বাঙালিজীবন

কবিতা চন্দ

এক

বঙ্কিমচন্দ্র একসময় দাবী তুলেছিলেন যে বাংলার ইতিহাস প্রয়োজন। নইলে বাঙালি কখনও মানুষ হবে না। বাংলার ইতিহাস বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন বাংলার রাজ্য পরিচালনার ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস, বাণিজ্য ও শিল্পকাজের দক্ষতা ইত্যাদির ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে পৃথক করে দেখবার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে ধর্মনির্ভর সংস্কৃতি একসময় বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। নানা সময়ে নানা জনগোষ্ঠী এদেশে এসেছে এবং ধীরে ধীরে এদেশীয় সম্পদ ও তাদের ঐতিহ্য গ্রহণ বর্জন ও মিশ্রণের ফলে এদেশের ধর্ম সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে গেছে। বৌদ্ধবিদ্যা বিশারদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯২৯-এ 'সাহিত্য পরিষৎ'-এর এক অভিভাষণে এই বিচিত্র মিশ্রণের সমীকরণ করে জানান—"এই সকল দেখিয়া মনে হয় বাংলায় বৌদ্ধতন্ত্র নামে হিন্দু তন্ত্রভুক্ত হইয়া গিয়াছে, আর যাহা হয় নাই তাহা লোপ পাইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রের পুঁথিগুলি এইরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে। ...আমরা বাঙালি ব্রাহ্মণেরা এখন অর্ধ-হিন্দু, অর্ধ-বৌদ্ধ। যখন আমরা সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন গুরু আমাদের কানে ফুঁ দিয়া যান, আর আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ। আচ্ছা, যেভাবে তোমরা বাংলায় আসিয়াছিলে, সে ভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ আধা-বৌদ্ধ আধা-হিন্দু ভাব লইলে কেন।"[১] 'বাংলার বৌদ্ধ সমাজ' নামক এই অভিভাষণে হরপ্রসাদ আরো জানান যে বাংলায় তন্ত্রর প্রভাব যেমন ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছে, তেমনি এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতিতে একসময় বহিরাগত মুসলমানদের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বাঙালি জাতির প্রাচীন ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে হরপ্রসাদ যে মন্তব্যগুলি করেছেন ঐতিহাসিকদের বিচারে তার সবটা গ্রহণযোগ্য না হলেও (যেমন বাইরে থেকে তন্ত্রের আগমন) বাঙালি জাতির এই মিশ্রণ ইতিহাসসম্মত।

হরপ্রসাদ যখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম জীবনে বাংলার ইতিহাস খুঁজতে সচেষ্ট ছিলেন তখন তাঁর মতো অনেকেই এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্যরা হলেন রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রমুখ। কিন্তু ১৯০৭-এ হরপ্রসাদ আবিষ্কৃত চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের সূত্রে বাংলা সাহিত্যের যেমন এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের উন্মোচনে বাংলার ইতিহাসেরই বিপুল পরিবর্তন ঘটে যায়, তেমনি স্বয়ং বৌদ্ধবিদ্যা অনুরাগী হরপ্রসাদের ভাবনাচিন্তাতেও এক ধরনের জোয়ার আসে। জোয়ারটি অবশ্যই প্রাচীন বাঙালিকেন্দ্রিক। এ বিষয়ে মনে পড়ে তাঁর সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের আলোচনার কথা। তিনি জানাচ্ছেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাস বঙ্গীয় সমাজের ইতিহাস ...একপ্রকার পতিতভূমির ন্যায় অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞ আলোচকের দৃষ্টির অগোচরে উপেক্ষিতভাবে পড়িয়া ছিল। তাঁহার (শাস্ত্রী মহাশয়ের) বিদ্যা ও ধীশক্তি এই অভিনব রাজ্যেও কি প্রকার অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে তাহা আজ কারো অবিদিত নাই।"[২] ভবতোষ দত্ত জানাচ্ছেন, "হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানচর্চার পরিধি বিচার করলে বলা যায় যে তিনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মূল মর্মেই সন্ধান করে ফিরেছেন, কেবল বাংলার ইতিহাস বা বাংলার সংস্কৃতিই তাঁর প্রধান আলোচনাক্ষেত্র ছিল না। তথাপি বাংলার ইতিহাস তাঁর বৃহত্তর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অন্তর্গত ছিল। সে ক্ষেত্রে তাঁর দান বস্তুতই ছিল মৌলিক।"[৩]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইতিহাসভিত্তিক প্রবন্ধাদির মধ্যেই কেবল তাঁর এই কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ রাখেন

CENTRAL LIBRARY

নি। তিনি তাঁর কল্পনা ও ইতিহাসের যুগলবন্দীর সূত্রে দুটি উপন্যাসের মধ্যেও বাংলা তথা বাঙালির অস্তিত্ব খুঁজে ফিরেছেন। উপন্যাস দুটি হল 'কাঞ্চনমালা' ও 'বেনের মেয়ে'। দুটি উপন্যাসেই যে প্রাচীন সমাজ-উল্লিখিত হয়েছে তা বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত। অবশ্য এই ধরনের কল্পনা ও ইতিহাসের যোগসূত্র রচনার প্রয়াসের ক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধাদিও মুক্ত নয় একেবারে। এ বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদির তালিকা বেশ দীর্ঘ। বাংলায় তিনি লিখেছেন, বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে, নির্বাণ, নির্বাণ কয় রকম? কোথা হইতে আসিল (দুটি প্রবন্ধ), হীনযান ও মহাযান, মহাযান কোথা হইতে আসিল? সহজযান, বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত, বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল? এখনও একটু আছে, উড়িষ্যার জঙ্গলে, জাতক ও অবদান, দলাদলি, মহাসঙ্ঘিক মত, থেরবাদ ও মহাসঙ্ঘিক, মানুষ ও রাজা, বৌদ্ধ ঘন্টা ও তাম্রমুকুট, হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ, বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করতেন, বাঙ্গালার বৌদ্ধ সমাজ, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, ভারতের লুপ্ত-রত্নোদ্ধার, কুশীনগর, ভারতের ভক্তি-সাধনায় বৌদ্ধপ্রভাব ইত্যাদি।

ইংরেজীতে লিখেছেন, Discovery of the Remnants of Buddhism in Bengal, Discovery of Living Buddhism in Bengal, Buddhism in Bengal since the Muhammedan Conquest, Buddhists in Bengal, Bengali Buddhist Litarature ইত্যাদি। এইসব আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা করতে করতেই অনায়াসে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে প্রবেশ করতেন। একটি নমুনা দেখানো যেতে পারে। 'বাংলার বৌদ্ধ সমাজ' প্রবন্ধটিতে তিনি পরিসংখান সমেত আলোচনা করতে করতে লেখেন, "বাংলাদেশ যে বৌদ্ধময় হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখন রিসার্চ করিয়া বাহির করিতে হয়। প্রথম তো বিশ্বাসই হয় না, তাহার পর ঘাড় পাতিয়া লইলে চক্ষু ফুটে—তখন বাংলার অনেক রহস্য জলের মতো বুঝিতে পারা যায়; বৌদ্ধদের অমিত শক্তি অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাঙালি ব্রাহ্মণের অমিত শক্তি, অমিত ধৈর্য ও অমিত পরাক্রম স্মরণ করিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। ...রহস্যজাল ভেদ করিয়া এই কথাটি খুলিয়া দিলে বাঙালির চক্ষু স্পষ্ট দেখিতে পায়—তাহারা কী ছিল, কী হইয়াছে ও ভবিষ্যতে কী হইতে পারে। অতীতে তাহাদের অগৌরবের কিছুই নাই, সবই গৌরবময়।"[৪]

এই গৌরবময় অতীতের কাহিনী হরপ্রসাদের দুটি বড় উপন্যাসেই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে বাংলার প্রাচীনতম ও প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করতে গিয়ে অনেক সময় তাঁকে তাঁর অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে বেশী। সেই নির্ভরতা পরবর্তীযুগের গবেষকদের কিছুটা বিভ্রান্ত করেছে। এ সম্পর্কে সুশীলকুমার দে বলেছেন, "হরপ্রসাদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কল্পনা গল্পকেও ইতিহাসে পরিণত করতে কুণ্ঠিত হইত না।"[৫]

বস্তুত উনিশ শতকের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) থেকে শুরু হয়েছে। কাহিনীটি শিবাজী ও ঔরঙ্গজেবের কন্যা রোশেনারা প্রণয় সম্পর্কিত। ইংরেজী রীতির এই উপন্যাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের ফাঁক পূরণে কল্পনার ব্যবহার করলেও ঐতিহাসিক তথ্য কোথাও লঙ্ঘন করেন নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পর এই ধারার প্রধান উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী' ও 'রাজসিংহ'-র মধ্যে রবীন্দ্রমতে একমাত্র 'রাজসিংহ'-তেই ইতিহাস ও কল্পনার সার্থক যুগলবন্দী রচিত হয়েছে। ফলে এটিতেই শুধু 'ঐতিহাসিক রস' সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কালেই রমেশচন্দ্র দত্ত ইতিহাসাশ্রিত চারটি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত' ও 'রাজপুতজীবনসন্ধ্যা'। আকবর থেকে ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত কালসীমা ধরা হয়েছে এইসব উপন্যাসে। রমেশচন্দ্রর পরও অনেকে ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস রচনা করেছেন। সবক্ষেত্রে সেসব

CENTRAL LIBRARY

সফলতা পায় নি। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্যের একটি জায়গায় মিল রয়েছে। সে মিল স্বাদেশিকতা বোধে। এই একই বোধ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকেও ইতিহাসভিত্তিক মানবিক জীবন রচনায় ব্রতী করেছিল। তাই প্রবন্ধাদিতেও তিনি প্রাচীন বাঙালির গৌরব খুঁজে ফিরেছেন। তবে তাঁর ক্ষেত্রে অন্যান্যদের মত ঐতিহাসিক উপাদান সহজলভ্য ছিল না। ফলে কল্পনানির্ভরতার ক্ষেত্রে তাঁকে অন্যান্যদের থেকেও অনেক বেশী সাহসী হয়ে উঠতে হয়েছিল। সে যুগে অবশ্যই এটি ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা। হরপ্রসাদ পূর্ববর্তীদের বাঁধা পথ থেকে নিজের ক্ষমতার কারণেই সরে এসেছিলেন এইভাবে।

দুই

এ বিষয়ে তাঁর প্রথম রচনার ইতিহাসকাল রাজা অশোকের সময়। বলে নেওয়া ভাল যে এই রচনার আগে তিনি তাঁর 'বাল্মীকির জয়' আখ্যানে পুরাণকে নিয়ে জীবনের গল্পরচনায় মেতেছিলেন। কিন্তু 'কাঞ্চনমালা'র (১৮৮২) ইতিহাস সুদূরের হলেও তা ইতিহাস-ই পুরাণ নয়। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে রাজা অশোকের পুত্র কুণালের প্রণয়ে আসক্ত হয়েছিল কুণালের বিমাতা রানী তিষ্যরক্ষা (ইতিহাসে তিনি তিষ্যরক্ষিতা)। ভারতবর্ষের সেটি স্বর্ণময় বৌদ্ধযুগ। হরপ্রসাদ এই সময়ের ইতিহাসকে নিয়েছিলেন সিংহলের 'মহাবংশ', 'দীপবংশ' ও 'দিব্যাবদান' থেকে। এর সঙ্গে তিনি জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের 'পরিশিষ্টপর্বন', তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথের 'ভারতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস', 'জৈনসূত্র' ও 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা'-র সাহায্য নিয়েছেন।[৬]

বৌদ্ধ ত্রিরত্নে বিশ্বাসী কুণাল অতি সৎ ও ধর্মপ্রাণ। তার যোগ্য সহযোগী হল তাঁরই প্রেমময়ী স্ত্রী কাঞ্চনমালা। উপন্যাসের শুরুতে কিছুটা কালিদাসীয় রীতিতে কিছুটা বঙ্কিমীরীতিতে এই যুগল ফুলচয়নে রত। উদ্দেশ্য একটি নাটকে অভিনেতা-অভিনেত্রী রূপে অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু উপন্যাসের প্রথম থেকেই তিষ্যরক্ষা কুণালের প্রেম পাওয়ার জন্য কুচক্রী ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। কুণাল কিন্তু কিছুতে তার ছলনায় ধরা দেয় না। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য থাকলেও ব্রাহ্মণবাদীদের প্রতিপত্তিও কিছু কম ছিল না। গোপনে তিষ্যরক্ষা তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ বাধায়। এ যুদ্ধে একমাত্র উপযুক্ত সেনাপতি নির্বাচিত হয় কুণাল। পাটলিপুত্র যুদ্ধসাজে সজ্জিত হতে থাকে। যুদ্ধ শুরু হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বনাম বৌদ্ধদের। প্রাচীন গৌরবকাল রচয়িতা এই সুযোগে লেখেন, "বিদ্রোহীরা প্রায়ই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। পুরুষাক্রমে তাহারা কখনো রণে ভঙ্গ দেয় নাই। তাহারা যখন অসমসাহসে কুণালের সৈন্য আক্রমণ করিল, তখন বৌদ্ধসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। ...অনেকশত বৌদ্ধ রণে নিহত হইতে লাগল। কিছু পড়ে দৈব বৌদ্ধদের সহায় হইলেন। পশ্চিমাকাশ সহসা গাঢ় নীল হইয়া ভীমবেগে আঁধি উঠিল। ...এই আঁধিতেই হিন্দুকে বরাবর পরাজিত করিয়াছে। নহিলে বুদ্ধি ও ভুজবলে কাহার সাধ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ হয়?"[৭] ভারততত্ত্ববিদ হরপ্রসাদের এই কল্পনাসমৃদ্ধ ও আবেগবহুল বাক্যবিন্যাসে যেন একটি দূরকালের আদিবাঙালির অস্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে।

কল্পনা-সমৃদ্ধ এমন বলার কারণ দুটি। এক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ রূপে যে যুক্তিগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার অন্যতম একটি হল অশোকের সময় নাকি ব্রাহ্মণদের অধিকার হরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে হরপ্রসাদের এই অনুমান ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। উপন্যাসে 'আঁধি'র আবির্ভাব ঘটিয়ে হরপ্রসাদ নিজস্ব যুক্তির সমর্থন করেছেন।

দুই. উপন্যাস রচনার সময় হরপ্রসাদ ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলার ইতিহাসের কোনো বিশেষ পর্বে স্থির থাকেন নি। হিন্দুযুগ, বৌদ্ধযুগ ও মুসলমান যুগ মিলিয়ে এক অখণ্ড প্রবহমান

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চিন্তা তিনি করতেন। এর ফলে সত্য নির্মাণ লক্ষে কিছুটা কল্পনার সাহায্য তাঁকে নিতেই হতো।

কুণালের যুদ্ধে যাওয়ার পর রাজা অশোক গুরুতর অসুস্থ হন। আহার-নিদ্রা ভুলে নিজের শরীর প্রায় ক্ষয় করে তিষ্যরক্ষা তাঁকে সুস্থ করে তোলে। সেই কৃতজ্ঞতাবশে অশোক তিষ্যরক্ষার ইচ্ছানুসারে তাকে একবছরের জন্য পাটালিপুত্র পরিচালনার ভার দেন। ইতিহাসে ছিল মাত্র সাতদিনের সময়। কিন্তু উপন্যাস রচয়িতার বাস্তববোধকে এই সূত্রে প্রশংসা করতে হয়। কারণ এই একটি বছরে নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা উপন্যাসে ঘটে। ক্রোধী ও প্রতিহিংসাপরায়ন তিষ্যরক্ষা কুণালের চোখদুটিকে নিজের করতলগত করে। মৃত্যুপথযাত্রী কুণালকে এসে উদ্ধার করে তার প্রিয়তমা কাঞ্চনমালা। একসময় রাজা তিষ্যরক্ষার প্রকৃত স্বরূপ টের পেয়ে তার শাস্তি ঘোষণা করেন। তিষ্যরক্ষা তখন উন্মাদ। বৌদ্ধ ত্রিরত্নে বিশ্বাসী কাঞ্চনমালা তিষ্যরক্ষাকে ক্ষমা করে ও সেবা করে। কুণাল চোখ ফিরে পায় বিজ্ঞানবিদের সাহায্যে। পরিশেষে সে ও কাঞ্চনমালা সদ্ধর্ম প্রচারে নিজেদের নিয়োজিত করে। এই নাটকীয় গতিযুক্ত উপন্যাসে হরপ্রসাদের রচনারীতি সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। সেই অতিদূর অতীতের তথ্যাদি তেমন সংগ্রহ করা না গেলেও লেখকের কল্পনার ঐশ্বর্যের কারণে এর গল্প প্রায় ইতিহাসনিষ্ঠ হয়েই উঠেছে। এ এক অসাধ্যসাধন কাজ।

হরপ্রসাদ তাঁর 'প্রাচীন বাংলার গৌরব'-এ (১৯১৪, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির সম্বোধন) প্রাচীন বাঙালির কয়েকটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন আর্যরা নাকি হাতি চিনত না, চিনত বাঙালিরাই। বাঙালিরা সেই অতি প্রাচীন যুগে রেশম বস্ত্র বয়ন করত। বাকলের কাপড় পরত, নৌ-চালনায় দক্ষ ছিল এবং নাট্যকলার চর্চা করত।[৮] হাতি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "এই যে হাতি ধরা ও পোষ মানানো, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈয়ার করা—এসব কোথায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। আমরা এখন যে দেশে বাস করি, যাহা আমাদের মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাণ্ড জন্তুকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়।"[৯] হাতির উল্লেখ সমেত বাঙালি সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত সবক'টি বৈশিষ্ট্যই আমাদের আলোচ্য 'কাঞ্চনমালা'-য় আছে। এটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুণাল ও তিষ্যরক্ষা অভিনীত নাটকের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে কুণাল চরিত্রের অনেক গুণের মধ্যে একটি হল তার অভিনয় পটুতা।[১০] অষ্টম পরিচ্ছেদে রয়েছে একটি যুদ্ধ প্রস্তুতির ছবি। "কামারের দোকানে দিবারাত্রি ঠন্ ঠন্ শব্দ হইতে লাগিল; রাশি রাশি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আয়ুধাগারে সংরক্ষিত হইতে লাগিল। বড়ো বড়ো বাঁশ কাটিয়া ধনুক নির্মাণ হইতে লাগিল। মণিপুর, পৌণ্ড্রবর্ধন, অঙ্গ, ওড্র, বিদেহ, সমতট প্রভৃতি করদ রাজগণকে (সুশিক্ষিত) হস্তী প্রেরণের জন্য পত্র লেখা হইল। ...পাটলিপুত্র বন্দরের সমস্ত আহারীয় দ্রব্য যুদ্ধার্থ ক্রীত হইতে লাগল। ...সৈন্যরা নগর প্রান্তরে সর্বদা যুদ্ধ অভ্যাস করিতে লাগিল, তবং যুদ্ধের উপকরণ বহিবার জন্য অযুত সকট ও অযুত নৌকা আনীত হইতে লাগিল।"[১১] এইভাবে পরোক্ষে প্রাচীনকালের বাংলাদেশ গড়তে গড়তে হরপ্রসাদ চতুর্দশ পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণদের প্রতিপক্ষরূপে 'কাছাখোলা' শব্দটি ব্যবহার করেন।[১২] প্রশ্ন জাগে কারা এই 'কাছাখোলা' রা? বৌদ্ধদের সম্পর্কে কখনও কি এই শব্দ ব্যবহার হতো? নাকি পরবর্তীকালের মুসলমানদের সম্পর্কে গ্রাম-জীবনে এই ভাষা ব্যবহৃত হতো?

'কাঞ্চনমালা'-র চতুর্থ ভাগে রয়েছে গঙ্গার প্রসঙ্গ। "মৃদু পবনহিল্লোলে গঙ্গাতরঙ্গ দুলিতেছে ও খেলিতেছে। ...বক্ষস্থলে ছায়াকাশ ধারণ করিয়া গঙ্গাবক্ষ প্রেমভরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তদুপরি ক্ষুদ্র নৌকাসমূহ সারি দিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় যাইতেছে, নাবিকেরা প্রাণ খুলিয়া

CENTRAL LIBRARY

গাইতে গাইতে যাইতেছে, তাহার স্বরের দূরস্থ তরঙ্গ, গঙ্গা সমীরণে শীতল হইয়া মৃদু মৃদু কানে লাগিতেছে।"[১৩] 'স্বরের দূরস্থ তরঙ্গ' নদীবক্ষে, আমাদের কি বাংলার ভাটিয়ালি গান স্মরণ করায়?, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে উন্মাদিনী তিষ্যরক্ষার গানের একটি কলিতে বাঙলার কীর্তনের ভাষার মিল পাওয়া যায়। গানটি হল—'কে নিল নয়নমণি/কহ কহ লো সজনি।[১৪] মনে মনে প্রতিটি চরিত্রের জীবন-যাপনে হরপ্রসাদ অতিদূর বাঙালিদেরই যে এই উপন্যাসে ভেবেছিলেন, একটি প্রসঙ্গে তিনি নিজেই তার সূত্র দিয়েছেন আমাদের। তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখি বিপদগ্রস্থ কুণাল ও কাঞ্চনমালা দুটি ভিন্নস্থানে নীরবে কাঁদছে। কেউ কারো উপস্থিতির কথা জানে না। এমনি সময় প্রণয়ীদের পরস্পরের মনের 'বৈদ্যুতী' (টেলিপ্যাথী) সম্পর্কে উল্লেখের সময় প্রকৃতিতে মিলনোম্মুখ বিষয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক শুরু করলেন 'সেই ঘোরা, দ্বিপ্রহরা শান্তনলিনী, কুমুদগন্ধা..."[১৫] ইত্যাদি শব্দাবলী। এক টান টান গতিময় গদ্যের মধ্যে হঠাৎ এমন সংস্কৃত শব্দ সম্ভারের শোভাযাত্রা দেখে পাঠকবর্গকে চমকে উঠতে হয়ই। এ ব্যাপারে হরপ্রসাদ-পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য জানান যে তিনি হরপ্রসাদ কে এমন 'সাংঘাতিক সংস্কৃতভূয়িষ্ট' ভাষা লিখতে আর দেখেন নি। অক্ষয়চন্দ্র সরকারও সুন্দর ও পরিষ্কার ভাষার মধ্যে এইরকম ভাষার প্রয়োগ দেখে বলেছিলেন, 'একি কক্কড়-কক্কড়-কড়াং'। এই রীতিতে বাংলা 'চূর্ণী' লেখা হত একসময়ে। এর সপক্ষে হরপ্রসাদ জানিয়েছিলেন—"কথকের চূর্ণীগুলিকে আমি বাংলা ভাষার অতুলনীয় সম্পত্তি বলিয়া মনে করি। তাল ও লয়ের সহিত উচ্চারণ করিলে হাজার হাজার লোক মুগ্ধ হইয়া যায় ইহা আমি সচক্ষে দেখিয়াছি।"[১৬]

তিন

'কাঞ্চনমালা' প্রকাশের পর কোনো কারণে গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অভিমানবশত উপন্যাস রচনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন হরপ্রসাদ। এর প্রায় ৩৬ বছর পর তিনি আর একটি উপন্যাস রচনা করলেন। 'বেনের মেয়ে' (১৯২০)। মুখপাত-এ জানালেন 'এটি ইতিহাস নয় সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়।"[১৭] তাঁর মতে এটি সম্পূর্ণত বাংলারই একটি বিশেষ সময়কালের কথাবহ। লেখেন, সে কালে, "বাংলার সব ছিল। বাংলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।"[১৮] আখ্যানের শুরুতেই সময়টাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। "শকাব্দ ৯২২, সংবৎ ১০৫৭, ইস্ বি ১০০০ বৎসর, মাস বৈশাখ, তিথি পূর্ণিমা, জায়গা সাতগাঁ গাজনের ভারী ধুম লাগিয়াছে।"[১৯]

'কাঞ্চনমালা' শেষ হয়েছে মগধ সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে। সেটি ছিল সেই ধর্মের সুবর্ণযুগ। আর 'বেনের মেয়ে'-র কাহিনী শুরু হয়েছে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের পতনকালে। এই পতনের কাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা মত রয়েছে। কেউ বলেন খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে, কেউ বলেন সপ্তম শতকে—কেউ আবার এর উত্থান ও পতন একইকালে ঘটেছিল বলেও ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্য ইতিহাসের দাসত্ব এই উপন্যাস করবে না বলে হরপ্রসাদ নিজেই অঙ্গীকার করেছেন। এমন অঙ্গীকার হয়ত স্বকালের প্রতি অভিমান বশত করেছেন। বলেছেন, "রাখাল, রমেশ—এরা সব পাথুরে প্রমাণ ছাড়া কিছু বিশ্বাস করে না। ঐতিহাসিক তথ্য বের করলেই বলবে প্রমাণ কৈ, প্রমাণ কৈ। এদের জ্বালায় আমি ইতিহাস লেখা ছেড়ে 'বেনের মেয়ে' উপন্যাস লিখতে শুরু করেছি।"[২০] কিন্তু 'বেনের মেয়ে'র সম্পর্কে অতি বিস্তারিত আলোচনা যাঁরা করেছেন যেমন সত্যজিৎ চৌধুরী ও শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার, তাঁরা মনে করেন এটিতে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যত্যয় তেমন কিছু ঘটে নি। বাংলার এই সময়কার ইতিহাস বস্তুত চর্যাপদ আবিষ্কারের আগে

স্পষ্ট ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই ১৯০৭-এ এটি আবিষ্কার করে দীর্ঘ নটি বছর ধরে এর ভাষা, সমাজ ও জীবন নিয়ে গবেষণা করেন এবং ১৯১৬-তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে সেটি 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন।

'বেনের মেয়ে' বাঙালিদেরই গল্প। বণিকশ্রেণী বিহারী দত্ত-র বাস সেকালের সাতগাঁ এবং বর্তমানের মগরা অঞ্চলে। তখন ঐ অঞ্চলের রাজা ছিল রূপা বাগ্‌দি। বৌদ্ধ রূপা রাজা চর্যাকার লুই সিদ্ধার শিষ্য। কাহিনীর শুরুতে আমরা যে গাজনের উল্লেখ পেয়েছি সেটি বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রূপা রাজারই করা আয়োজন। বাঙালীরা মৎসপ্রিয় জাতি। লুই-ও মাছ খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসেন। তাই একটি পূর্ণিমার দিনে মাছ ধরা, মাছ রান্না ও মাছ খাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে এর কাহিনী ঘটনাপ্রবাহে চলা শুরু করে। বিকেলে বের হয় গাজন। সেই গাজনেই প্রথম আমরা বিহারী দত্তের পরমাসুন্দরী কন্যা মায়াকে দেখি। মায়া বিহারীর প্রাণের ধন। সে কালে তেমন সম্ভব ছিল কিনা জানি না কিন্তু কন্যার আবদারে বিহারীকে নদীপথে বাণিজ্যে যেতে হয় সপরিবারে। একটি পৃথক নৌকায় বিহারীর পরিবারের অবস্থান। নৌকো একটি চরে এলে মায়া সেখানে নামে এবং বাঘের মুখে পড়ে। হঠাৎ-ই সেখানে আবির্ভূত হয় বিহারীর পাল্টি ঘরের একটি ১৮/১৯ বছরের ছেলে জীবন, যে সাতগাঁয়েরই আর এক প্রসিদ্ধ ধনবান সাধু-ধনীর একমাত্র পুত্র। সে বাঘের মুখ থেকে মায়াকে রক্ষা করে। মুগ্ধ মায়া তাকেই বিয়ে করবে বলে পণ করে এবং এই বিয়ে হয়েও যায়। কিন্তু বছর দুইবাদে নিঃসন্তান মায়া বিধবা হয়।

কাহিনীর জটিলতা শুরু এখান থেকেই। উত্তরাধিকারীহীন বিহারী ও মায়ার সম্পত্তির উপর বৌদ্ধদের নজর পড়ে। বিহারী সর্তক হয়। এদিকে লুইসিদ্ধার গুরুপুত্র নামে অতি গুণবান ও সুদেহী এক শিষ্য মায়ার প্রেমে পড়ে। কিন্তু মায়া সে সম্বন্ধে সচেতন নয়। সে তার স্বামীর ধ্যানে মগ্ন। বৌদ্ধরা মস্করী নামে এক বিচিত্র স্বভাবের মানুষকে মায়াকে হরণ করার কাজে লাগায়। সে সেইমতো মায়ার স্বামীর মৃন্ময়মূর্তি গড়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে বলে মায়াকে প্রলোভন দেখায়। মায়া স্বামীকে অন্তত পরোক্ষে পাবে বলে এই টোপে পা দেয়। তারপর বিহারীর অবর্তমানে মায়াকে তার ধাই-সহ মস্করী সাতগাঁ থেকে ৭/৮ ক্রোশ দূরে এক মন্দিরে এনে তোলে।

এদিকে মায়ার অন্তর্ধানে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে রূপা রাজার মৃত্যু হয় ও বিহারীই সাতগাঁর রাজা হয়। এরপর অদ্ভুতভাবে মস্করী চরিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। সে এক শিল্পীকে দিয়ে মায়ার স্বামীর মূর্তি গড়ে ও তন্ত্রমতে এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে তাকে কথাও বলায়। মায়া স্বামীর মৃন্ময় মূর্তি নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। মায়ার প্রত্যাবর্তনে বিহারী প্রাণ ফিরে পায়। এরপর বিপুল সমারোহ করে পিতা ও পুত্রী পৃথকভাবে দুটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য সম্পত্তি রক্ষা করা। পরিবর্তিত মস্করী এইবার বাঙালি হিন্দু রাজার রাজ্যে কাব্য, শিল্প ও সংস্কৃতির এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এরজন্য দেশ বিদেশে ঘুরে সে বিদগ্ধ পণ্ডিত, কবি ও শিল্পীদের আহ্বান করে। এরমধ্যে সে জানতে পারে যে ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমান্ত দিয়ে বহিরাগত মুসলমানরা আক্রমণ করেছে। বাংলাদেশে সে ঢেউ তখনও এসে পৌঁছয় নি। তাই এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সেই প্রতিযোগিতার জন্য দেশ দেশান্তর থেকে এসে প্রতিযোগীরা পৌঁছয় সাতগাঁয়ে। বিহারী দত্ত ভারী গর্ববোধ করে। নানা প্রকার শিল্প প্রতিযোগিতার পর শেষে শুরু হয় কাব্য প্রতিযোগিতা। সেই আসরে এক এক করে কবিতা পড়েন চাটিলপাদ, বীণাপাদ ও সরহপাদের মত চর্যাপদের কবিরা। এরপর মায়া কবিতা পড়ে। সে কবিতায় তার স্বামীর প্রতি বিরহবেদনা ধ্বনিত হয়। সকলে এমন বিদূষী বাঙালি নারীর পরিচয় পেয়ে ধন্য ধন্য করে। শেষে আসরে এল গুরুপুত্র। চর্যাপদের ভাষায় সেও একটি কবিতা পড়ল। কিন্তু সভার কারো বুঝতে বাকী রইল না যে তার

CENTRAL LIBRARY

কবিতার উদ্দিষ্ট নারীটি মায়া-ই। সে তাকে তার তৃষ্ণার জল বলে জানায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর এমন নির্লজ্জ প্রেমপ্রকাশে সভা একই সঙ্গে স্তব্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়। মায়া মাথা নত করে এবং গুরুদেব লুই সিদ্ধার পরামর্শে একবুক বেদনাবহন করে গুরুপুত্র আত্মরক্ষার্থে দেশান্তরী হয়।

সময়ের দিক থেকে এটি মুসলমান অধিকারের ঠিক আগের যুগের। চর্যাপদ আবিষ্কারের পর বাংলা সাহিত্যের আদি যুগটিকে যখন আবিষ্কার করা গেল তখন স্বভাবতই গবেষকদের মনে সেকালের বাঙালি-সমাজভাবনা জাগবে। কাহিনীর শুরু ৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আর শেষ একাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই। অর্থাৎ কুড়ি বছরের ইতিহাস এটি। এই প্রায় দুই দশকে সমাজে ধর্মীয় দিক থেকে হঠাৎ করে কোনো বড় পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু হরপ্রসাদ যে ভাবে এর গল্প বিন্যস্ত করেছেন তাতে বৌদ্ধধর্মের পতন ও হিন্দুধর্মের উত্থান যেন এরই মধ্যে ঘটেছে বলে বোধ হয়। সমাজতত্ত্ববিদেরা এত দ্রুত এই পরিবর্তন মেনে নেন নি। মানে নি ইতিহাসও। কিন্তু হরপ্রসাদের মত এমন যুক্তিনিষ্ঠ বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ বিচারবোধ সম্পন্ন মানুষ ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ বাদ দিয়ে 'উপন্যাস' লেখবার সময় এমন কাণ্ডটি করলেন কেন? এই জিজ্ঞাসার একমাত্র উত্তর সম্ভবত তাঁর বাঙালিপ্রীতি। 'প্রাচীন বাংলায় বাঙালির সব ছিল'। আঠেরোটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত বিপুলাকায় এই কাহিনীর পরতে পরতে রয়েছে সেইসব গৌরবের কথা।

প্রথম লুই সিদ্ধার কথাই ধরা যাক। লুই-এর জীবৎকাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে বির্তক আছে। মহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে সিদ্ধাচার্যরা সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে জন্মেছিলেন। আবার কেউ বলেছেন তিনি একাদশ শতকের প্রথম ভাগে জন্মেছিলেন। হরপ্রসাদও নিশ্চিত ছিলেন যে লুই একাদশ শতকেরই মানুষ ছিলেন। তিনি জানান "তেঙ্গুরে বাঙালি বলিয়াই তাঁহার (লুই-এর) উল্লেখ আছে। ...তিনি এক নূতন সম্প্রদায় চালাইয়া যান। ...তিনি যে বাঙালি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সংস্কৃতে তাঁহার চারিখানি পুস্তক আছে। একখানি 'বজ্রসাধন'। এখানি পুরুতের পুথি।"[২১] সত্যজিৎ চৌধুরী জানাচ্ছেন তিব্বতি ভাষায় রচিত এই বইটির সঙ্গে লুই-এর আরো যে চারটি বই পাওয়া যায় তার একটির নাম 'অভিসময়াবিভঙ্গ'। এটির তিব্বতি অনুবাদে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম আছে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম ৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে। ফলে এই সূত্রে একাদশ শতকের প্রথমার্ধে লুই বর্তমান ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।[২২] লুই-এর প্রকৃত নাম মৎস্যান্ত্রাদ। হরপ্রসাদ এই নামের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন "অর্থাৎ তিনি মাছের পোঁটা খাইতে ভালোবাসতেন। (কোন বাঙালিই না বাসেন!)।"[২৩]

'বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধটিতে হরপ্রসাদ গুপ্ত উপাধীধারী লোকেদের বৌদ্ধগ্রন্থ লেখার কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সূত্রে অভয়াকর গুপ্ত নামে একজন পরম পণ্ডিতের উল্লেখ করেন। এই অভয়াকর নবম শতকের মানুষ। অন্যমতে তিনি একাদশ শতকেরও হতে পারেন।[২৪] ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। হরপ্রসাদের মতে সে সময় বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের দলে টানতে পারলে খুশী হতেন। কারণ এঁদের দিয়ে সংস্কৃত বই লিখিয়ে নিতে সুবিধা হতো। সে সময় শুভাকর গুপ্ত[২৫] নামে আর একটি ব্যক্তিও ছিলেন খুব উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, বণিকদের তো কথাই নাই। ইঁহারাই বৌদ্ধভিক্ষুদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের অনেক খরচ চালাইতেন।"[২৬] 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে রূপা রাজার পুরোহিত সাধুগুপ্তর[২৭] উল্লেখ আছে। আমরা এর আগে জেনেছি যে বাঙালি লুই-এর পুরোহিততন্ত্রের উপর লেখা গ্রন্থের কথা। এছাড়া বণিক বিহারী দত্ত নিজ ক্ষমতায় প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়ে বৌদ্ধদের নানা ভাবে সাহায্য করতেন। "বিহারীর বৌদ্ধধর্মের দিকেই টান বেশি ছিল।"[২৮]

সেকালে বাঙালিদের আর একটি উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটি হল মূর্তি প্রতিষ্ঠা

করা। তারা মৃৎশিল্পী হিসেবেও ছিল বেশ দক্ষ।[২৯] এ সম্পর্কে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, "An old tibetan tradition decleres that in the matter of art Bangal comes first, Nepal secend while the tibetan and chinese are the worst."[৩০] আদিতে বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ থাকলেও বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয়তার অভিলাষে সেকালের লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এক ধরণের সমঝোতা তৈরী করে নিয়েছিল। এই কারণে বৌদ্ধধর্মেই অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং সমাজে তাই মূর্তিশিল্পেরও চাহিদা ছিল। 'বেনের মেয়ে'তে মায়ার স্বামীর মূর্তিগড়া একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি গোপনে করতে গিয়ে মায়ার জন্যই বলা যায় ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের যুদ্ধ (ট্রয়ের যুদ্ধের হেলেন!) হয়। কিন্তু এই মূর্তি তৈরী সূত্রেই বোঝা যায় সেকালে তন্ত্রাশ্রিত মূর্তি কেমন শিল্পের মর্যাদা পেয়েছিল। মূর্তি গড়ার পর এক ব্রাহ্মণ তন্ত্রমতে সেটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, "ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং"[৩১] —ইত্যাদিতে।

এইখানে আমরা পুরোনো বাংলাদেশ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে হরপ্রসাদের সমকালের বাংলাসাহিত্যের দিকে একটু তাকাই। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একটা বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছে তন্ত্রাশ্রিত সাহিত্যাদি। যা সমাজজীবনে প্রচলিত ধর্মেরই প্রতিফলন। হরপ্রসাদের ফ্রেন্ড, ফিলজফার এবং গাইড বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা'-তে এক কাপালিক ও এক অরণ্যচারিনী শুদ্ধা চরিত্রের কন্যার গল্প বিশেষ শিল্পমাত্রা পেয়েছে। তাই একাদশ শতকে বৌদ্ধতান্ত্রিকাকরণ ইতিহাসসম্মত হলেও হরপ্রসাদ উপন্যাসের পটে সেকালের অতি ঘরোয়া এক বাঙালি কন্যাকে মূর্তির কারণে কিছুকাল অন্তর্ধান করিয়ে রেখে এবং সন্ন্যাসী ও তন্ত্রাদির অবতারণা করেও তাকে শুদ্ধা পবিত্র চরিত্র হিসেবে রেখেছেন। তবে 'কপালকুণ্ডলা'র সৃষ্টিগুণে তা যেমন স্বাভাবিক হয়েছে, মায়ার ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। যত সহজে মায়ার যাওয়া তত সহজেই মায়ার ফিরে আসা এবং সমাজে তার পূর্বাবস্থানও তত সহজেই ফিরে পাওয়া কিছুটা বাস্তবতা বিরোধী বলে মনে হয়। অথচ এরই উপর যুদ্ধ এবং একটি ধর্মের পতনের মত বড় ঘটনা দাঁড়িয়ে আছে। অন্য আর একটি প্রভাবের কথাও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনে পড়ে। মায়ার স্বামীর মৃন্ময়মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর মূর্তিটি কথা বলে উঠেছে। "তবে যেন একটু নাকি সুরে কাহিল।"[৩২] মনে পড়ে 'বেনের মেয়ে'-র বহু আগে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বিসর্জন' নাটকটির কথা। সেখানেও পুরোহিত রঘুপতির কার্যকলাপে মৃন্ময় মূর্তিটি কথা বলে উঠেছিল। অবশ্য যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হরপ্রসাদ এখানে 'যেন' শব্দের অবতারণা করে সেটির অলৌকিকতাকে ভেঙে দিয়েছেন, যেমন ভেঙেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার দেবনির্ভর সাহিত্যে অলৌকিকতা ছিল অন্যতম উপাদান। উপন্যাস একালের শিল্পবস্তু। তাই বাস্তবতার নিরিখে হরপ্রসাদ সঙ্গত কারণেই তা বর্জন করলেও এতে সেকালের মানুষের মনোজগতের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় নি।

হরপ্রসাদ প্রাচীন বাঙালিদের গৌরবের কথা বলতে গিয়ে তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের উপর জোর দিয়েছেন বেশী। কিন্তু নীহাররঞ্জন রায়ের মতে "অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলায় এবং উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্য-স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া যায় এবং বাঙালিজীবন আবার কৃষিনির্ভর হইয়া পড়ে।"[৩৩] কিন্তু হরপ্রসাদের বিশ্বাসের মূলে ছিল সর্ব বিষয়ে বাঙালির সাফল্যের কথা। শুধু বিহারী দত্ত নয় এই উপন্যাসে জীবনধনীর মত আরো অনেকে ব্যবসায় খুব সফল ছিল বলেই হরপ্রসাদ জানিয়েছেন।

'বেনের মেয়ে'র নায়িকা মায়া চিরকালের নিষ্টাবান বাঙালি ঘরের কন্যা। সে বিধবা। তাই তার অপরূপ কেশরাশি ছেঁটে ফেলতে হয়েছে। সে খুবই রূপবতী। তাকে নিয়ে উপন্যাসের নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষে এর সঙ্গে তার মনের কোন যোগ না থাকায় যাকে

CENTRAL LIBRARY

নিয়ে উপন্যাসের নামকরণ সেই থেকে যায় নিরক্ত আগাগোড়া। তার নিয়মনিষ্ঠার প্রতি আনুগত্য ও অবিচল পতিব্রতার রূপটি সম্ভবত হরপ্রসাদের নিজস্ব জীবনযাপন ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিভূ। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথায় জানাচ্ছেন "তিনি (হরপ্রসাদ) বলতেন, "হিন্দুর আচারগুলি মেনে চলা উচিত, তা না হলে হিন্দুর বিশেষত্ব থাকে না।"[৩৪] অন্যান্যদের লেখা হরপ্রসাদের জীবনীসূত্রেও জানা যায় যে ব্যক্তিগতজীবনে তিনি বেশ আচারনিষ্ঠ ছিলেন। আচমন না করে খাবার গ্রহণ করতেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতিদের স্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ছিলেন উদারপন্থী, পরমত ও পরধর্মসহিষ্ণু।

বিধবা মায়াকে ধর্মকথা ও গান (চর্যার) শোনাতে আসত সেকালের কয়েকটি ভিখারিনী। এরা খঞ্জনি বাজিয়ে গাইত ও নাচত। এই ছবিও আমাদের অপরিচিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ, রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র'-এ, 'গোরা'-য় ও শরৎচন্দ্রের নানা উপন্যাসে ভিখারীদের গান, বাউলানীদের গৃহস্থ ঘরে গান শোনানোর কথা আছে। যে যুগে সমাজে এর চল ছিল। হরপ্রসাদ বাঙালিদের গানে এই ধর্ম ও হৃদয়ের কথা ব্যক্তিগতভাবে নিজেও শুনতে খুব ভালবাসতেন।[৩৫] এই ধরনের লোকসঙ্গীত শুধু নয়, বাঙালির হৃদয়ের ধন ছড়া ও গীতের প্রতিও হরপ্রসাদের সমধিক আকর্ষণ ছিল। ছড়া ও গীতের উৎস আদি বাঙালি সমাজে। তবে কালে কালে যে সেগুলি শব্দ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে এমন একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোনও তাঁর ছিল।[৩৬] কিন্তু 'বেনের মেয়ে'-তে যে ছড়াটি তিনি ব্যবহার করলেন সেটির কাল প্রাচীন নয়। এগার পরিচ্ছেদে যুদ্ধ যাত্রার সময় একটি 'গান উঠিল'—

"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে
ডাল মৃগল ঘাঘর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো সাড়া
সাড়া গেল বামন্‌পাড়া।"[৩৭]

উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধে এই ছড়াটির আরো চারটি পৃথক পাঠান্তর সংগ্রহ করেছিলেন।[৩৮] এখানে 'বামন্‌পাড়া' হরপ্রসাদের সংযোজন। ব্রাহ্মণদের জয়গাথার জন্য, "ডোমদের সাড়া বামুনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।"[৩৯] ১৯২৩-এ প্রাচী পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডাক ও খনা' প্রবন্ধটিতে হরপ্রসাদ জানাচ্ছেন, "বজ্রডাক হেরুকতন্ত্র প্রভৃতি বৌদ্ধদের তন্ত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে চলিত ভাষায় গান ও ছড়া পাওয়া যায়।"[৪০] অবশ্য এটির ব্যবহারে তিনি ইতিহাসের শূন্যতা পূর্ণ করেছেন।

গৌরবান্বিত বাঙালির ঐশ্বর্যের চূড়ান্ত পরিচয় বহন করছে 'বেনের মেয়ে'-র শেষ পরিচ্ছেদটি। এক্ষেত্রে লেখক কোনো আপসে যান নি। তা নইলে সমাজে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম হীনবল হয়ে পড়তে থাকে তখন শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির এমন উদ্ভাসন কি করে সম্ভব!

এই শেষপর্বে মস্করী চরিত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই চরিত্রটি নিয়ে হরপ্রসাদ দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। এটি 'কখনো সন্ন্যাসীর বেশ, কখনো রাজার বেশ, কখনো ব্রাহ্মণের বেশ, কখনো চন্ডালের বেশ, কখনো পাগলের বেশ, কখনো ডাকাতের বেশ।"[৪১] (কিছুটা কি ভবানী পাঠক?) ধারণ করত। প্রথমে চরিত্রটিকে সন্দেহজনক কুচক্রী মনে হয়েছিল। পরে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিত একটি বাঙালি ব্রাহ্মণ চরিত্রই হয়ে ওঠে সে। 'বেনের মেয়ে' রচনার পরে হরপ্রসাদ একাদশ শতকের 'বৃহস্পতি রায়মুকুট'[৪২] নামে একটি উল্লেখযোগ্য বাঙালি চরিত্রের কথা লেখেন। এঁর সম্পর্কে গবেষণা অবশ্য তিনি আগেই করেছিলেন। এই মস্করী চরিত্রটি মনে হয় অনেকটা তাঁর মতো। বৃহস্পতি রায়মুকুট ছিলেন মহিন্তা গ্রামের অধিবাসী। তাঁকে বৃহস্পতি মহিন্তাও বলা হত। তিনি

শুধু বাঙালি ছিলেন না বিদগ্ধ পণ্ডিতও ছিলেন। তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর সংস্কৃতি জ্ঞান ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। তিনি পূজা পার্বন, শ্রাদ্ধ ও শাস্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 'বেনের মেয়ে'-র মস্করীর আসল নাম ভবতারণ পিশাচখণ্ডী। "মস্করী পণ্ডিতও খুব ভালো, শাস্ত্র ও কাব্য দুয়েতেই তাঁহার প্রগাঢ় বুৎপত্তি। তাহার উপর নাচ-গান, এমন কি চৌষট্টি কলায় তাঁহার মতো নিপুণ লোক খুব কমই দেখা যাইত। তবে তিনি কিছু শ্রাদ্ধানন্দী।"[৪৩]

বৌদ্ধরাজাকে হারিয়ে বাঙালি হিন্দুরাজা বিহারী দত্তের রাজত্ব লাভের পর মস্করী তার কাজের পুরস্কার স্বরূপ রাজার কাছ থেকে একটি প্রতিদ্বন্দিতা-মূলক শিল্প ও কাব্যচর্চার আয়োজনের অনুমতি পায়। তারপর একবছর সে দেশ-দেশান্তর পরিক্রমা করে সেই প্রতিযোগীদের সংগ্রহ করে ও আহ্বান জানায়। এক পূর্ণিমায় এই গল্প শুরু হয়েছিল, আর এক পূর্ণিমায় এর কথা শেষ, হতে থাকে। সেই দিনই প্রতিযোগিতার জন্য দেশ বিদেশ থেকে সাত গাঁয় প্রতিযোগীরা এসে উপস্থিত হয়। রাজা একে একে বস্ত্রশিল্প, মূর্তিশিল্প, হস্তশিল্প ও সঙ্গীতশিল্প উপভোগ করলেন ও গুণীদের পুরস্কৃত করলেন। মস্করী দেশান্তর থাকতেই শুনেছিল যে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে মুসলমানরা প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। সে বড় দুযোর্গের সময়। তবে বাংলাদেশ তো অনেক দূরে। তাই শেষ আয়োজন কাব্যসভায় বাঙালির আধিপত্য ঘটে অনায়াসেই। চর্যায় যে সব বাঙালি কবিদের নাম পাই এ সভা তাঁরাই উজ্জ্বল করেছেন। প্রথম এলেন চাটিলপাদ। বিশেষ এক বাক্‌ভঙ্গিতে পড়লেন—

> "ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
> দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ না যাহী।।"[৪৪]

চাটিলের নাম তেঙ্গুরে নেই। তবু তার রচনার মধ্যে হরপ্রসাদের গবেষণানুযায়ী "১১টি সংস্কৃত, ৮টি সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন, ২টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ আছে।"[৪৫] এলেন বীণাপাদ। পড়লেন,

> সূজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
> অণহা দান্তী বাকী কি অত অবধূতী।"[৪৬]

তারপর বাঙালি বিদূষী কন্যা মায়ার কবিতা পাঠ। সব শেষে এল মায়ার প্রতি আসক্ত বৌদ্ধসন্ন্যাসী গুরুপুত্র।

চর্যাপদগুলি সাহিত্যচর্চার জন্য সৃষ্টি হয়নি। বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরা কেবলমাত্র অধিকারী শিষ্যদের জন্যই এসব ধর্মকথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তবু আমরা এই সংকেতধর্মী ভাষাগুলি থেকেও সেকালের সমাজব্যবস্থার একটা আবছা ছবি পাই। হরপ্রসাদ মূলত তার উপর নির্ভর করেই একটি পরিপূর্ণ বাঙালিজীবনের কল্পনা করেছেন এই 'বেনের মেয়ে'তে। কিন্তু সে কোন কালের বাঙালিজীবন? এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয় গুরুপুত্রের চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে।

গুরুপুত্রের চেহারাটি রাজপুত্রের মতো। সে বৌদ্ধভিক্ষুদের পোযাকই পরেছে। তবে সে পোযাক সব রেশমের তৈরী। তার আঁচলায় এবং পাড়ে সাল্‌মাচুমকির কাজ করা। তার আগমন ও প্রথমে করা তথাগতের স্তোত্রপাঠ সভায় বিশেষ মাত্রা এনে দেয়। সে তার সরু এবং সুরেলা গলায় এবার একটি গান ধরল—

> "বহই নারী মাঝ সমুদারে, দুপ্পহর বেলা,
> দারুণ পিআসা, হিঅ মোর বাধই, কণ্ঠ শোয গেলা।
> জেইনি সাধী রহই, বিমুহি মোরে, নাহি পাতআই।
> নঅনের কোণে কভু নহি হেরই, বিনু ফল মোর জনু জাই।"[৪৭]

মাছ সমুদ্রে নৌকায় বসে আছি, দুপুর বেলা, পিপাসায় হৃদয় পূর্ণ কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু উপায় নেই এ তৃষ্ণা মেটবার। সামনেই আছে যাকে শক্তি করতে চাই। কিন্তু সে ফিরেও তাকায় না। জীবন বৃথা যায়।

মায়া ও গুরুপুত্র দুজনেরই কবিতা হরপ্রসাদরচিত। আমাদের মনে পড়বে যে বৈষ্ণবপদাবলীর শব্দ লালিত্য ও শব্দঝঙ্কার রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঐ ভাষায় লিখেছিলেন ভানুসিংহের পদাবলী। হরপ্রসাদ-ও চর্যাপদের ভাষার ভক্ত। চর্যার ভাষাগুলি বাঙলা বলেই তিনি নিশ্চিত[৪৮] ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর গবেষণার গুরুত্ব বাঙলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসবিদরা জানেন। তাই তাঁর পক্ষে অনায়াসে এ ভাষা সৃষ্টি করা সহজ হয়েছে। তবে একেবারে নিঁখুত সেকালের ভাষা রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি হয়তো বা সেই অর্থে তিনি কবি ছিলেন না বলেই। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়কে ভেঙে তিনি যে কালের প্রভাব গুরুপুত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন সেটি সম্পূর্ণত তার নিজকালের। এক্ষেত্রে বলে নেওয়া ভাল যে গুরুপুত্র চরিত্রটির কল্পনার বীজ কিন্তু সেই আদিকালের গুরু লুই-এর এক শিষ্য দারিকের মধ্যে রয়েছে। যিনি সিদ্ধাচার্য ছিলেন কিন্তু একবারে সিদ্ধি লাভ করেন নি। 'বেনের মেয়ে'তে গুরুপুত্রও একবারে সিদ্ধিলাভ করে নি। সিদ্ধাচার্য করবেন বলেই হয়তো মায়ার প্রতি এই চরিত্রটি গোপন প্রেম বহন করলেও তাকে কখনও অসংযমী করে তোলেন নি হরপ্রসাদ। বরঞ্চ উপন্যাসে বরাবরই এই চরিত্রটি অতিশীল, সংযমী ও সুমন বলেই পরিচিত। গুরুপুত্র সন্ন্যাসী। মায়ার প্রতি প্রেম নিবেদনে সভাস্থ লোকেরা স্তম্ভিত হয়েছে কিন্তু তাকে তিরস্কৃত না করে পুরষ্কৃতই করা হয়েছে। শেষে গুরু লুইপাদের পরামর্শে সে দেশ ত্যাগ করেছে। ইঙ্গিতে বৌদ্ধধর্মের পতনের এও একটি কারণ রচনা করে হরপ্রসাদ কেন তার প্রতি কঠোর হতে পারলেন না? কারণ কি তাঁর বৌদ্ধপ্রীতি? না একটি অতি গুণান্বিত ও সুন্দর বাঙালি যুবকের এই কামনাকে প্রকৃতপক্ষে তিনি অসমর্থন করতে পারেন নি? আর তাই কি একজায়গায় মায়ার প্রতি গুরুপুত্রের প্রেমকে তিনি এই ভাষায় ব্যক্ত করেছেন? "এ মুখ আমার মনে পড়ে কেন? আর মনে পড়িলেই এত আনন্দ হয় কেন? আনন্দ না হইলেই বা সে মুখখানি দেখিবার জন্য এত অধীর হই কেন? ....যে মুখ আমার হৃদয়ে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি কেন মহা-সুখসমাধিতে ডুবিয়া যাই না। ...সেই মুখই ধ্যান করিব, সেই মুখখানি লইয়াই থাকিব।"[৪৯]

প্রিয়ার মুখখানিই যে দেবীর মুখ হয়ে উঠতে পারে তা রবীন্দ্র অনুভবে অনেক আগেই ধরা পড়েছিল। তাই তাঁর সাধক-কবিদের কাছেই ছিল জিজ্ঞাসা—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান
সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
...এত প্রেম কথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ কার
আঁখি হতে।"[৫০]

হরপ্রসাদ কি এই মত্যে প্রভাবিত হয়েছিলেন? তাই কি গুরুপুত্র চরিত্রসৃষ্টিতে ছিল তাঁর এত দ্বিধা! কিন্তু এর ফলে যেমন ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ-জাত চিরকালীন রোমান্টিক বাঙালি প্রেমিক সত্তার নির্ঝরিনীটির পরিচয় পাওয়া গেল, তেমনি ভারততত্ত্ববিদ্, ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক ও সুকঠিন গবেষক হরপ্রসাদের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা একটি আদ্যন্ত রোমান্টিক বাঙালির পরিচয়ও আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হল।

তথ্যসূচী :

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ—খণ্ড ৩, সম্পাদনা সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ প. বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ: ৬০১-৬০৩।

২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ—সম্পা: সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ, সান্যাল প্রকা. পৃ ১৮২।

৩। ঐ, পৃ: ২৬১।

৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ—খণ্ড ৩, সম্পা: সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ, প. বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ: ৫৭৬-৫৭৭।

৫। সুশীলকুমার দে, হরপ্রসাদ রচনাবলী—খণ্ড ২, ইস্টার্ন ট্রেডিং কোং, ভূমিকা।

৬। শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ১০৩।

৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ—খণ্ড ১, সম্পাদনা, সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ, প. বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

৮। ঐ, খণ্ড ৪, সম্পাদনা, সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ, প. বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ। পৃ. ১৫২-১৭৩।

৯। ঐ, পৃ: ১৫৫।

১০। ঐ, খণ্ড ১, পৃ. ৯৫।

১১। ঐ, পৃ. ১৪০।

১২। ঐ, পৃ. ১৮৩।

১৩। ঐ, পৃ. ৮৫-৮৬।

১৪। ঐ, পৃ. ১৮৪।

১৫। ঐ, পৃ. ১০৪।

১৬। ঐ, পৃ. ১৯১।

১৭। ঐ, পৃ. ১৯৮।

১৮। ঐ, পৃ. ১৯৮।

১৯। ঐ, পৃ. ১৯৯।

২০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ, সম্পা: সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ, সান্যাল প্রকাশন, পৃ. ১০৭-১০৮।

২১। হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা—সম্পা: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ. ২১।

২২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ খণ্ড ১, সম্পাদনা, সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ, প. বঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পরিষদ, পৃ. ৩৯২-৩৯৩।

২৩। ঐ, খণ্ড ৪, পৃ. ১৮৪।

২৪। ঐ, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৮৯।

২৫। ঐ।

২৬। ঐ।

২৭। ঐ, খণ্ড ১, পৃ. ২১৪।

২৮। ঐ, পৃ. ২২২।

২৯। ঐ, পৃ. ২৯৮।

৩০। Bineythosh Bhattacharya, The Indian Buddhist Iconography, Calcutta, 1968, P. 6.

৩১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ১, সম্পাদনা, সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ, প. বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ: ৩০০।

CENTRAL LIBRARY

৩২। ঐ, পৃ. ৩০১।

৩৩। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) জ্যোৎস্না সিংহ রায় কর্তৃক সংক্ষেপিত লেখক-সমবায় সমিতি, পৃ. ৮৪২।

৩৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মরকগ্রন্থ, সম্পা: সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ, সান্যাল প্রকাশন, পৃ. ১৩১-১৩২।

৩৫। ঐ, পৃ. ৩৪৮।

৩৬। হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলকাতা, পৃ. ২৪১।

৩৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ১, সম্পা: সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ প. বঙ্গ রাজ্য পুস্ত পর্ষদ, পৃ. ২৯৪।

৩৮। রবীন্দ্র রচনাবলী, প. বঙ্গ সরকার, জন্ম শতবার্ষিকী সং, খণ্ড ১৩, পৃ. ৬৯০-৬৯১।

৩৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ১, সম্পা: সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ, প. বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ২৯৪।

৪০। ঐ, খণ্ড ২, পৃ. ৭৫৪।

৪১। ঐ, খণ্ড ১, পৃ. ২৭৫।

৪২। ঐ, খণ্ড ৩, পৃ. ৯৩-১০৪।

৪৩। ঐ, খণ্ড ১, পৃ. ৩১৯।

৪৪। ঐ, পৃ. ৩৮৪।

৪৫। হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, সম্পা. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ২৯।

৪৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ, খণ্ড ১, সম্পা: সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ, প. বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৩৮৫।

৪৭। ঐ, পৃ. ৩৮৭।

৪৮। হাজার বছরের পুরান বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, সম্পা: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৬।

৪৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ, খণ্ড ১, সম্পা: সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ, প: বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ পৃ. ২৭২।

৫০। রবীন্দ্ররচনাবলী, প. বঙ্গ, সরকার, জন্মশতবার্ষিকী সং, খণ্ড ১, পৃ. ৩৬৮।

CENTRAL LIBRARY

বাল্মীকির জয়—সমকালীন ন্যারেটোলজির নিরিখে একটি আলোচনা

রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমরা এই প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা *বাল্মীকির জয়* নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি। টেক্সটটা অর্থাৎ 'বাল্মিকীর জয়' নামকরণের পরে যা লেখা আছে সেটা টেক্সট। আর বাকি সবকিছু অর্থাৎ বইটার মলাট, বইটা কী কাগজে ছাপা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি প্যারাটেক্সট। প্যারাটেক্সট টেক্সটের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। প্যারাটেক্সট সব সময়ই বইটা সম্পর্কে একটা প্রত্যাশা দেয়। পাঠকের প্রত্যাশার সঙ্গে টেক্সট যদি না মেলে তাহলেই *element of surprise* থাকে।

আমরা 'বাল্মীকির জয়' নামটিকে এখানে টেক্সট হিসেবে ধরছি।

প্রশ্ন আসে বাল্মীকি আবার জিতল কবে? সীতাকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় বাল্মীকি একবার রামের কাছে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'রাম, সীতা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। আমার এই কথার জন্যে আমি আমার সারা জীবনের তপস্যাকে *stake* করতে পারি। রাম বাল্মীকির সেকথা কানেই নেন নি, সীতাকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এটা বাল্মীকির বড় হার। বাল্মীকি তো হেরেই গেছেন, জিতলেন কবে?

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসছি।

একদিকে সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, একদিকে পর্বতশ্রেণীর পর পর্বতশ্রেণী, তাহার পর পর্বতশ্রেণী, তাহার পরে—কতো পরে বরফের পাহাড় দেখিয়াছ কি।

এই একটি বাক্য নিয়ে কত কথাই না বলা যায়। নিখাদে ওস্তাদ গলা লাগালেই আমরা বুঝি 'আসে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার কবরী খসা' (রাগ ইমন)

তাই একদিকে এই প্রথম শব্দটাই আমাদের বোঝায় আর একদিকে, একদিকে শতযোজনব্যাপী মাঠ একদিকে পর্বতশ্রেণীর পর পর্বতশ্রেণী। কিন্তু এতেও তৃপ্তি হয় না। *সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী* মাঠের ন্যায়, শব্দবন্ধটির কোন একটি ধ্বনিও যেন বাদ দিতে ইচ্ছে করে না। কারণ এর আড়ালে অনুপ্রাসের ইঙ্গিত। শিল্পী যেন নানা শ্রুতি ছুঁয়ে যান, *স্থান* এবং *শত* এই দুটির মধ্যে তো অনুপ্রাস হলই, কিন্তু আবার স, শ ও হ এর মধ্যে অনুপ্রাস আছে। কারণ এরা অন্তঃস্থ বর্ণ। একাধিক দন্ত্য ন আছেই কিন্তু দন্ত্য ন এবং ম এর মধ্যেও গোপনে অনুপ্রাস রয়েছে। দুটিই অনুনাসিক বর্ণ। শুধু তাই নয়, *সমস্ত হিন্দুস্থান* যুক্ত অক্ষরের কৃপায় পাহাড়ের মতো উচ্চাবচ আর তারপরেই মাঠ একদম *flat land. Contrast* দিয়ে শিল্পী ছবি আঁকেন। হঠাৎ তারা থেকে মুদারায় নিয়ে শিল্পী শ্রোতাদের মেরুদণ্ডকে সোজা করে দেন। কুলকুণ্ডলিনীর পথ শ্রোতাদের অজান্তেই প্রশস্ত সরণী হয়ে যায়। পর্বতশ্রেণীর পর পর্বতশ্রেণী তারপর কতো বরফের পাহাড়, যেন এর শেষ নেই। শিল্প এই ধরনের *fine excess* দিয়েই পাঠককে মুগ্ধ করে। প্রথম বাক্যটি সোজাসুজি পাঠককে প্রশ্ন করছে। অর্থাৎ এর মধ্যে কোন ভনিতা নেই। লেখক পাঠকের কাছে বিনা ভনিতাতেই এসে পড়ছেন। কত অন্তরঙ্গতা।

প্রথম বাক্যের শেষ দুটি শব্দ হল *দেখিয়াছ কি?* অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখের ওপর বেশী জোর দেওয়া হল। শব্দ দিয়ে পর্বতশ্রেণীর পর পর্বতশ্রেণী, তারপরে বরফের পাহাড় লেখক তৈরী করলেন। আমরা তাকিয়ে দেখছি। দৃশ্য না থাকলে চোখ থাকে না। লেখকের *word painting* আমাদের মনে চোখকে সজাগ করে দেয়। সাহিত্যের কাজই তো এই। আমাদের মন এবং শরীরের যে নানা ক্ষমতা আছে তাকে সক্রিয়, সজাগ, সচেতন করে তোলা, সঠিক সাহিত্যের কার্যপদ্ধতি।

শাস্ত্রীমশাই প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশে হিমালয়ের কত বৈচিত্র্যই যে দেখেছেন। অর্থাৎ এর মধ্যে একটা ন্যারেটিভ ডিসকোর্স লুকিয়ে আছে। সেটা হল—অস্তিত্বে একমাত্র চিরস্থায়ী জিনিষ হল তার স্থায়িত্বের অভাব। কিন্তু সেই ন্যারেটিভ ডিসকোর্সকে চাপা দিয়ে দিল আরেকটি ন্যারেটিভ ডিসকোর্স—*এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ ইহা অনন্তকাল এইরূপ...* অর্থাৎ চির অস্থিরতার মধ্যে বা চিরঅস্থিরতাকে নিয়ে একটা চিরস্থায়িত্ব আছে।

প্রশ্ন ওঠে এই বহুবিচিত্র অথচ চিরকাল একরকম হিমালয় নিজেই কি আলোচ্য কাহিনীর একটা চরিত্র? প্রথম অংশের শেষ পঙক্তি—আরেকটি প্যারাডক্সের অবতারণা করে। *চিরকাল একরূপ হিমালয় একটি বিশেষ শরৎকালের অমাবস্যার রাত্রে অপূর্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়েছিল, যে শরৎ সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ধি সময়।* একটা বিশেষ শরৎকালের রাতে হিমালয় অপূর্ব সেজেছে। আমরা মানুষ অসীম অনন্তকে একক ধরতে পারি না, আর তার ফলেই খণ্ড খণ্ড সময় এবং দূরত্বে জ্ঞান অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। কোন কিছুই একরূপ থাকলে তো কোন ঘটনাই ঘটে না। তাই বিশেষ একসময় হিমালয় অপূর্ব সেজেছিল, খণ্ড স্পেসের কথা বলতে গেলেই খণ্ড টাইম এসে যায়। আর আমাদের এই খণ্ড সময় দূরত্বের জ্ঞান দিয়ে যখন আমরা অনির্দ্দেশ্য দৈবকালকে খণ্ড খণ্ড করি, দেখি তখনই ঘটনা ঘটে আর গল্পের শুরু হয়। সেই দিনটা ছিল অমাবস্যার রাত। অন্ধকারে সমস্ত রূপলোক গেছে হারিয়ে, সেই অম্যবস্যার রাতটা ছিল আবার সত্য ও ত্রেতার সন্ধিলগ্নে। এই সন্ধিলগ্নই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পছন্দের কাল। *Roland Barthes* বলেন জামাটা যেখানে শরীরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সেই জায়গাটা ধরতে পারলেই রোমাঞ্চ হয়। যখনি দুটো কাল, দুটো নদী, দুটো যখন মিলিত হয় দুটো হয়েও দুটো থাকে না তখনি অসীম শক্তির বিচ্ছুরণ হয়। তাই নদী সঙ্গম মাত্রেই তীর্থক্ষেত্র আর দুটো যুগের সঙ্গমস্থলে আলোচ্য কাহিনীর তীব্র শক্তি বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে।

সময়ের কথা যেই এল, তখনি মৃত্যুর কথা এল। তাই দ্বিতীয় অংশ শুরু হচ্ছে—*মানুষ মরিয়া কি হয় কে বলিতে পারে? কিন্তু বেদমতে তাঁরা স্বর্গে যান না, যেসকল লোক পৃথিবীতে সৎকার্য্য করিয়া যান তাঁহারা ঋভু।*

ইহারা কোথায় থাকেন? কি করেন? কে বলিতে পারে। ইহারা ছায়াপথেরও ওপারে কোন সুখময় ভবনে বাস করেন।

প্রথমাংশে পাহাড় দেখেছি, মাঠ দেখেছি। দ্বিতীয় অংশে আকাশ শুধু নয়, নিঃসীমতার ইশারা। শুধু তাই নয়, ছায়াপথেরও ওপারে—তমসঃ পরস্তাৎ।

ঋভুগন একতানসুরে গান ধরিলেন। ....অমাবস্যার রাত সবকিছু নীরব, নিস্পন্দ। যেন ঘুমঘোরে আর তারমধ্যে ছায়াপথ ভেদ করে ঋভুরা নেমে এলেন আর একতানে গান গাইতে থাকলেন।

শাস্ত্রীমশাই আগেই অন্ধকারের ব্যবস্থা করেছেন। তার সঙ্গে স্তব্ধতা, আর সেইসময় অন্ধকারের ওপার থেকে ঋভুরা এলেন আর গান ধরলেন। এখানে সত্য যেন স্বপ্নের মতো হয়ে উঠলো। অথবা স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠল। আমরা যখন গভীর সুষুপ্তিতে প্রবিষ্ট হই তখন আমাদের পঞ্চভৌতিক সত্তার ৩৬টি তত্ত্বের মধ্যে মাত্র তিনটি তত্ত্ব জেগে থাকে। অহং এবং বুদ্ধি মন তাদের মধ্যে প্রধান। আর এই সুষুপ্তিতেই গোলাকপতির সঙ্গে মহামিলন হয়। মহারাস হয়। আলোচ্য কাহিনীতে ব্রহ্মাণ্ড যখন সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন তখনি ছায়াপথ ভেদ করে ঋভুরা এলেন। গান ধরলেন। লেখাটি বুঝি নিজেই সেই সুষুপ্ত অবস্থায় অলৌকিক সত্য দর্শন করছে যা স্বপ্ন দিয়ে তৈরী; কোলরিজ বোধহয় এমনি লেখার স্বাদগন্ধ দিতে পারতেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় হরপ্রসাদের কি

কোন জুড়ি আছে? অলৌকিক জগৎকে এমন বাস্তব এবং ইন্দিরয়গ্রাহ্য করে আর কেউ কি উপস্থাপিত করতে পেরেছে?

ঐ অসীম ব্রহ্মাণ্ড যা নিদ্রিত এবং তাকে আমরা শরীরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। লেখকের শরীর সুষুপ্ত অবস্থায় আছে। রক্ত চলাচল বন্ধ। বাতাস নেই, মন স্তব্ধ, শুধু অহং, বুদ্ধি আর চৈতন্য জেগে আছে। তারা দেখতে পাচ্ছে তাদের শরীর তার বাইরে থেকে শরীর ভেদ করে ঋভুগন এলেন এবং গান করলেন। সেই গান অনির্বচনীয়।

ঋভুদের গীতধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর পরিপূরিত করিয়া উন্মুক্ত ছায়াপথদ্বার পথে অনন্তে বিলীন হইল।

কেবল তিনজন লোক গানের অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনজনে গানে মত্ত হইয়াছিলেন, তিনজনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বর লক্ষ্য করিয়া হিমালয়ের চূড়ায় আসিয়াছিলেন।

হরিবংশমতে বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র। বেদের ঋষি। ইক্ষাকুবংশের ইনি কুলপুরোহিত। রামচন্দ্রের কাছে ইনি যে রামায়ণগান করেন তা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বলে পরিচিত। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বিরোধের কাহিনী রামায়ণে তো আছেই। পুনশ্চ রাজা হরিশচন্দ্রকে কেন্দ্র করে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বিরোধের কথা মার্কণ্ডেয় পুরানে বর্ণিত হয়েছে।

রাজা কুশের পুত্র কুশিক, তাঁর পুত্র গাধি, গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর রাজা। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের বিরোধ বিশ্বামিত্রের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। তাঁর জীবনকাহিনীর অনেকটাই বাল্মীকি রামায়ণে বিধৃত আছে। তিনি নিজেই একটা স্বর্গ রচনা করেছিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে দুটি চরিত্র বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। লেখক শুধু এই দুটি চরিত্রকেই তাঁর কাহিনীতে নিলেন না। চরিত্রদুটিকে যিনি রচনা করেছেন সেই বাল্মীকিকেও নিলেন। অর্থাৎ এক অর্থে বাল্মীকির জয়, এমনই একটা গল্প, যেটি আরেকটি গল্পের দুটি চরিত্র এবং তাদের রচয়িতার সম্পর্ক বা টানাপোড়েন নিয়ে তৈরী। এটি ন্যারেটোলজির একটি বিশেষ, দিককে উদ্ঘাটন করে। লেখকের সঙ্গে তাঁর রচনার পাত্রপাত্রীদের সম্পর্ক কোথায়? পাত্রপাত্রীরা নিশ্চয়ই লেখকের অন্তর্জগতের এককেটি প্রক্ষোভের প্রতীক। সম্পর্কটা কোথায়? এটি বিশেষ একধরণের সমালোচনা ভঙ্গীর উদাহরণ। স্পষ্টতই সমস্ত লেখা লেখকের মন থেকে উৎসারিত। সাহিত্যকৃতির সঙ্গে তাই স্বপ্নের তুলনা চলে। কেবল স্বপ্নের কোনও মাধ্যম নেই। কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যম আছে। বাল্মীকির জয় কাহিনীটি স্বপ্নদ্রষ্টার সঙ্গে তার স্বপ্নের পাত্রপাত্রীদের সম্পর্কের কাহিনী।

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং বাল্মীকি, তিনজনেই স্ব স্ব অনুগামীদের কেন্দ্রবিন্দু, সংগঠন শরীর। আর তার কেন্দ্রবিন্দু মন/আত্মা। এখানে একটা নির্দিষ্ট এস্থেটিক্সের কথা আছে। গান শুনলে, আত্মা জাগ্রৎ হয়ে ওঠে এবং অলৌকিকের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে। অবশ্য তার জন্যে সহৃদয় পাঠক/শ্রোতা চাই। সারা পৃথিবী যখন মুগ্ধ, তখন মাত্র তিনজন, গানটিকে বুঝবার জন্যে শোনবার জন্যে টিব্বায় উঠলেন। টিব্বা শব্দটির অর্থ হলো উঁচু জায়গা, গ্রীকদের দেবতারা থাকতেন অলিম্পাস পাহাড়ে। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আর বাল্মীকি তিনজনেই টিব্বায় উঠলেন। এঁদের মধ্যে বশিষ্ঠ স্বাধ্যায় ও স্বাধ্যাপনা নিয়ে থাকেন। বিশ্বামিত্র রাজা এবং বাল্মীকি ডাকাত হলেও যেন এক অর্থে একই কোটির মানুষ। কারণ বিশ্বামিত্রের দিগ্বিজয়ে মানুষ খুন হয়। অন্যের ধনসম্পদ লুঠ হয়। আর বাল্মীকি ডাকাতি করতে বেরিয়েছেন *কোথাও ডাকাত রক্ষী কাটিতেছে, কোথাও রক্ষী ডাকাত কাটিতেছে।* দ্বিগ্বিজয়ে বেরিয়ে রাজাও তো একপ্রকার ডাকাতই।

কিন্তু দার্শনিক স্তরে আমাদের ২৭ থাকে কোন সেই জিনিস যা ঋভুদের এমন গানে উদ্বুদ্ধ করেছিল? শেলীর ভাষায় প্রশ্নটাকে রাখলে

CENTRAL LIBRARY

What objects are the fountains of thy happy strain
What fileds or waves or mountains what shapes of sky or plain
What love of thine own kind? What ignorance of pain?
(Shelley To A Skylark)

লেখক বলছেন—আজি ঋভুগন গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পুলকিত হইয়া গাহিতেছেন।

উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম যেমন আসলে পাশ্চাত্য থেকে আমদানি। তেমনি ভাই ভাই ভাই—এটাও বুঝি ফরাসীবিপ্লবের মহাযজ্ঞসম্ভূত *fraternity*'-র মন্ত্র।

এ দেশ তো প্রাচীনকাল থেকেই বলছে আত্মবৎ সর্বভূতেষু। তাই স্থাবর জঙ্গম সবাই ভাই। তথাকথিত ভাবে দেশপ্রেমের কথা প্রাচীন সাহিত্যে হয়তো নেই। কিন্তু শংকারাচার্য যখন বলেন

মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরো
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্

তখন কি মহাজাগতিক নাগরিকত্বের কথা বলা হল না? তার অভিঘাত লেখকের ওপর নিশ্চয়ই আছে।

বাল্মীকির জয় নামটির তলায় একটি *Sub-title* আছে সেটি ইংরেজী ভাষায়। *sub-title* টি হল *that three forces (physical, intellectural and mental)*। অর্থাৎ বশিষ্ঠ বশিষ্ঠ নয়, বিশ্বামিত্র বিশ্বামিত্র নয়। এরা একেকটি শক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকৃতি। অর্থাৎ ইংরেজীতে *sub-title* স্পষ্টত লেখকের ইংরেজী সাহিত্যের কাছে ঋণের কথা মনে করিয়ে দেয়। ইংরেজীতে *morality drama* বলে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এক ধরনের নাটক ছিল। সেই নাটকে মানুষের বদলে বিভিন্ন বিমূর্ত বা *abstract* গুণ দোষ পাত্র-পাত্রী হিসেবে অংশ গ্রহণ করত। সংস্কৃত *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটকটিও এই অর্থে *morality drama*। *বাল্মীকির জয়* যেন একটি *morality drama*। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ওই ধরনের নাটক *expressionist* শিল্প হিসেবে পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করেছে। শাস্ত্রীমশাই এর *বাল্মীকির জয়*কে একটা *expressionist* সাহিত্য বলে চিহ্নিত করলে বোধহয় প্রত্যবায় হবে না।

কোন শিল্পকর্মকে যখন একাধিক স্তরে ব্যাখ্যা করা যায় তখন শিল্পকর্মটি প্রতীকী বা *symbolic* হয়ে ওঠে। বাল্মীকির জয় সেই নিরিখে একটি *symbolist* সাহিত্যকৃতি। লেখক তৃতীয় অংশে বলেছেন *বাল্মীকি গান শুনিলেন ও বুঝিলেন।* অথচ চতুর্থ অংশে বলছেন—*বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির হৃদয়ের তলা হতে প্রতিধ্বনিত হল ভাই ভাই, যেন মোহিনীতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করিয়া হৃদয়কে গলাইয়া বলিল ভাই ভাই।* অর্থাৎ একবার লেখক বলছেন বুদ্ধি দিয়ে গান শোনা হল। অন্যত্র লেখক বলছেন হৃদয় দিয়ে গান শোনা হল। শুধু তাই নয় পঞ্চম অংশের শুরু হচ্ছে, *তিনজনেই উন্মত্ত, কিন্তু মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে একটি ভাবনার স্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল। তাহারা গানে এমনই উন্মত্ত যে বেগবান চিন্তার স্রোতেও তাহাদের আকর্ষণ করিতে পারে না, হৃদয়ের তলবাহিনী অন্তঃসলিলা ক্ষুদ্র ভাবনার তো কথাই নেই।*

ষষ্ঠ অংশে ঋভুদের পৃথিবী থেকে বিদায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গানের প্রভাব গভীরভাবে মনে থেকে গেল। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকির মনের মধ্যে যেন বলছে—*ভাই, ভাই, ভাই।*

একই কথা *ভাই ভাই ভাই।* অথচ এই কথাটিকে বশিষ্ঠ একভাবে নিলেন, বাল্মীকি আরেক ভাবে নিলেন। বশিষ্ঠ ভাবছেন—ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে মিল ঘটিয়েছি। অন্য জাতির সঙ্গে কি মেলাতে পারব না? বিশ্বামিত্র ভাবছেন—বিশ্বভুবন জয় করে সবাইকে ভাই ভাই বলতে বাধ্য করব। আর বাল্মীকি ভাবছেন—আমি দস্যুবৃত্তি করে কী পাপটাই না করেছি।

বাল্মীকির জয় কাহিনীতে লেখক বাল্মীকির উত্তরসূরীদের বর্ণিত বাল্মীকির চরিত্রকে তাঁর পাত্র হিসেবে বেছে নিলেন। কিন্তু দস্যু বাল্মীকি, রাম নাম করেই, পরিবর্তিত হলেন, একথা শাস্ত্রীমশাই মেনে নিতে পারেন নি। পরিবর্তে ঋভুদের গান তার সত্তায় আলোড়ন তুলেছিল। তিনি দস্যুদল ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে কোথায় চলে গেলেন, এই কথা লেখক বাল্মীকি কথায় *extrapolate* করলেন।

কিন্তু লেখক ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ এবং দিগ্বিজয়ী বিশ্বামিত্রকে যে স্তরে নিক্ষেপ করেছেন বাল্মীকিকে সেই স্তরে নিক্ষেপ করেন নি। তাই বাল্মীকি যখন কাঁদতে কাঁদতে গহনোদ্দেশ্যে চলে গেলেন তখন বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র একসঙ্গে চলতে লাগলেন।

কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ডে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের কথোপকথনের মধ্যে সারা বিশ্বে ভ্রাতৃত্ববোধ কেমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই কথাই উঠল। বিশ্বামিত্র বললেন তিনি ইতিমধ্যেই *পূর্বাঞ্চলে চীন, হূন, শান মান ও নাগাদির রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা সমুৎপাদনের জন্য ভেদক্ষম সুচতুর বিশ্বস্ত মন্ত্রীবর্গদের প্রেরণ করেছেন। পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন, পারদ, দরদ, ম্লেচ্ছ, ইরাকাদি জাতিসমূহকে উচ্ছৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে নবনবতি অক্ষৌহিনী সেনাসমভিব্যাহারে সর্বপ্রধান সেনাপতিকে পাঠিয়েছেন।* সব জায়গা থেকেই ভালো খবর এসেছে। হিমালয় জয়ের পর একবার সসৈন্যে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এলেই দিগবিজয় সম্পূর্ণ হবে। সারা পৃথিবী দখল করে নিলে তিনি রাজকীয় অনুশাসনের সাহায্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করবেন।

কিন্তু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথার প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, দিগ্‌বিজয়ের সাহায্যে মানুষের শরীরকেই কেবল দখল করা যাবে। মনকে নয়। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কথার প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন আমাদের মাথায় যতদিন আকাশ থাকবে ততদিন মানুষের স্বাধীন চিন্তা ভাবনাকে রোধ করা যাবে না। বশিষ্ঠ বললেন—*আমরা তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছি। অনন্ত আকাশের দিকে কাহাকেও চাহিতে দিব না। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেবতা বসাইব। আকাশের তারার সহিত মনুষ্য অদৃষ্টের একটা সম্বন্ধ স্থির করাইয়া দিব। অন্তরীক্ষ বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া দিব। যেভাবে আকাশের দিকে চাহিলে স্বাধীন চিন্তা প্রবল হয় সে ভাব তাহাদেরও মনেও আসিতে দিব না। সমুদ্র যাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়, সমুদ্র যাত্রা বন্ধ করিয়া দিব। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার এমনই বাধাবাধি করিব যে ব্রাহ্মণ ছাড়া কারও এক পা চলবার ক্ষমতা রাখিব না। অথচ ব্রাহ্মণ রাজাও হইবে না।*

শাস্ত্রীমশাই বৌদ্ধশাস্ত্রে পণ্ডিত। ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁর জ্ঞান প্রভূত। তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং আধুনিক ইংরেজের চোখে ভারতবর্ষের পুরাণ কাহিনীকে দেখছেন। ঋভুদের সঙ্গীতস্বরে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সারা পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্‌যোগী হয়েছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের *মহাজনক জাতক* সারা পৃথিবীতে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্রাহ্মণরা ভূমিকা পালন করতে পারেন তার পথ নিরিখ দেখিয়েছে। সেখানে না ঘটেছে কোন দিগ্‌বিজয়ের কাণ্ড না তৈরী হয়েছে কোন জাগতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিক্ষাশাস্ত্র। উনবিংশ শতকে ধর্মের *orgin* বা সূত্রপাত নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। শাস্ত্রীমশাই সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন।

বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের আতিথ্য নিলেন। প্রতিসম্ভাষণে, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে নিজের আশ্রমে নিমন্ত্রণ করলেন।

বিশ্বামিত্র তাঁর তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে বশিষ্ঠমুনিকে জাঁক করে বিভিন্ন দেশ থেকে লুণ্ঠিত রত্নসম্ভার দেখালেন। বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রকে আমন্ত্রণ করে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলেন।

রাজা বিশ্বামিত্র ঋষি বশিষ্ঠের জীবনস্বরূপ গাভী শবলা প্রদত্ত ঐশ্বর্য্য দেখে গাভীটি প্রার্থনা

করলেন। গাভীটি দিতে অপারগ বশিষ্ঠ শবলাকেই আত্মরক্ষা করতে বললেন। অতঃপর শবলার মায়ায় উৎপন্ন যবন, শক, ম্লেচ্ছ, সৈন্যদ্বারা বিশ্বামিত্র যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের সঙ্গে আগে দেখা হবার ফলশ্রুতি হিসেবে বশিষ্ঠের আশ্রমে আসেন নি। তিনি এসেছিলেন নিছক মহাবল ঋষিকে দর্শন করতে। তাই শাস্ত্রীমশাই-এর কাহিনীতে, বিশ্বামিত্রের চোখের সামনে সমস্ত তপোবন একটা মুহূর্তে একটা রম্য উদ্যান হয়ে উঠল, বাল্মীকিতে সে কথা নেই।

বশিষ্ঠের গাভীর কাছে বিশ্বামিত্রের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে বোধ হয় আজকের পাঠকের কাছে আরেকটি সত্য প্রতিফলিত হয়। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের কাছে দাবী করেছিলেন—সারা পৃথিবী তাঁর পদানতপ্রায়। কিন্তু গাভীটির মায়ায় যে ম্লেচ্ছ সৈন্য বর্ষিত হয়েছিল, তারা সসৈন্য বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করলেন। ঠিক একইভাবে আজকের আর্য্যরা (ঋ + ণ্যৎ) বা প্রগতিশীলরা বোধহয় ম্লেচ্ছদের দ্বারা অভিভূত। বাল্মীকি রামায়ণের বিশ্বামিত্রের পরাভবের কাহিনী যেন নিজের অজ্ঞাতসারে বা *ironically* এই ভবিষ্যদ্‌বানীই করে।

বাল্মীকি নামের মধ্যেই বাল্মীকির তপস্যার অতীত নিহিত আছে। তাঁর শরীরেও উইপোকা বাসা বেঁধেছিল। বিশ্বামিত্রের শরীরেও উইপোকা বাসা বেঁধেছে—এই খবর দিয়ে শাস্ত্রীমশাই অলক্ষ্যে বলছেন—বিশ্বামিত্র বাল্মীকিরই একটি স্বরূপ।

শব্দ আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল

প্রথম দুটি শব্দের *শ*-শিষধ্বনি বিকৃত স্বর পুনরাবৃত্ত *আ*'তে মিলিয়ে গেল। বিবৃত স্বর আ যেন মহাশূন্যের প্রতীক। সেই আকে কণ্ঠবর্ণ

আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল

প্রথমে অঘোষ বর্ণ। এবং পরে ঘৃষ্টধ্বনি (ঘ) খচিত ঘোষবর্ণ হয়ে মেঘবদুন্নত হয়ে উঠল।

অনন্তর *ড়, র, ল* এবং *য়*—অন্তঃস্থ বর্ণেরা ঘর্ঘর শব্দে মেঘবদুন্নতধ্বনি সমৃদ্ধ আকাশে গতির সঞ্চার করল।

শব্দ আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল

পুনরাবৃত্ত *আ* যদি তাকে দ্রুত করে পুনরাবৃত্ত *ই* তাকে সংযত করে

গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল

শেষ পর্যন্ত, সকল ধ্বনি *ও* তে শুরু হয়। *ও* তে উত্তীর্ণ হবার জন্যে বাক্যে প্রথমে *অ* ধ্বনির দরকার ছিল।

শব্দ

অ ধ্বনি ব্রহ্মার দ্যোতক, উ ধ্বনি বিষ্ণুর দ্যোতক। এরা উভয়ে ও ধ্বনি করছে। এই নাদ অনিবার্য্য ভাবেই বিন্দুর কথা মনে করিয়ে দেয় দীর্ঘ ও উচ্চারণের পর

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ এর ওঁকারে ধ্বনিপরম্পরা আসে।

অর্থাৎ শাস্ত্রীমশাইয়ের ভাষা অত্যন্ত সহজেই পাঠকের মধ্যে প্রণবধ্বনি ও নাদ উৎসারিত করে, পাঠকের অজ্ঞাতসারে। এইবার আমরা গায়ত্রীমন্ত্র পাঠের উপযুক্ত হয়ে উঠি। বিশ্বামিত্র শুনতে পেলেন:

CENTRAL LIBRARY

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ

তৎসবিতুর্বরেণ্যং

ভর্গো দেবস্য ধীমহি

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ

ভূলোক ভুবলোক স্বর্লোক, চেতন অবচেতন অচেতন, আধিভৌতিক আধিদৈবিক আধ্যাত্মিক এই ত্রিলোকের তিনের প্রসাবিতা সবিতারও যিনি পুজনীয় বরেণ্য, যার ওপর নেই, *যিনি তমসঃ পরস্তাৎ* সেই ভর্গদেব যাঁর প্রতাপে জানা অজানা, শক্তি দুর্বলতা দেহ মন সব ভাজা ভাজা হয়ে যায় তাকে ধ্যান করি। তিনি আমাদের সমস্ত অস্তিত্বের বুদ্ধির মঙ্গল করুন।

এবার আলোড়ন উঠল। প্রস্তাব এল বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করে নেওয়া হোক। কারণ কল্পনার অতীত সত্ত্বার যিনি ধ্যান করেন তিনি ব্রাহ্মণ। বিশ্বামিত্র মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন নি। বিশ্বামিত্র মন্ত্রটি শুনলেন দেখলেন। একেই বলে *Revelation*. এর আগে তিনি অন্তর্জগতে আরও ভূতপিশাচ আরও অনেক কিছু দেখেছেন। ক্রমশ ছোট আমির ছায়াগুলোকে অতিক্রম করে বড় আমিতে এলেন। বিশ্বামিত্রের বড় আমিই বলে উঠল *ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ*। বিশ্বামিত্র নিজের বড় আমির কণ্ঠস্বরকে *externalised* হয়ে শুনলেন। *Revelation.*

আসলে *বাল্মীকির জয়* লেখাটি ঋভুদের সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়েছে। *Revelation* এর পুনরাবৃত্তি হল।

ব্রহ্মা বললেন—তুমি ইন্দ্র হও, রাজর্ষি হও। কিন্তু বিশ্বামিত্র ব্রহ্মণ্য ছাড়া আর কিছুই নেবেন না। ব্রহ্মণ্য যখন বিশ্বামিত্রকে দেওয়া হল না তখন তিনি ব্রাহ্মণ বিহীন বিশ্ব রচনা করবেন। চতুর্থ খণ্ডে বিশ্বামিত্র নিজস্ব বিশ্ব রচনা করতে লেগে গেলেন। বাল্মীকিতে ব্রহ্মাণ্ড কী ভাবে সৃষ্টি হলো সে বর্ণনা নেই। শাস্ত্রী মশাই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কেমন করে হলো তার একটা চিত্তচমৎকার বর্ণনা উপস্থাপিত করেছেন। যা সায়েন্স ফিকশানের মধ্যে পড়ে। মহাজাগতিক কল্পনার সঙ্গে সায়েন্স ফিকশান মিলিত এ এক অনবদ্য ব্যাপার।

কিন্তু শাস্ত্রীমশাইয়ের কথায় বিশ্বামিত্রের পৃথিবী অধিককাল ছিল না। বিশ্বামিত্র চেয়েছিলেন সমস্ত বিশ্বভুবন দখল করে সেখানে ভ্রাতৃত্বভাব জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে। অর্থাৎ তিনি মস্ত ক্ষমতা করায়ত্ব করে তবে আদর্শ পৃথিবী গড়বেন।

বশিষ্ঠের নন্দিনীকে কামধেনুকে আয়ত্ব না করতে পেরে, বিশ্ববিজয় না করে, তিনি সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বভূবন সৃষ্টি করলেন, তিনি *total power* হাতে পেলেন। কিন্তু *totalitarian rule* বা শাসনে সে বিশ্বও টিকলো না।

বিশ্বামিত্রের রচিত ব্রহ্মাণ্ড এবং তার লয় একাধিক সত্যকে উদঘাটন করে। প্রথমত আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড একই রকমের অলীক এবং অলৌকিক।

দ্বিতীয়ত বশিষ্ঠাশ্রমে নন্দিনীর রচনাও অনুরূপ অলৌকিক। তৃতীয়ত বশিষ্ঠ তার ব্রহ্মবিদ্যাকে প্রেমের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। রাজাকে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র ঈর্ষায় প্রেমের দুনিয়া গড়লেন। বিশ্বামিত্রের সর্বজনীন প্রেমের ব্রহ্মাণ্ড *ab initio vitiated* তাই দীর্ঘস্থায়ী হল না।

বিশ্বামিত্রের রচিত ব্রহ্মাণ্ডকে আরও খুঁটিয়ে দেখা যাক। *উচ্চনীতিশিক্ষা উচ্চশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক রহিল না, সকল লোক একত্র হইয়া কার্য্য নির্বাহ করিবে।* এই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে যেন রুশোর *General Will* এর ধারণাটি প্রতিফলিত হয়। পাশ্চাত্যের চোখে ভারতীয়রা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কুসংস্কারের বিপরীতার্থক শব্দ বা *antonym* হোলো যুক্তি।

শাস্ত্রী মশাই বলেন—যুক্তি একমাত্র *উপাস্য দেবতা।* কিন্তু যুক্তি ব্যাপারটাই যে অযৌক্তিক। যুক্তি সমসময়েই *deductive.* সে অনাস্বাদিতপূর্ব কিছু আবিষ্কার করতে পারে না। এমন কী আরোহ অনুমানেও ধরে নেওয়া হয় আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভাবী ঘটনা সংঘটিত হবে। অর্থাৎ এমনই একটি প্রকৃতির পটভূমিতে বেঁচে থাকে যেখানে *দারুন গ্রীষ্মে গরম লাগে না।* এর সাহায্যে লক্ষণার্থে কী বলা হচ্ছে যে প্রকৃতিকে যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না। অথচ সেই প্রকৃতিকে যুক্তি দিয়ে যারা বুঝতে চাইছে তারা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। পুনশ্চ শাস্ত্রী মশাই বলেন—*সকলেই ব্যস্ত উন্নতিপথে ধাবমান।* কিন্তু উন্নতির তো শেষ নেই। আর একটা সরল রেখাকে অনন্ত পর্য্যন্ত টানলে তা তো শেষমেষ বৃত্ত হয়েই দাঁড়াবে। আরও—*বিশ্বামিত্রের সংসারে বিবাহ নেই।* অর্থাৎ বিশ্বামিত্রের রচিত সমাজ ক্রোপটকিনের অনুযায়ী *anarchist.* সেখানে কোনও আইন কারুর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না। কিন্তু আইনের রক্তচক্ষুমুক্ত সমাজ তো বিশ্বামিত্রই চাপিয়ে দিলেন। *Positive Law* থেকে মুক্ত সমাজ তো স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠলো না। বাল্মীকির জয় *threeforces*-এর গল্প। বিশ্বামিত্র বোধহয় সেখানে যুক্তির প্রতীক।

তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অংশে একদা দস্যু বাল্মীকি এখন অনুশোচনা করছেন, মনুষ্য সমাজ ছেড়ে তিনি প্রকৃতিতে আশ্রয় নিয়েছেন। শাস্ত্রী মশাই বাল্মীকি সম্পর্কে বলেন—*মানুষ দেখিলে বাল্মীকির হৃদয়ের জ্বালা আরও আরও বাড়িয়া উঠে, জঙ্গলে পশুপক্ষীর সহিত বাস হইতে লাগিল।* মানুষ দেখিলে হৃদয়ের জ্বালা বাড়ে কেন? মানুষের একদা লুঠতরাজ করেছেন, সেই লজ্জায় ও অনুশোচনায়? নাকি মনুষ্যসমাজ স্বয়ং একটি কারাগার বিশেষ। তার প্রতি বিরূপতায়। বাল্মীকি যখন অনুশোচনায় অস্থির অরণ্যে পশুপাখীদের সঙ্গে বাস করছেন, তখন একদিন এক *ক্রৌঞ্চমিথুন বড়ো আদর করিয়া পরস্পর বসিয়া খেলা করিতেছে। বাল্মীকি একতান মনে উহাদের ক্রীড়া দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন ইহারা আমা অপেক্ষা কত সুখী, আমি কেন অমনি করিয়া আমোদে মত্ত হইয়া বেড়াই না। আমারও তো কত সঙ্গী। পূর্ব কথা আবার নূতন হইয়া আকুল করিয়া তুলিল ঠিক এই সময় একটা তীর আসিয়া একটি* প্রাণ সংহার করিল। বাল্মীকি বলে উঠলেন—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।

শাস্ত্রীমশাই বাল্মীকির মুখের কথায় *মা নিষাদ* ইত্যাদি যথাযথ তুলে ধরলেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কবি, যেটি অনুক্ত রেখেছেন বা ব্যঞ্জনায় রেখেছেন পরবর্তী কবি শাস্ত্রীমশাই তাকে প্রকট করে রাখলেন।

এরপরে বাল্মীকি রামায়ণে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ঋষির কাছে এলেন। আর শাস্ত্রীমশায়ের গল্পে স্বয়ং বীণাহস্তে সরস্বতী এলেন। কারণ বাঙ্গালীর প্রিয় পৌরাণিক মিথ অনুযায়ী সরস্বতীই বাগ্‌দেবী। তিনিই আশীর্বাদ করলে মানুষ কবিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কবির প্রতীককে পরবর্তী কবি তার সময়োচিত পাঠকগ্রাহ্য প্রতীকে পরিবর্তিত করেন। সরস্বতী বললেন—

ব্রাহ্মণদের মধ্যে কাহাকেও তোমার মত করুণ হৃদয় দেখি নি।

সরস্বতী বাল্মীকিকে আরো বললেন—*এই বীণা তোমার ও তোমার মতো লোকের হাতে চিরদিন থাকিবে, তোমরা পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়া কেবল পরের জন্য ব্যবহার করিবে।* তবে কি পরহিতের জন্য না করলে, সাহিত্যের সব চাষ ব্যর্থ হবে? যারা *Art for art's sake* বা শিল্প শিল্পের জন্যে বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীমশাইয়ের এই মন্তব্য? সাহিত্যের সঙ্গে হিতের সম্পর্ক তো আছেই। কিন্তু সে হিত কবির নিজের হিত না। মল্লিনাথের কাব্যং *যশসে অর্থকৃতে,*—একথা শাস্ত্রীমশাই একদমই মানেন না।

CENTRAL LIBRARY

বাল্মীকি সরস্বতীর বীণা পাইয়া ও কবিতার আস্বাদ পাইয়া হিমালয়ের গভীর বনভূমি ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে আসিলেন, আসিয়া লোকালয়ের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তিনি কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শোক কিভাবে শ্লোক হয়ে উঠল বাল্মীকি রামায়ণে তার ইঙ্গিতমাত্র আছে। পরবর্তী কবি শাস্ত্রীমশাই, তাকে বিভিন্ন *context* এ বিশদ করে উপস্থাপিত করছেন। গান গাইতে গাইতে বাল্মীকি সারা ভারতবর্ষ ঘুরছেন। এক দস্যুদলের দলপতি গুহক, আগে বাল্মীকির অনুচর ছিল। তিনি বাল্মীকির সংস্পর্শে পাল্টে গেলেন। বাল্মীকির গান শুনে অন্যান্য দস্যুরও হৃদয় পরিবর্তিত হল। যে সমস্ত মানুষ দস্যুর অত্যাচারে জনপদ ছেড়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল, বাল্মীকির গানে তারা ফিরে এল, গুহক চণ্ডাল জনপদের শাসনভার নিলেন।

আবার ষষ্ঠখণ্ডে বিশ্বামিত্রের কথায় লেখক ফিরে এলেন; বিশ্বামিত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে, তার স্রষ্টা বা অধীশ্বর হিসেবে ভীষণ একাকীত্ব বোধ করলেন। সমস্ত *dictator* এরই এই অবস্থা হয়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বামিত্র স্বজনদের কাছে ফিরে এলেন। তারপর ভাবলেন গোটা কন্যাকুব্জ রাজ্যটাকেই তিনি এই পৃথিবী থেকে উৎপাটিত করে তাঁর রচিত নতুন পৃথিবীতে প্রক্ষিপ্ত করবেন। কিন্তু তা কী কখনও হয়? ষষ্ঠখণ্ডে বিশ্বামিত্র মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

সপ্তমখণ্ডে শাস্ত্রীমশাই এক যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন। বশিষ্ঠ তার পুরোহিত। ফলে বিশ্বামিত্র আর পরশুরামের দল তার বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলো। বশিষ্ঠ তবুও যজ্ঞ করবেন। মারামারি, কাটাকাটি (কাটাকাটি এক বিপুল নৈরাজ্য। আর যেখানে বাল্মীকি কেঁদে কেঁদে গান করছেন। ইলিয়াডের অন্ধ কবি হোমার নাকি চারণকবি বা *bard* ছিলেন। তেমনি বাল্মীকিও এখানে চারণ কবি হিসেবে চিত্রিত)। আবার, ভারতবর্ষে সমস্ত মহান সন্ন্যাসীরাই আসমুদ্রহিমাচল ভ্রমণ করেছেন। শংকর চৈতন্য সবাই বাল্মীকি তার ব্যতিক্রম নয়। নৈরাজ্যকে বাধা দেবার জন্যে বাল্মীকি নিজেই যজ্ঞবেদীতে পশুবৎ প্রবেশ করলেন। কিন্তু অন্য সবাই বাল্মীকিকে জোর করে যজ্ঞকুণ্ড থেকে বাইরে রাখল। যজ্ঞ হবেই। একটা বিপুল হানাহানি বুঝি এর অনিবার্য্য প্রতিশ্রুতি। এমন সময় নির্মেঘ আকাশ থেকে দু এক ফোঁটা জল এসে ব্রাহ্মণদের গায়ে পড়ল। ব্রাহ্মণরা ভাবলেন তাঁরা অশুচি হয়েছেন। ঠিক এমন সময় মূর্চ্ছিত বিশ্বামিত্রের দেহ পিণ্ডটি এসে যজ্ঞকুণ্ডে পড়ল। বাল্মীকি বিশ্বামিত্রকে চিনতে পেরে অঝোর ঝরে কাঁদতে লাগলেন আর গান গাইতে লাগলেন। বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রকে চিনতে পেরে করুণায় উদ্বেল হয়ে উঠলেন। বশিষ্ঠের চরিত্রের *development* হল। তিনি আর *flat character* বা *type character* নয়। বিশ্বামিত্রও নিজের অহমিকার জন্যে ক্ষমা চাইলেন। বশিষ্ঠ বাল্মীকিকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন তোমারই জয় হয়েছে। বিশ্বামিত্র বাল্মীকিকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন—তোমারই জয়।

সপ্তম খণ্ডের শেষে—*ব্রহ্মা যাইবার সময় ঋষিত্রয়কে বলিয়া গেলেন সর্বলোকমধ্যে ঐক্যস্থাপন মানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ।*

অষ্টমখণ্ডে লেখক স্বয়ং বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বাল্মীকির প্রতীকী চরিত্রকে স্পষ্ট করলেন। *বাল্মীকির হৃদয়, বশিষ্ঠের বুদ্ধি এবং বিশ্বামিত্রের রাজনীতিপ্রজ্ঞা একত্র হইয়া জগতের ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনে নিয়োজিত হইয়াছিল।* বিশ্বামিত্রের পৌরুষ এবং বশিষ্ঠের মেধা কোশোশ্বীনাথের যজ্ঞক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছে হৃদয়ের সাহায্যেই বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই উভয়ে কবিকে সাহায্য করতে লাগলেন।

রামায়ণের কাল সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত্রীমশাই পাশ্চাত্য রচিত মিথ মেনে নিয়েছেন। যেমন বেদে কোথাও লেখা নেই আর্য্য অনার্য্য দুটি জাতি, কিন্তু শাস্ত্রীমশাই আর্য্য অনার্য্যের দ্বিজাতিত্ব যেন মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি সত্যিই মেনে নিয়েছেন কি? কারণ শাস্ত্রীমশায়ের জগতে আর্যরা

বহিরাগত নয়। অতএব আর্য্য অনার্য্য একই জাতির মধ্যে দুটি ভেদ। আর্য্য শব্দটি ঋ + ণ্যৎ থেকে নিষ্পন্ন। অর্থাৎ যারা গতিশীল তারাই আর্য্য। একই সমাজে যারা প্রগতিবাদী তাদের সঙ্গে রক্ষণশীলের দ্বন্দ্ব। শাস্ত্রীমশাই বানরজাতির কথা বলেছেন ঠিকই। কিন্তু এই বানরজাতি শরীরের প্রতীক। আত্মা যতক্ষণ না শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয় ততক্ষণ সে মায়ার সংসারে বিজয়লাভ করতে পারে না। রাক্ষসরা অহমিকা ও লোভের প্রতীক। তাদের ওপর বিজয়লাভ করতে হবে তো। তবেই ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে।

বশিষ্ঠ ব্রহ্মার নির্দেশে সরযূ নদীতে ডুব দিয়ে সপ্তর্ষি মণ্ডলে নক্ষত্র হয়ে জেগে উঠলেন। বিশ্বামিত্র দেহত্যাগ করে ঋভুদের একজন হলেন।

কিন্তু বাল্মীকি বললেন—না আমার পাপ অঢেল। আমাকে এই পাপক্ষালন করতে হবে। যতদিন অস্তিত্বের শেষ মানুষটি সুখী না হবে, ততক্ষণ আমার পাপ ক্ষালন হবে না। ভগবান অবলোকিতেশ্বর যেমন, যতদিন না অস্তিত্বের প্রতিটি পরমাণু নির্বাণ না লাভ করে ততদিন যেমন মুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, অস্তিত্বের সকলের যতক্ষণ মুক্তি না হয়, একজনের মুক্তি কি করে সম্ভব? কারণ একের মধ্যেই তো অপর রয়েছে। তাই বাল্মীকির মধ্যে বুঝি আমরা বোধিসত্ত্বের *archetype* খুঁজে পাই।

আকাশস্য স্থিতির্যাবদ্ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ।
তাবন্মম স্থিতির্ভূয়াৎ জগত দুঃখানি নিঘ্নতঃ।

(বোধিচর্যাবতারে ১০/৫৫)

শাস্ত্রীমশাই দেখিয়েছেন, বাল্মীকি রামায়ণ লেখা হয়েছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে। অতএব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাত্রেরই শেকড় তার সমকালের মাটিতে সুপ্রিতিষ্ঠিত থাকে। যদি সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখি, তবে শাস্ত্রীমশাইয়ের বাল্মীকির জয় সমকালীন ইতিহাসচেতনার একটি জয়স্তম্ভ বিশেষ। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাই, বারে বারে ইউটোপিয়া অথবা ধর্মরাজ্য রচনার চেষ্টা হয়েছে। অশোক, ক্যালভিন, ক্রমওয়েল ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, গান্ধী, গর্বাচভ, টমাস মোর, রুশো ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছেন। বারে বারে তা ভেঙ্গে গেছে। কালের অক্ষদণ্ডে বারে বারে ধর্মরাজ্য রচনার চেষ্টাই যেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপজীব্য।

বাল্মীকি রামায়ণে যা অনুক্ত ছিলো বা ব্যঞ্জনায় ছিল যা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ছিল শাস্ত্রীমশাই তাকে ওভারগ্রাউণ্ডে নিয়ে এসেছেন। শাস্ত্রীমশাই দেখিয়েছেন বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি চরিত্র যে তিনটি *force* তার উদাহরণ। অথবা বাল্মীকি রামায়ণে বলা আছে বাল্মীকি কুশ-লবকে বেদার্থ বোধক রামগান শিখিয়েছিলেন।

বেদোপবৃংণার্থায় অবগ্রাহয়ন্ প্রভুঃ।
কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্ন সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।

বেদের সঙ্গে রামায়ণের এই মিলটি কোথায়, শাস্ত্রীমশাই দেখাতে গিয়ে ঋভুদের সঙ্গীত কিভাবে বাল্মীকির গানকে উদ্বুদ্ধ করেছে দেখালেন।

ঋভুদের গান যেমন বাল্মীকির গানকে উদ্বুদ্ধ করেছে তেমনই বাল্মীকির গান শাস্ত্রীমশায়ের গানকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ঋভুদের অলৌকিক সংগীতে *বাল্মীকির জয়* কাহিনীর শুরু। সেই সঙ্গীত সারা পৃথিবীকে প্রভাবিত করল। প্রত্যেকে তার অনুযায়ী সঞ্চালিত হলেন। জগতের দৈনন্দিন রণরক্তসফলতায় সে সঙ্গীতের স্মৃতি বারে বারে মূর্চ্ছনা হয়ে ফিরে এসেছে, যার ফলে গোটা *বাল্মীকির জয়* যেন

CENTRAL LIBRARY

বারংবার সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় একটি অনাস্বাদিতপূর্ব গীতিকাব্য বলেই কখনও কখনও মনে হয়। শেষ পর্যন্ত বাল্মীকির সঙ্গীতে অনুপ্রাণিত হয়ে ঋভুরা আবার পৃথিবীতে নেমে এলেন। এবং রামায়ণ গান করলেন, অর্থাৎ সঙ্গীতেই বাল্মীকির জয়ের শেষ হয়।

ব্রহ্মার আশীর্বাদে অনন্তকাল বাল্মীকি এখানে সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের গান গেয়ে যাবেন। ঋভুদের অনির্বচনীয় সঙ্গীতে যে কাহিনীর শুরু ঋভুদের অনির্বচনীয় সঙ্গীতে তার শেষ প্রান্ত। এ যেন খেয়ালগান তার মুখে এসে উপনীত হয়েছে। তারপর বিরাট মূর্ত্তির *revelation*. কত কত রামায়ণ তৈরী হয়েছে। আসল রামকাহিনী কোনটা? কিন্তু আসল রামকাহিনী তো একটা আছেই। সেটি অবাঙ্‌মনসোগোচর। সেই বিরাটের দর্শন লাভ করে বাল্মীকি তাই মর্ত্যেই চিরকাল থেকে গেলেন। আর গান গেয়ে চললেন।

পরশুরাম রামকে বলেছিলেন—রাম তুমি আমার স্বর্গের দুয়ার বন্ধ করে দাও। বাল্মীকিও স্বেচ্ছায় স্বর্গ প্রত্যাখ্যান করলেন। আর গান গেয়ে চললেন। আজও তিনি আছেন। গান গেয়ে চলেছেন নানা অবতারে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কি উনবিংশ শতকের বাংলার বাল্মীকি?

কোলরিজের কবি, সূর্য্যালোকে ঝলমল বরফের গুহা তৈরী করেছেন তাঁর কবিতায়। বাল্মীকি এবং *Shelley* বলেন কবির কাজ অনেক বেশী। *Poets are the unacknowledged legislators of the world.* শেলী যদিও ভেবেছিলেন মর্ত্যের সীমাবদ্ধতা আছে—*Our sweetest songs are those that tell us of saddest thought.*

শেলীর স্কাইলার্ক পাখী তাই বিদেহী আত্মা। শাস্ত্রীমশাইয়ের বাল্মীকির কাছে স্বর্গের সঙ্গে এই মর্ত্যের তফাৎ কই? তাই তিনি শরীর নিয়ে মর্ত্যেই গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। এ গানের শেষ নেই।

অতএব বেদমূর্ত্তি শাস্ত্রীমশাইয়ের গল্পের কোনও সমাপ্তি হল না। গল্প মাত্রই কথোপকথন বা *discourse*। এক রামকথার *response*-এ আরেক রাম কথা তৈরী হবে।

আজকের পোস্টমডার্ন নন্দনতত্ত্ব শাস্ত্রীমশাইয়ের *বাল্মীকির জয়* কাহিনীটিকে একটি আদর্শ পোস্টমডার্ন রচনা বলতে কুণ্ঠাবোধ করবে না বলেই মনে হয়। আর আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই রচনা পোস্টমডার্নিজমকে উত্তরণ করেছে। লিওটার্ড বলেন, আজকাল বড় গল্পের দিন চলে গেছে। কিন্তু *বাল্মীকির জয়* সেই মহৎ কাহিনীর অংশ যার শুরু ঋভুদের সঙ্গীতে, যাকে লেখা হচ্ছে, যার লেখা চলতেই থাকবে—মালার্মে যাকে *Great Book* বলে চিহ্নিত করেছেন।

হরি ওঁ তৎসৎ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও পুরাতন বাংলা সাহিত্য

সত্যবতী গিরি

প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্ ও ভারত বিদ্যাবিদ্ হিসেবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেশে বিদেশে সর্বত্রই আদৃত। কিন্তু আমরা জানি তাঁর আরও একটা বড় পরিচয় তিনি একজন কথাশিল্পী। আমার কাছে তাঁর যে পরিচয় সবথেকে গৌরবের তা হল তিনি বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের এক আজীবন সাধক। প্রাক ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, বাঙালির ইতিহাসে তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমার এই আলোচনায় ভারতবিদ্যাবিদ্ হরপ্রসাদের বিপুল কর্মকৃতির মাঝখান থেকে আমি কেবলমাত্র পুরাতন বাংলা সাহিত্য বিষয়ে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব। বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি লিখে যান নি, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির ভূমিকায় তাঁর বক্তৃতা গুলিতে আর সেই সঙ্গে তাঁর লেখা কিছু কিছু প্রবন্ধে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ভিন্নতর ঐতিহাসিক পরিচয় আমরা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।

চর্যাপদের আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মহত্তম কীর্তি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার নতুন দিগ্দর্শন স্থির হয়ে গেছে এই গ্রন্থের আবিষ্কারে। বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর বিপুল জ্ঞান ও আমাদের পরিচয়ের মধ্যে। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধগুলি আমাদের পুরোনো বাংলা সাহিত্য গবেষণায় ও আস্বাদনে নতুন পথের দিশারী। এই প্রসঙ্গে আচার্য হরপ্রসাদ তাঁর 'রাধামাধবোদয়' প্রবন্ধের শুরুতে লিখেছেন—"ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হইয়া অবধি ইংরাজি ধরনের কাব্য নাটক উপন্যাস নবন্যাস নভেল গুপ্তকথা গীতিকাব্য ব্যঙ্গকাব্য নকশা দপ্তর প্রসঙ্গ রচনা প্রহসন অপেরা প্রভৃতি নানারকম তরবেতর সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। লোকে পড়িয়া কত আমোদ পাইতেছে। গ্রন্থকারের কত যশলাভ হইতেছে—ধনলাভ হইতেছে। এই সকল কাব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া কত লোক সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন, কত লোকের উপর আপনাদের মনের ঝাল ঝাড়িতেছেন; ক্রমে সাহিত্য ও দোষগুণ বিচার লইয়া কী একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইংরাজি লেখাপড়া আরম্ভ হইবার পূর্বে আমাদের দেশে কত পুরাণের তর্জমা, রামায়ণ মহাভারতের তর্জমা, কত কীর্তনের গান, কত চরিত, কত লীলা, কত বিলাস, কত মঙ্গল হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে বড়ো একটা খোঁজ খবর নাই। সেকালে কত কাব্য, এমন কি মহাকাব্য পর্যন্ত, লেখা হইয়া গিয়াছে তারো কোনো খোঁজ খবর নাই। তার খোঁজ ও নাই তার দোষগুণ বিচারও নাই। তাহা লইয়া দলাদলিও নাই, ঝাল ঝাড়াও নাই।" উনিশ শতকের নবজাগরণ পর্বে ভারতীয় তথা বাঙালির নিজস্বতা নির্ণয়ের চেষ্টা পরাধীন জাতির, স্বাজাত্যাভিমানেরই প্রকাশ। হরপ্রসাদের এই মন্তব্যও নিঃসন্দেহে তারই প্রমাণ দেয়।

হরপ্রসাদ শুধু এই সম্পর্কে মন্তব্য করে ক্ষান্ত হন নি, পুরাতন নানান অনালোচিত, স্বল্পালোকিত বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণে বাঙালি জাতির পরিপূর্ণ ঐতিহ্যের সাহিত্যিক নির্মাণে নিজে যেমন ব্রতী হয়েছেন অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সারাজীবনের পরিশ্রমে আর নিষ্ঠায় তিনি অস্পষ্ট অন্ধকার অধ্যায়গুলিকে উদ্ধার করেছেন। আর সেই সঙ্গে বাস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে হারিয়ে যাওয়া উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করে বাঙালির সাহিত্যিক মানসের সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করেছেন।

CENTRAL LIBRARY

তাঁর বক্তৃতাগুলি ছাড়াও পুরাতন বাংলাসাহিত্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'মুসলমানি বাংলা শুজ্জু উজাবন বিবির কেচ্ছা' (বিভা, ফাল্গুন ১২৯৪), 'কবি কৃষ্ণরাম' (সাহিত্য, জৈষ্ঠ ১৩০০), 'রাধামাধবোদয়' (নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২২; বৈশাখ ১৩২৩), 'চণ্ডীদাস-১' (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩২৬), 'চণ্ডীদাস-২' (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা; চতুর্থ সংখ্যা ১৩২৯), 'বাংলার পুরানো অক্ষর' (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা; প্রথম সংখ্যা ১৩২৭), 'বাংলা সাহিত্য' (বাসন্তিকা, প্রথম খণ্ড ১৩২৯), 'ডাক ও খনা' (প্রাচী, শ্রাবণ ১৩৩০), 'বিদ্যাপতি' ('কীর্ত্তিলতা', ১৩৩১)।

হরপ্রসাদের প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলি আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে লেখা। এই সময়ে তিনি মূলত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখলেও 'আর্য্যদর্শন' 'কল্পনা' ও 'নব্যভারত' পত্রিকাতেও লিখেছেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁর লেখা সমকালীন বাংলা সাহিত্য নিয়েই। এই পর্যায়েই ১২৮৫-র পৌষ-এর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'।

পরবর্তী পর্বে তিনি ভারতবিদ্যা চর্চা ও গবেষণায় নেতৃত্ব দেন। এ বিষয়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গবেষণায় সহযোগী হিসেবেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের হজ্সন (Brian Hodgson Hodgson, ১৮০০-৯৪ খৃ.) নেপালে ভারত সরকারের প্রতিনিধি রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। নেপালের পণ্ডিত অমৃতানন্দের সাহায্যে তিনি বহু মূল্যবান বৌদ্ধ পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সেই পুঁথি সংগ্রহ রাখা হয়েছিল কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে, লন্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটিতে, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে, অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরিতে ও প্যারিসের সোসাইতে আশিয়াতিক-এ। হজ্সনের এই বিরাট সংগ্রহই বৌদ্ধ বিদ্যার নতুন শাখার গবেষণার সূচনা করে। হজসন ও অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ভারতীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অজ্ঞাত পূর্ব পরিচয় এই পুঁথিগুলির সাহায্যে উদ্‌ঘাটন করেন।

এই সময় তাঁর গবেষণা সঙ্গী হরপ্রসাদ প্রাচীন পুঁথির পাঠ উদ্ধার, তুলনামূলক বিবেচনায় তার সঠিক পাঠ নির্ণয়, লিপির ছাঁদ আর বিবর্তন বুঝতে শেখা, ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ বিষয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ইত্যাদি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি আয়ত্ত করেন।

এতদিন পর্যন্ত মনে করা হতো বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য আবির্ভাবের পর। কিন্তু হরপ্রসাদ তাঁর এই সময়ের নিরন্তর চর্চ্চায় উপলব্ধ করলেন বাঙালির ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আরও পূর্ববর্তী সময় থেকে শুরু হয়েছে। তিনি দেখলেন সংগৃহীত পুঁথিগুলির মধ্যে অনেকগুলি বাংলা-বিহার অঞ্চলের। এ সম্পর্কে তিনি দৃঢ় সূত্র পেলেন পুঁথি পত্রে বাংলা লিপির বিবর্তনের মধ্যে। ১৮৮১-৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলালের সহযোগী হিসেবে কাজের সময় তিনি যেমন ভারতবিদ্যার নানা শাখার গবেষণায় কৃতিত্ব দেখান তেমনি পাশাপাশি আরও বেশ কিছু প্রকল্প তৈরি করে স্বাধীনভাবে কাজ করা যায় এই সত্যটিও উপলব্ধি করেন। এই প্রকল্পগুলিরই একটি হল বাংলাভাষা আর সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস উন্মোচন।

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির ডিরেক্টর অফ দি অপরেশন ইন সার্চ অফ স্যান্‌স্ক্রিট ম্যানস্ক্রিপ্ট পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি পৃথকভাবে বাংলা পুঁথি সংগ্রহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তিন বছরের অনুসন্ধানেই এই সময় পাওয়া গিয়েছিল বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসামঙ্গল', 'রামায়ণ', 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'মহাভারত', 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'অদ্ভুত-রামায়ণ', ও 'কালিকামঙ্গল' প্রভৃতির পুঁথি। তাঁর মতে চতুর্দশ শতাব্দীর নিম্নবর্ণের মানুষের হাতেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি। তারপর পঞ্চদশ শতাব্দি থেকেই সমাজের উচ্চবর্ণের অভিজাত

মানুষেরাও নিজেদের ধর্মীয় প্রতিপত্তির কারণে বাংলায় লেখা শুরু করেন। আর পরবর্তী সময়ে আরাকান রোসাঙের রাজগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় আর চৈতন্য দেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর ১৮৮৯-৯১-এর 'Notices of Sanskrit MSS Vol. X. হরপ্রসাদই তৈরি করেছিলেন। তাতে বাংলা পুঁথির উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রথম তিন বছরের কাজের বিবরণ এই নোটিশের একাদশ খণ্ডে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এরই ভূমিকায় তিনি আলাদাভাবে বাংলা পুঁথি সন্ধানের কথা বলতে গিয়ে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে এই মন্তব্যগুলি করেন।

১৮৮৬-৯৪ পর্যন্ত তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হন। এখানে থাকার সময় সারাবছরের জমা করা ছাপা বইয়ের বিবরণ লিখতে গিয়ে তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতিকেই অনুধাবন করেছেন। কিন্তু এই কাল পর্বেই তিনি লিখেছিলেন—দুটি ইংরেজি প্রবন্ধ—'Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English Education (১৮৯১ খ্রি.) (ভার্নাকুলার লিটারেচার অব বেঙ্গল বিফোর দা ইন্ট্রোডাকশান অব ইংলিশ্ এডুকেশান)। "Ancient Bengali Literature under Muhammadan patronage" (1894) (অ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গলি লিটারেচার আন্ডার মাহমেডান প্যাট্রোনেজ)। প্রথমটি আবার একটি পুস্তিকার আকারে লেখা হয়েছিল। এতে তখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তিনি পুরোনো বাংলা সাহিত্যের একটি রূপরেখা ফুটিয়ে তোলেন। কলুটোলা রিডিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে তিনি এটি প্রবন্ধ হিসেবে পড়েন। এতে ১১৪ জন বৈষ্ণব কবির কথা বলা হয়। সেই সময় 'রামগতি ন্যায়রত্নের' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' আর দু-একটা প্রবন্ধ ছাড়া পুরোনো বাংলা সাহিত্যের আলোচনা আর কিছুই ছিল না। শ্রোতারা পুরোনো বাংলায় এই বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল জেনে আশ্চর্য হয়ে যান। তাঁর এই প্রবন্ধে কিন্তু কোনো পুঁথির পরিচয় দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র ছাপা বইয়ের কথা বলা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে তিনি মুসলমান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত পুরোনো বাংলা সাহিত্যের উল্লেখ করেছেন। এই দুটি প্রবন্ধকে মিলিয়ে নিলেই তৈরী হয়ে যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্র। এই রেখাচিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ আরও পুরানো বাংলা পুঁথি খোঁজার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি বাংলা পুঁথি খোঁজার একটি সংগঠনও তৈরী করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। এছাড়াও তিনি ট্রাভেলিং পণ্ডিতদের মাধ্যমে দূরবর্তী অঞ্চলের পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। চট্টগ্রামের মৌলবি আবদুল করিমের সাহায্যও তিনি পেয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কিছু পরে রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পরিষদ পর্বে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে, ১৩০১ বঙ্গাব্দে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাঙালির নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবেই গড়ে ওঠা এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যোগ দেন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে এই সময় মুনসী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের যোগাযোগ হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে আবদুল করিম লিখেছেন—

"সম্প্রতি 'পরিষদে' আমার প্রাপ্ত পুঁথি প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি জানেন। চট্টগ্রামে এমন কত পুঁথি পাওয়া যায়। আমি আপনাকে সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিতে অক্ষম। ব্রাহ্মণ কায়স্থদের বাড়ী বিস্তর পুঁথি রহিয়াছে। দেশের লোক এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে, এই সকল পুঁথি তাহাদের.... হইলেও তাহাদের মায়া ত্যাগ.... অনিচ্ছুক। ইতিপূর্বেই পরিচয় পাইয়াছি যে, আমি 'ম্লেচ্ছ' মুসলমান। হিন্দুগণ ম্লেচ্ছকে পুঁথি দিতে চায় না বলিয়া আমার পক্ষে পুঁথি সংগ্রহ আরো

কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে নাকি পাপ হয়! হয়! যে দেশের লোকের মনোভাব এইরূপ, সেই দেশে হিন্দু মুসলমানে দিন ২ কাটাকাটি না হওয়াই বিচিত্র।"

পুঁথি সংগ্রহ বিষয়ে হরপ্রসাদের ঐকান্তিকতা আর সেই সঙ্গে এই ব্যাপারে যারা তাঁকে সাহায্য করতে পারেন সেই সংগ্রাহকদের তাঁর প্রতি নির্ভরতার পরিচয়ও পাওয়া যায় আবদুল করিম-এর এই পত্রে। —'আমি দরিদ্র—অন্নচিন্তা জর্জ্জর ব্যক্তি। তাহাতে আপনাদের ন্যায় উচ্চপদেও আরূঢ় নহি। সুতরাং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থ ব্যয় করিয়া পুঁথি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসাধ্য.... তাই আজ আমি আপনার, —এসিয়াটিক সোসাইটির আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। ...আপনারা অর্থ সাহায্য করিলে আমি মাতৃভাষার পূজাপকরণের কতকটা অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব। সম্প্রতি 'ধর্ম্ম ইতিহাস' (গুণরাজ খাঁ প্রণীত)[২] ও 'কণ্বমুনির পারনা'[৩] (ভনিতা নাই) নামক দুইখানি বিক্রেয় পুঁথি পাইয়াছি। প্রথমটার পত্রসংখ্যা ৬২; দুই পৃষ্ঠে লেখা, দ্বিতীয়টী ক্ষুদ্র, ১৩ পাত, দুই পৃষ্ঠে লেখা। কত মূল্যে ক্রয় করা যাইতে পারে জানাইলে বাধিত হইব।' হরপ্রসাদ আবদুল করিমের-ই আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত 'রাধিকার মানভঞ্জন' গ্রন্থটির ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের নামে প্রচলিত এই মুদ্রিত গ্রন্থটি পরিষদ গ্রন্থাবলীর দশম সংখ্যক পুস্তিকা। আবদুল করিমের পত্র থেকে আরও একটি তথ্য জানা যাচ্ছে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের চর্চায় হরপ্রসাদ হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ রাখেন নি। আবদুল করিমের সংগ্রহ ও সম্পাদনা তাঁরই সাহায্যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। আর ইসলামী সাহিত্য নিয়ে তিনি নিজেও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁরই পন্থানুসরণে পরবর্তীকালে ইসলামী বাংলা সাহিত্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন অধ্যাপক সুকুমার সেন। পরবর্তীকালে এই বিষয়ে দুই বাংলাতে গবেষণামূলক আরও কাজ হয়েছে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করেছে সেই সময়েরই সাহিত্য। এ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালিকে নিজের সারাজীবনের কার্যক্রমে ও রচনায় বারবার প্রবলভাবে সচেতন করতে চেয়েছেন তিনি। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরাম সম্পর্কে ও তাঁর রচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও তিনি আবার খেদ প্রকাশ করেছেন—"বঙ্গদেশের বড়ো দুর্ভাগ্য। আমরা দেশের লোক চিনি না। আমরা পীল, ন্যাস, ওয়েবস্টার, বোমন্ট, ফ্লেচার, ডেবেনান্ট, ফারকুহার, কন্‌গ্রীব, সাওওয়েল, মৈসন, জর্জ্জ উইদার, জন বলখিল, জন ক্লেবলন্ত প্রভৃতি পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর কবির কাব্য পাঠ করিয়া ও তাঁহাদের জীবন চরিত পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করি, অথচ আমাদের নিজের দেশের কবিদের কথা কিছুই জানি না। দেশের মধ্যে কয় জন লোক বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচন দাস, নরোত্তম দাস, যদুনন্দন দাস, চূড়ামণি দাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈষ্ণব কবিগণের নাম অবগত আছেন? দুই-চারি জন বরং বৈষ্ণব কবিগণের দুই-পাঁচটি নাম জানিতে পারেন, কিন্তু অবৈষ্ণব কবিগণ এদেশে চিরকালই বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন।"

এই বিস্মৃতি থেকে বাঙালি জাতি আর বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করার জন্যই তিনি বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অন্যতম কবি কৃষ্ণরামকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। হরপ্রসাদ কৃষ্ণরামকে তাঁর প্রবন্ধে বিদ্যাসুন্দরের প্রথম কবি বললেও পরবর্তী গবেষণায় জানা গেছে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নিয়ে প্রথম কাব্য লিখেছিলেন হুসেনশাহের নাতি ফিরোজশাহের অনুচর। কবি শ্রীধর। কিন্তু এই আবিষ্কারেও তাঁর প্রবন্ধের গুরুত্ব কমে যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরামের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালিকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁরই। পরবর্তীকালে কৃষ্ণরামের অন্যান্য বেশ কিছু কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি উপযুক্ত সম্পাদনায় প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম পথিকৃৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পুরাতন বাংলার সাহিত্যের গুরুতর একটি সমস্যা কবি চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ। এই চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ নিয়ে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় হরপ্রসাদের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিতে বীরভূমের সহজিয়া চণ্ডীদাস সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাঢ়ভূমির প্রাচীন ইতিহাস নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। আলোচনায় তাঁর কিছু কিছু সরলীকৃত সিদ্ধান্ত এখন বিতর্ক তৈরি করে। যেমন তাঁর মতে সহজিয়া হিন্দুদের সর্বপ্রধান জয়দেব ঠাকুর। কিন্তু আবারও বলি প্রথম পথিকৃৎ হিসেবে তাঁর অসামান্য অবদান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় চিরকালই গুরুত্ব হবে। চণ্ডীদাস বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯-এর চতুর্থ সংখ্যা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়। এই প্রবন্ধে তিনি বসন্তরঞ্জন আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বড়ু চণ্ডীদাস লক্ষণ সেনের সময়ে দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন। আর জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকেই অনেক কথা ও ভাব গ্রহণ করেছেন। হরপ্রসাদের এই অভিমত এখন বাংলা সাহিত্যের কোনো ঐতিহাসিক-ই গ্রহণ করেন না। বিশেষত জয়দেবকে বড়ু চণ্ডীদাসই আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করে গ্রহণ করেছেন এ ব্যাপারেও আমাদের কোনো সংশয় নেই। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণপুরুষ হিসেবে সদ্য আবিষ্কৃত এই গুরুত্বপূর্ণ পুঁথিটির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বিদ্যাপতি সম্পর্কেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, তাঁর কবিতার ভাষার অনুকরণেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল ব্রজবুলি ভাষা। দ্বিতীয়ত রাজা শিব সিংহের পত্নী লছিমা দেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রেম সম্পর্কের জন্যই তিনি কৃষ্ণরাধার প্রেম নিয়ে পদ লিখেছেন, সুতরাং তিনি সহজিয়া কবি বাঙালি সহজিয়াদের এই মতকেও তিনি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। তৃতীয়ত বিদ্যাপতির অন্যান্য কিছু কিছু রচনার সঙ্গেও এই প্রবন্ধে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কবি বিদ্যাপতির সামগ্রিক মূল্যায়নও করেছেন এইভাবে—"তাঁহার সমস্ত রচনা বেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে তিনি শুদ্ধ কবি ছিলেন না, ঐতিহাসিক ছিলেন, রাজ কর্মচারী ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মপ্রচারক ছিলেন এবং অল্পভোগী রাজাদিগের যে বিশেষ কর্তব্যকর্ম ছিল, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া সেই কার্যটি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।" (পৃ. ৭৮১)

এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বিদ্যাপতির পদ সংগ্রাহক জর্জ এ গ্রিয়ার্সনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই বিদেশী সাহিত্য সংগ্রাহককে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করেন। উচ্ছ্বসিত গ্রিয়ার্সন হরপ্রসাদের চিঠির উত্তরে তাঁকে লিখেছিলেন—"Your letter... of the 17th June was indeed a most pleasant surprise to me. I hasten to thank the Bangiya Sahitya Parishad for the honour it has done me in electing me an Honorary Member, and you for the extremely kind language in which you conveyed to me the news." (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থ; পৃ. ৫৫; পত্র সংখ্যা ৪৩)। অন্য আরেকটি চিঠিতেও গ্রিয়ার্সন হরপ্রসাদের ভূমিকা সম্বলিত কীর্তিলতা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা জানিয়েছেন।

হরপ্রসাদ যে সময়ে পুরোনো বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে শিক্ষিত বাঙালির গোচরে আনার চেষ্টা করছেন সে সময় সারদাচরণ মিত্র, জগৎবন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রমনীমোহন মল্লিকের মতো মাত্র কয়েকজন এই বিষয়ে মনোযোগী হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের আবিষ্কার হরপ্রসাদের অসামান্য কীর্তি হলেও এই প্রসঙ্গে তাঁর অন্যান্য অবদানগুলির কথা উল্লেখ করতে হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে তিনি ধর্ম মঙ্গলের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর

CENTRAL LIBRARY

রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল আর 'Discouery of Living Buddhism in Bengal' রচনা দুটিতে ধর্মপূজার মধ্যে অনার্য লৌকিক উপাদানের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা তিনিই প্রথম বলেছেন। ধর্মঠাকুর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আনার জন্য তিনি বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থকে ময়নাগড়ে ও রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থকে ঘাটালে পাঠিয়েছিলেন। মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস আহরণের জন্য ক্ষেত্রানুসন্ধানের এই পদ্ধতি অবলম্বনও তাঁর অন্যতম কীর্তি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর বিভিন্ন লিখিত অভিভাষণেও বারবার নানাভাবে প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির প্রসঙ্গ এনেছেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে কলকাতার টাউন হলে ২৭-২৯শে চৈত্র পর্যন্ত সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে একটি লিখিত অভিভাষণ পড়েন। এটি ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও আষাঢ় সংখ্যায় মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে হরপ্রসাদ মূলত আধুনিক সাহিত্যের প্রসঙ্গ আনলেও ২৪ পরগণায় ও কলকাতায় যেহেতু এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই কারণেই এখানকার প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতির সশ্রদ্ধ উল্লেখ তাঁর এই অভিভাষণে পাওয়া যায়। শ্রী চৈতন্য দেবের গুরু ঈশ্বরপুরীর বাড়ি ছিল হালিশহর বা কুমারহট্টে। পানিহাটির রাঘব পণ্ডিত চৈতন্যদেবের সেবক ছিলেন। এঁর উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় দশম পরিচ্ছেদে। এছাড়াও তিনি ষোড়শ শতাব্দীর ভাগবত অনুবাদক রঘুনাথ ভাগবত আচার্যেরও উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাগবত অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী' যথাক্রমে নগেন্দ্রনাথ বসু ও বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ২৪ পরগণার পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাস তাঁর এই প্রবন্ধে পাওয়া যায়। ২৪ পরগণার কালু রায়, দক্ষিণ রায়, বনবিবি, সাজঙ্গলীর উল্লেখে দক্ষিণ ২৪ পরগণার এই লৌকিক দেবতাদের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। তবে কালু রায় আর দক্ষিণ রায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই অভিমত আধুনিক গবেষণায় পরিত্যক্ত।

হরপ্রসাদ সুন্দরবনের পীর গোরা চাঁদের কথা বলেছেন। ইনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই আরাধ্য দেবতা। হরপ্রসাদ এঁর উৎস নির্ণয় করতে না পারলেও পরবর্তী গবেষণায় তাঁর পরিচয় জানা গেছে—"গোরাচাঁদ পীরের প্রকৃত নাম হজরত শাহ্ সৈয়দ আবাস আলী। জন্ম আরবে, ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে। চিরকুমার আব্বাস আলী আরবি ফারসিতে সুপণ্ডিত ছিলেন, বাংলাদেশে এসে বাংলাভাষা আয়ত্ত করেন। গৃহত্যাগী সিদ্ধপুরুষ ২১ জন আউলিয়া সঙ্গে নিয়ে দিল্লি থেকে সিলেট হয়ে ২৪ পরগণার বালান্ডা পরগণায় হাড়োয়াতে আস্তানা স্থাপন করেন। এখনো হাড়োয়ায় প্রতি বৎসর ১১ ফাল্গুন থেকে তিন দিন পীরের ওসশরিফ উপলক্ষে উৎসবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাবেত হন।" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড; পৃষ্ঠা ২৯০; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বনও মেলা, তৃতীয় খন্ড, দিল্লী, ১৯৭১।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২০-২২শে চৈত্র অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মূলত বাংলা ভাষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেও অভিভাষণের প্রথমাংশে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নিয়েই আলোচনা করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের শূন্যপুরানের প্রাচীনত্বের দাবিকে অস্বীকার করে তিনি চর্যাপদের প্রাচীনত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গোপীচন্দ্রের গীত ও তাঁর মতে মুসলিম বিজয়ের আগে লেখা। তুর্কী আক্রমণ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়েও তাঁর বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে যথার্থভাবে অনুধাবনের ক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মতে বাঙালি হাস্যরস ভালবাসে বলেই পুরোনো বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের প্রসঙ্গ এসেছে। কথা কাটাকাটি ভালবাসে বলেই অঙ্গদ রায়বার

লব কুশের যুদ্ধ তৈরী হয়েছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি রঘুনন্দনের যে মূল্যায়ন করেছেন তা অতিশয়োক্তি আছে। রঘুনন্দন তাঁর 'রামরসায়ন' লিখেছিলেন ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে। 'রাধামাধবোদয়' নামে কৃষ্ণলীলাকাব্য রচনা করেন ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রাথমিক পর্বেও রঘুনন্দনের মত করিয়া মধ্যযুগীয় সাহিত্যরীতির অনুবর্তন করে বলেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে গতি প্রকৃতি বিচারে এই কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন থাকলেও—'রাধামাধবোদয়'-ই বৈষ্ণব ধর্মের একখানা বড় মহাকাব্য তাঁর এই মতকে মেনে নেওয়া যায় না।

১৩২০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ১৩২১-এর ৩১শে জৈষ্ঠ্য তারিখে বার্ষিক অধিবেশনে তিনি যে সভাপতির অভিভাষণটি পড়েন, তাতে মূলত বাংলা পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাস ও বিবরণ আর সেই সঙ্গে চর্যাপদ ও দোহাকোষ সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা ও তাঁর পুঁথি সংগ্রহের কথাও তিনি বিস্তৃতভাবে বলেছেন। বাংলা সাহিত্যের অনালোকিত অংশকে এইভাবে সংগ্রহের কাজে তাঁর নিষ্ঠা পরিশ্রম ও অন্যকে প্রণোদিত করার প্রেরণা দেওয়ার ক্ষমতাই তাঁকে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নবরূপকারের মর্যাদা দিয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৮তম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত তাঁর অভিভাষণেও মূলত চর্যাপদ নিয়েই আলোচনা করেছেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৩২শে জৈষ্ঠ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৩৬তম বার্ষিক অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে অভিভাষণটি পাঠ করেন তিনি তাতে পুরাতন বাংলা সাহিত্য নিয়ে, বাংলা ভাষা নিয়ে যারা চর্চা করেছেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁদের অনেকেরই নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন নগেন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র রায়, যোগেশচন্দ্র রায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র শীল, বসন্তরঞ্জন রায়, একেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ শহীদ উল্লাহ, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, মনীন্দ্রমোহন বসু, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের কাজেরও সংক্ষিপ্ত বিবরনী তাঁর এই অভিভাষণে আছে। সুনীতিকুমার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—'সুনীতি কুমার দুই একটি ভালো চেলা তৈয়ার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান সুকুমার সেন [জ. ১৯০০ খৃ.] একটি। তিনি আমাদের শব্দ শাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ দিয়াছেন।" [হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৬১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথা সাহিত্যিক হিসেবেও বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়ার দাবি রাখেন। তাঁর 'বেনের মেয়ে' অত্যন্ত সুলিখিত, সুখপাঠ্য একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমি বাংলায় মুসলমান অধিকারের আগের যুগের সামাজিক ইতিহাস। ইতিহাস চর্চায় বহুদিন ধরে গবেষকদের মনোযোগ ছিল রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস সংগ্রহ করা। রাজবৃত্তের ইতিহাসকেই দেশের ইতিহাস মনে করা হত। কিন্তু হরপ্রসাদ তাঁর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে বাংলায় বৌদ্ধ ভাবের বিলোপ আর সেই সঙ্গে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই উপন্যাসে চর্যাপদের আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদের উল্লেখ আছে। চর্যাপদের সময়টি আর সেই বাতাবরণটি এই 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে উঠে এসেছে। বাঙালির জাতিবৃত্তির নানা বৈচিত্র্যকেও এবং তার নানা সামাজিক কারনকেও তিনি তাঁর এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই উপন্যাসটি তাঁরই আবিষ্কৃত সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, সরহ ও দোঁহাকোষ, চর্যাচর্য বিনিশ্চয়, ডাকার্নব ও সাধনমালা প্রভৃতি পুঁথির সাহায্যেই গড়ে উঠেছে।

অন্যদিকে হরপ্রসাদের একটি রম্যরচনার কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দের 'বসুমতী' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায়। এই রম্য রচনাটির শিরোনাম 'এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস'। বৈষ্ণব পদাবলীর এই পদটিকে তিনি কিছুটা বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর আদলেই রচনা করেছেন। আর সেই সঙ্গে এখানে পাওয়া যাচ্ছে বৃন্দাবন মহিমা সম্পর্কে হরপ্রসাদের নিজস্ব অনুভবের কাব্যিক বিস্তার—"সেই আমার বৃন্দাবন। বৈষ্ণবের বৃন্দাবন পরম স্বর্গ..... সেখানে যমুনার জল কুলকুল করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

.....নভেল গুপ্তকথা গীতিকাব্য ব্যঙ্গকাব্য নক্‌শা দপ্তর প্রসঙ্গ রচনা প্রহসন অপেরা প্রভৃতি নানারকম তরবেতর সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। লোকে পড়িয়া কত আমোদ পাইতেছে। গ্রন্থকারের তীরে কদম গাছে ফুল ফুটিয়া দিক আলো করিয়া আছে আর তাহার উপর ময়ূর-ময়ূরী পেখম ধরিয়া নাচিতেছে। সবুজের ভিতর হলিদা, হলিদার ভিতর সাদা, তাহার উপর চুনোট করা মনি মুক্তার কাজ, কত মণির কত রকম রঙ মিলিয়া মিশিয়া ঝক্‌মক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সেই বৃন্দাবনে শ্যামের বাঁশরি বাজে, সে বৃন্দাবনে গোপিনীরা রাসলীলায় নাচে। মাঝে নবঘনশ্যাম, চারিদিকে বিদ্যুদবরণী গোপীগণ যেন মেঘ বেড়িয়া বিদ্যুন্মালা হইয়া বেড়িয়া নাচিতেছে। এই সুখের বৃন্দাবন বৈষ্ণবের শেষ গম্যস্থান।" [পৃষ্ঠা-৫৪৯; প্রথম খন্ড; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ; দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯১]

হরপ্রসাদের প্রাচীন বাঙ্‌লা পুঁথি ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যচর্চা উনিশ শতকের নবজাগরণ পর্বে বাঙালি জাতিরই আত্ম-আবিষ্কারের একটি প্রয়াস। উনবিংশ শতাব্দীতে পরাধীন বাংলা, ইংরেজের উপনিবেশ বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে সৃষ্টির কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন তারই একটি দিক ছিল বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার ধারা। হরপ্রসাদের প্রাচীন সাহিত্য চর্চায় ও আবিষ্কারে সেই বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেশ কিছু গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করে ছিলেন। সেই ভূমিকার আলোচনাতেও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও সারস্বত দায়বদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই ধরনের রচনাগুলির মধ্যে আছে বলরাম কবিশেখর রচিত ও চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ সম্পাদিত 'কালিমঙ্গলের ভূমিকা' (১৩৩৭)। তাঁর নিজেরই সম্পাদিত 'বিদাপতির কীর্ত্তিলতার ভূমিকা' (১৩৩১), বনমালীদাস রচিত, অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত 'জয়দেব চরিত্রের ভূমিকা' (১৩১২), নরোত্তম ঠাকুর রচিত আব্দুল করিম সম্পাদিত 'রাধিকার মানভঙ্গের ভূমিকা' (১৩১২)।

কালিকা মঙ্গলের এই ক্ষুদ্রায়তন ভূমিকাতেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মূল উৎসকে সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করেছেন। গুজরাটের রাজধানী অনহিলপত্তনে একাদশ শতাব্দীতে এই কাহিনী তৈরী হয়। কাহিনীটি প্রথমে ছিল একেবারেই আদিরসাত্মক। কিন্তু বাংলাদেশে এটি প্রচারিত হওয়ার পর এর মধ্যে মঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য এসে গেছে। এ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন— 'ইহা (বিদ্যাসুন্দর) আর আদিরসের গল্প নাই, ইহা কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার কবিরা প্রথমেই স্বর্গের একটা বর্ণনা করেন। সেইখানে কোনো না কোনো দেবতা আপনার পূজা প্রচারের জন্য বড়ো ব্যস্ত হন, এত ব্যস্ত হন যে, সময় সময় দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা কোনো না-কোনো দেবযানিকে শাপভ্রষ্ট করিয়া মর্তে পাঠাইয়া দেন; তাঁহারা দেবতার পূজা প্রচার করিয়া আবার স্বর্গে ফিরিয়া যান। মর্তে তাঁহাদের যখন কোনো বিপদ উপস্থিত হয়, তাঁহারা দেবতাদের স্মরণ করেন, আর দেবতারা আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দেন।" [পৃ. ৬৮১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, চতুর্থ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯]। 'বিদ্যাসুন্দর' গল্পের বাংলাদেশে এসে এই পরিবর্তনের ব্যাপারটিতে গল্পের ভিতর গল্প এই বৈশিষ্ট্যটি এসে গেছে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বৃহৎকথা, কথা সরিৎসাগর ও অন্যান্য পুরানের গল্পেও এই বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। হরপ্রসাদ কাহিনীর ভারতীয়ত্বের এই বৈশিষ্ট্যটির কথা বিশেষভাবে বলেছেন।

'কীর্ত্তিলতার ভূমিকা'য় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নেপাল দরবারে গিয়ে 'বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতা' ও 'কীর্ত্তিপতাকা' গ্রন্থ দুটি দেখতে পান। আর সেগুলির প্রতিলিপি তৈরী করে নিয়ে আসেন। আবার ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে নেপালে গিয়ে পুঁথি দুটি ঠিক আছে কিনা দেখে আসেন। পরে মহারাজা সার চন্দ্র সম্‌সের জঙ্গ মহাশয়ের দাক্ষিণ্যে 'কীর্তিলতা' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য পুঁথিটি বিদ্যাপতির মাতৃভাষা মৈথিলিতেই লেখা। এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাপতির পদগুলির সঙ্গে 'কীর্তিলতা'র পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। বিদ্যাপতির পদগুলি আদিরসের, অন্যদিকে 'কীর্তিলতা' সমকালীন রাজনীতি আর যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে লেখা। পুরাতন পুঁথি সম্পাদনার ব্যাপারে হরপ্রসাদ যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করেছেন তাও তিনি জানিয়েছেন পল্টু ঝাঁ নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ মৈথিলি পণ্ডিত ও এশিয়াটিক সোসাইটির উজাগর চৌবে এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছেন।

ভূমিকায় 'কীর্ত্তিলতা'র বিষয়বস্তু সম্পর্কেও তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

আচার্য হরপ্রসাদ রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ নামে এক ব্যক্তিকে বাংলা আর সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেছিল। বনমালী দাস রচিত 'জয়দেব চরিত্র' তাঁরই সংগ্রহিত পুঁথি। এটি মাত্র ২৪ পৃষ্টার পুঁথি। কিন্তু এর গুরুত্ব হল এটি অত্যন্ত প্রাচীন পুঁথি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে এটি তিনশ বছর আগে লেখা। পুঁথিটি সম্পাদিত করেছেন অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। কিন্তু হরপ্রসাদ ভূমিকায় কবির পরিচয় নির্ণয়ের মত দুরূহ কাজটি করেছেন। এই পুঁথিটি সম্পূর্ণ না হলেও কেন এটি প্রকাশ করা হয়েছে এর গুরুত্ব কোথায় তা খুব স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করেছেন—"আমরা উহা প্রকাশ করিয়াছি তাহারা কারণ এই যে, উহাতে জয়দেবের যা হোক একটি জীবনচরিত আছে। বৈষ্ণবগণ জয়দেবকে যেভাবে দেখিতে ভালোবাসিতেন সেই ভাবের পূর্ণ ইতিবৃত্ত ইহাতে আছে। আমরা যাহাকে ইতিহাস বলি উহাতে তাহার কোনো লক্ষণ নাই। তথাপি তিনশত বৎসর পূর্বে বাঙালি ভক্তবৃন্দ ভক্তচূড়ামণি জয়দেবকে যেভাবে দেখিতেন উহাতে তাহার পূর্ণ চিত্র আছে।" [পৃ. ৫৪১; তদেব]। এই বইটি থেকে জয়দেবের পিতা-মাতা আর স্ত্রী নাম, পরাশর প্রভৃতি বন্ধুদের প্রসঙ্গ, তাঁর জন্মস্থান কেন্দুবিল্লের উল্লেখ ও সেন রাজসভার চাররত্নের উল্লেখ আছে।

আব্দুল করিম সম্পাদিত 'রাধিকার মানভঙ্গের ভূমিকা' লিখতে গিয়ে তিনি আব্দুল করিমের ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্য প্রীতির ও তাঁর সম্পাদনা কর্মের প্রসংশা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে পুঁথি দেখে বই ছাপানো কঠিন। ফটোগ্রাফ-ই ভালো। কিন্তু আব্দুল করিম দরিদ্র হয়েও ফটোগ্রাফ তোলার অর্থ না থাকা সত্ত্বেও পুঁথি যথাযথভাবে পাঠ করে যেভাবে সম্পাদনা করেছেন হরপ্রসাদ মুক্ত কণ্ঠে তার প্রশংসা করেছেন। এই কাব্যটির রচয়িতা নরোত্তমের পরিচয় ও তিনি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের নরোত্তমের সঙ্গে এঁর অভিন্নতাও তিনি নির্ণয় করেছেন। এই নরোত্তম-ই খেতুরির উৎসবের প্রবক্তা। নরোত্তমের রচনাশৈলীর প্রশংসা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন—"যাঁহারা খাঁটি বাংলার পক্ষপাতী, তাঁহাদের মন দিয়া নরোত্তমের গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থ পাঠে বাংলা ভাষায় অল্প কথায় কত প্রকারের কত ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, বাংলার রচনা কত মধুর, মধুর হইতে মধুরতর হইতে পারে, এবং উহার সুর কত উচ্চ উঠতে পারে, ইহা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। দেখিলে বাংলা ভাষার প্রতি আর অবজ্ঞা করিতে কাহারো সাহস হয় না, এবং ইহার মহিয়সী-ভাব-প্রকাশ-শক্তি সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ থাকে না।" (পৃ. ৫৪৬) মহাভারত আদি পর্ব—হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এরই ভূমিকায় হরপ্রসাদ যে আলোচনাটি করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে প্রথমেই তিনি তাঁর ক্ষেত্র সমীক্ষার কথা বলেছেন। ১৮৮০-৮১

খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাশীরামের বাস্তুভিটা সিঙ্গী গ্রাম দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কাশীরামের ভিটা, দিঘী এবং কাশীরামের পাঠশালাও দেখেছেন। এরপর হরপ্রসাদ বলেছেন, তাঁর ছেলেবেলায় বটতলায় বাঁধানো বই-এর কথা। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি আলোচনা করেছেন। যেমন মহাভারতে প্রথমে ৮,৮০০ শ্লোক পাওয়া গেলেও পরে ২৪,০০০ শ্লোকের মহাভারত পাওয়া যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এটি দাঁড়িয়েছে লক্ষ শ্লোকে। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী বলেছেন মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা হিসেবে ব্যাসদেবের নাম করা হলেও পুরাণগুলি ব্যাস দেবের লেখা নয়।

তাঁর মতে কাশীরাম সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করেন নি, বিভিন্ন জনের কাছে মহাভারতের গল্প শুনে এবং কয়েকটি বাংলা মহাভারতের উপর নির্ভর করেই তাঁর মহাভারত রচনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা এই মতকে স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে কাশীরাম দাসের মহাভারতের কিছু কিছু অংশে প্রায় মূলানুগ অনুবাদ পাওয়া যায়। আধুনিক সম্পাদনায় কাশীরামদাস সংস্কৃত মহাভারত থেকে কতটুকু নিয়েছেন এবং হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মত পুরাণগুলি থেকে কতখানি নিয়েছেন, তা দেখানো হয়েছে। তাঁর এই আলোচনায় হরপ্রসাদ কাশীদাসী মহাভারতের প্রাপ্ত পুঁথির ভাষা বৈশিষ্ট্য ও ভাষার অসঙ্গতি সম্পর্কে খুবই বিস্তৃতভাবে ও বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন (১) বাংলায় এখন যেখানে 'নাহিক' ব্যবহার করা হয়, কাশীরাম সেখানে 'শহিখ' ব্যবহার করেছেন। (২) অণিজন্ত ক্রিয়াকে ণিজন্ত ক্রিয়ার মত ব্যবহার করেছেন। (৩) বর্তমান কালে মধ্যমপুরুষের একবচনের ক্রিয়ায় 'সি' বিভক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। (৪) অতীত কালে উত্তম পুরুষের একবচনে 'লাঙ', 'লুঙ', 'লু', 'নু' বিভক্তি-র প্রাচীন ও খাঁটি রাঢ়ি প্রয়োগ একথাও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাশীদাসী মহাভারত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর উদাহরণ হিসেবে বেশ কয়েকটি ক্রিয়াপদেরও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—কৈলু, কৈনু, গেলাঙ, পালিলাঙ, হইলাঙ্, লইলু, চিনিলু ইত্যাদি।

কাশীরাম দাসের মহাভারতে রাঢ়ভূমির ভাষা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত এটি তিনি প্রমান করেছেন। যেমন—ক্রিয়ার জীবেক, নইবেক, বলেক ইত্যাদি রূপ রাঢ়ের।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাদের দেখিয়েছেন কাশীরাম দাস অনেক সময়ে এমনভাবে পদযোজনা করে বাক্য বা বাক্যাংশ রচনা করেছেন যে, আমরা এখন তার অর্থ বুঝি না অথবা তিনি যে অর্থে তা ব্যবহার করেছেন, তার থেকে ভিন্ন অর্থ বুঝি। যেমন—

(১) "সখারে দংশিল আসি হাস্যের কারণে।।"
অর্থাৎ, উপহাসচ্ছলে সখাকে দংশন করলাম।

(২) "অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি থাক পিছে।"
অর্থাৎ, পাছে আমার মতো অকালে ভেঙে ফেল।

(৩) "আসিবার অকারণ না হোকু আমার।।"
অর্থাৎ, আমার আসা ব্যর্থ হবে না।

(৪) "জাহে জর্ম্ম কাটে কর্ম্ম গঙ্গা ত্রিপথগা।।"
অর্থাৎ, যা থেকে জন্মে ত্রিপথগা গঙ্গা কর্মফল থেকে মুক্তি দেন।

(৫) "হেন কালে সূর্য্যে বৈল দেব নারায়ণ।"
অর্থাৎ, সূর্য দেব নারায়ণকে বলল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে পুথিটি ব্যবহার করেছিলেন, তার শব্দগুলির বৈশিষ্ট্যও তিনি নির্ণয় করেছেন। এবং বেশ কিছু অপ্রচলিত শব্দের অর্থও দিয়েছেন। এই ধরনের শব্দার্থ নির্ণয়ও তাঁর

CENTRAL LIBRARY

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চাকে বিশেষভাবে ঐশ্বর্যময় করে তুলেছে। বহু শব্দের মধ্যে আবার যেগুলি কিছুটা প্রচলিত, সেইগুলিকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। এইভাবে মধ্যযুগের বাংলার রাঢ় অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্ট্যও তাঁর মহাভারত সম্পাদনায় নির্ণীত হয়েছে। তাঁর দেওয়া কিছু শব্দ ও তার অর্থের তালিকা উদ্ধৃত করা হল—

অকুমারী	=	কুমারী
অতিত	=	অতিথি
অনুব্রত	=	অনবরত
অনোচিত	=	অনুচিত
আই	=	দিদিমা, আজিমা
আউ	=	আয়ু
ইথি	=	ইহাতে
ইবে	=	এবে, এখন
উকটিআ	=	অন্বেষণ করিয়া
উচ্ছব	=	উৎসব
উপগার	=	উপকার
উরাত	=	উরু
উলি	=	অবতরণ করিয়া
এহা	=	ইহা
ওদর	=	উদর
কড়িআলি	=	লাগাম
কন্দুল	=	কোন্দল
কোপল	=	মূল
খণ্ড	=	ধূর্ত, শঠ
খুলিল	=	খুঁড়িল
গোড়াইল	=	অনুসরণ করিল
গোহারি	=	দোহাই, নিবেদন
ঘারিল	=	জর্জরিত করিল
ঙুচ	=	উচ্চ
চির্ণ	=	চিহ্ন
ছাওাল	=	ছেলে
জথি	=	জে, জাহা, জাহাতে
জর্ম্ম	=	জন্ম
জিল	=	বাঁচিল
ডাকাচুরি	=	ডাকাতি
তৎকালে	=	এখনই

CENTRAL LIBRARY

তথি	=	সে, তাহা, তাহাতে
তুঞিঃ	=	তুই
তেকারণে	=	সেই হেতু
তেঞিঃ	=	সেই হেতু
দুস্খী	=	দুঃখী

তাহলে দেখা যাচ্ছে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুরাতন সাহিত্য চর্চার কয়েকটি দিক আছে। (১) ক্ষেত্রানুসন্ধান (২) সম্পাদনা, (৩) আলোচনা, (৪) পুথি সংগ্রহ। ১৯ শতকের জাতীয়তাবাদী বাঙালি আত্মসত্তা আবিষ্কারের যে নানামুখী চেষ্টা করেছিলেন, হরপ্রসাদশাস্ত্রীর এই কঠোর পরিশ্রম ও অনুশীলন সাধ্য চর্চায় সেই স্বাজাত্যাভিমানী বাঙালিরই ভিন্নতর একটি পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্রসাদের এই চর্চায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাঁর ইতিহাস বোধ ও প্রবল সাহিত্যানুরাগ। আগেই বলেছি বাংলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাস তৈরীর দায়িত্ব তিনি অনেকাংশে, পালন করেছেন।

এখন পুরোনো বাংলা সাহিত্য চর্চার বিশেষ করে, অপঠিত অসম্পাদিত পুঁথি সংগৃহীত করার ও সংরক্ষিত রাখার অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তৈরী হয়েছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে পুথি চর্চা তো দূরের কথা পুরাতন বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রতি যে অনীহা লক্ষ করা যায়, আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুরাতন বাংলা সাহিত্য চর্চার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশেষভাবে তাঁদেরই মনোযোগ আকর্ষণের জন্য।

CENTRAL LIBRARY

দুটি বই ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নির্মল দাশ

বাংলা ভাষা নিয়ে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একটা অংশে এখন বেশ হই চই চলছে। প্রায় প্রতিদিন কাগজ খুললেই বাংলা নিয়ে নানা আর্তনাদ, দীর্ঘশ্বাস, আক্ষেপ ইত্যাদি শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ হিতৈষীর মতো অযাচিত উপদেশও দিচ্ছেন। খবরের কাগজে এঁদের লেখা উত্তর-সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার বোঝা মুশকিল তাঁরা আসলে কী বলতে চাইছেন। তাঁরা সত্যিই সদর্থক কিছু করতে চাইছেন না সুলভ আত্মপ্রচারই তাঁদের মূল লক্ষ্য? অর্থাৎ উজ্জ্বল আলোর বদলে কেবলই অস্পষ্ট ধোঁয়াশা। বাংলা ভাষা নিয়ে বাংলাভাষী শিক্ষিত সমাজের একটা অংশের এই ধোঁয়াটে অবস্থান নিতান্ত সাম্প্রতিক ব্যাপার নয়। বাংলা ভাষার ব্যাপারে বাঙালির এই ধোঁয়াটে অবস্থান ইতিহাসের ধারায় আবদ্ধ। হাজার বছর আগে যখন বাংলা ভাষার উন্মেষ হয়েছিল তখন উচ্চবর্গীয় বাঙালি কবিরা কাব্যচর্চা করলেও তা লিখতেন সংস্কৃত ভাষায়। এই সময়ে সহজিয়া বৌদ্ধ ও নাথপন্থীরা বাংলায় পদ্য লিখলেও উচ্চবর্গীয়দের চাপে সেগুলোর কোনো কোনোটি দীর্ঘদিন অন্তর্হিত ছিল, কোনো কোনোটি এখনো অন্তর্হিত। তুর্কি আগমনের ফলে সংহতি ও জনসংযোগের দায়ে কৃত্তিবাস বা মালাধরের মতো উচ্চবর্গীয় কবিরা বাংলায় লিখতে বাধ্য হলেন বটে, কিন্তু তা-ও বেশ কৌশল করে। কখনও বললেন 'লোক নিস্তারিতে কহি লৌকিকের ভাষে', কখনও-বা বাংলায় লেখা পুথির গৌরব বাড়ানোর জন্য স্বপ্নাদেশের গল্প ফাঁদলেন। অর্থাৎ এঁরা বাংলায় লিখলেন বটে, কিন্তু একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে। চৈতন্যদেবের ভক্তি-আন্দোলনে এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে, কারণ তিনি নিজে নামী সংস্কৃতজ্ঞ হলেও তাঁর আন্দোলনের ভাষা ছিল বাংলা। তাঁর আন্দোলনের ফলে উচ্চবর্গীয়রা বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলায় লিখলে তাতে কোনো সামাজিক অগৌরব নেই। এই কারণে যে-মুরারি গুপ্ত প্রথমে চৈতন্যজীবনী লিখতে গিয়ে উচ্চবর্গীয় সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করেছিলেন, সেই মুরারি গুপ্তই পরে গৌরবন্দনা লিখেছেন বাংলা ভাষায়। শুধু বৈষ্ণব কবিরাই এই আন্দোলনে প্রভাবিত হননি, এই আন্দোলনের ঢেউ অন্য বিষয়ের কবিদেরও স্পর্শ করেছিল। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণবৈদ্য-কায়স্থ বংশের বাঙালি কবিরা এবার অসংকোচে মাতৃভাষায় মঙ্গলকাব্য অনুবাদকাব্য রচনায় ব্যাপৃত হলেন। কিন্তু উনিশ শতকে এসে আবার অবস্থা পালটাল। এবার নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক -সামাজিক পরিস্থিতিতে বাঙালি সমাজে নতুন শ্রেণীর অভ্যুদয় হল—এই নতুন শ্রেণী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শিক্ষায়, সামাজিক প্রতিপত্তিতে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে এরাই পুরোধা। কিন্তু এরা বাঙালি হলেও এদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাষা ইংরেজি। এই কারণেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুই অগ্রণী ব্যক্তিত্ব মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন ইংরেজিতে। তাঁরা অবশ্য অসামান্য দূরদর্শিতার জন্য অচিরেই মাতৃভাষায় ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু তখনকার উচ্চবর্গীয় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে মাতৃভাষা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট অবস্থান নিতে দ্বিধার ভাবটা থেকেই গিয়েছিল। এই জন্যই তাদের পেছনে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার কয়েকশো বছরের পুরোনো ঐতিহ্য থাকলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মাতৃভাষার ইতিহাস সন্ধান করার কোনো সংগঠিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। এই সময়ে বাংলা লেখ্য ভাষার একটা মান্য রূপ সন্ধান করার চেষ্টা চলছিল, কিন্তু সেখানেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। শেষ পর্যন্ত সাধুভাষার আধারে যেখানে দাঁড়াবার ব্যবস্থা হল সেখানে দেখা গেল সংস্কৃত-সাহিত্যের উচ্চবর্গীয় পক্ষপাত। লেখার ভাষায় মুখের ভাষার মিশ্রণকে ধিক্কার দেওয়া হল গুরুচণ্ডালি দোষ বলে। তবু মুখের ভাষা-লেখার ভাষার দ্বন্দ্ব থেকেই গেল। সারদাচরণ মিত্র বা শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির মতো কেউ

CENTRAL LIBRARY

কেউ লৌকিক ভাষার পক্ষে দাঁড়াবার প্রস্তাব করলেও তখনকার দিনের 'শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ' বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থান ছিল মাঝামাঝি। বঙ্কিমের এই মাঝামাঝি অবস্থানটাই তখনকার শিক্ষিত বাঙালির প্রতীকী অবস্থান।

নিবন্ধের শুরুতেই এত ভণিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাতৃভাষার প্রশ্নে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা। তাঁর বাংলা প্রবন্ধ ও উপন্যাসের ভাষা এবং বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধাদি পড়লে বোঝা যায় বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপটি সম্পর্কেই তাঁর নিশ্চিত পক্ষপাত ছিল। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষার অতীত গৌরব সম্পর্কেও তাঁর শ্লাঘাবোধ ছিল অকৃত্রিম ও অতুলনীয়। তাঁর সমকালের প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে তাঁকে অদ্বিতীয়ও বলা যায়। প্রধানত বাংলা ভাষা সংক্রান্ত দুটি বইকে ভিত্তি করেই অনায়াসে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

।।২।।

দুটি বইয়ের প্রথম বইটি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'। এ বইয়ের পরিচয় বিদ্বৎসমাজে সুবিদিত। এ বইয়ের সীমাবদ্ধতাও এখন কারো অজানা নয়। কিন্তু বইটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে বইটির নামকরণের পরিপ্রেক্ষিতে। কেন এত বড়ো নাম? আর তাতে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়'—এমন দীর্ঘ বাক্যাংশই বা কেন? শুধু 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামটাই কি যথেষ্ট ছিল না? বই প্রকাশের প্রায় নব্বই বছর পর এখন এইরকম প্রশ্ন উঠতেই পারে, যদি বইটির প্রকাশকালের সমসাময়িক অবস্থা মাথায় না থাকে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের অব্যবহিত আগে প্রায় দুই দশক ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন অধ্যায় নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিবাদ-বিতর্ক চলছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস নিয়ে, সম্ভবত প্রথম আলোচনা শুরু করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' প্রবন্ধে।[১]

এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হচ্ছে : (১) বাংলা ভাষার উৎপত্তি পঞ্চদশ শতাব্দীতে, (২) বাংলা ভাষার উদ্ভব পূর্বী হিন্দী থেকে এবং (৩) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি কবি বিদ্যাপতি। এরপর এ বিষয়ে কয়েকটি পূর্ণাঙ্গটি বইও প্রকাশিত হয়।[২] এই সব বইতে অল্পবিস্তর নতুন তথ্যের সংযোজন থাকলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স সম্পর্কে রাজেন্দ্রলালের মতই এইসব বইতে গৃহীত হয়েছে। এই সূত্রে দেখা যায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত ধরা হত যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স মোটামুটি চার থেকে পাঁচশো বছর। এর মধ্যে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরিষদের উদ্যোগে বিশেষত পুরোনো বাংলা পুথি সংগ্রহের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে দীনেশচন্দ্র সেন বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিশদ অনুসন্ধানের ফলে তাঁর মনে হয় প্রায় হাজার বছর আগেই বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইতে তিনি তাঁর এই অভিমত প্রকাশ করেন। তথ্য হিসাবে তিনি বলেন যে, পুরোনো রূপকথা, ডাক ও খনার বচন, নাথপন্থী গোপীচন্দ্রের গান, রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ'— এই সব রচনার কোনো প্রাচীন পুথি পাওয়া না গেলেও এই সব ঐতিহ্যগত রচনায় জীবনযাপনের যেসব ইঙ্গিত আছে তা বাংলা দেশে তুর্কি আগমনের আগেকার বৌদ্ধ পাল-রাজা এবং হিন্দু সেন-রাজাদের রাজত্বকালের সমসাময়িক। এই কারণে দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি 'হিন্দুবৌদ্ধ যুগে'র পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর অনুমান অনুসারে এই হিন্দু বৌদ্ধযুগের সময়-পরিধি মোটামুটি ৮০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ। এর ফলে দীনেশচন্দ্র সেনের বই প্রকাশিত হবার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স

CENTRAL LIBRARY

সম্পর্কে পুরোনো ও নতুন দুটো মত দাঁড়াল। পুরোনো মত অনুসারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স অনধিক পাঁচশো বছর, আর নতুন মত অনুসারে এই বয়স কমবেশি হাজার বছর। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দুই মতের দ্বন্দ্ব বেধে গেল। তবে পুরোনো মতের দিকেই শিক্ষিত সমাজের পক্ষপাত বেশি। কারণ হিসেবে দীনেশচন্দ্র তাঁর বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন: 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায় একরূপ উদাসীন আছেন।' তখনকার 'শিক্ষিত সম্প্রদায়ে'র মধ্যে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যতটা আগ্রহ মাতৃভাষা ও মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য সম্পর্কে ততটাই ঔদাসীন্য। সেজন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবসূচক নতুন মতের তাৎপর্য তাঁরা অনুধাবন করলেন না। অদ্ভুত উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য নিয়ে তাঁরা পুরোনো মতই আঁকড়ে থাকলেন, এমনকি নতুন মতের বিরুদ্ধে তাঁরা বলতে লাগলেন যে, দীনেশচন্দ্রের অভিমতের পেছনে কোনো কাগুজে প্রমাণ নেই। রূপকথা, ডাক-খনার বচন ইত্যাদির কোনো প্রাচীন লিখিত নিদর্শন যেহেতু নেই, তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স যে হাজার বছর একথা যুক্তিসিদ্ধ নয়। অর্থাৎ প্রাচীন পুঁথিপত্রের অভাবে দীনেশচন্দ্রের 'হাজার বছরের তত্ত্ব' নস্যাৎ করার একটা প্রবণতা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেখা গেল। এই অবস্থার মধ্যেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের পুথিসংগ্রহের মধ্যে চারখানি পুথি খুঁজে পান, যেগুলি দেখে তাঁর মনে হয় এগুলিই হচ্ছে দীনেশচন্দ্রের হাজার বছরি তত্ত্বের সপক্ষে চারখানি কাগুজে প্রমাণ। তাই পুথিগুলি প্রকাশের সময় সম্পাদিত বইটির নাম রাখলেন 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'। এ যেন দীনেশচন্দ্রের হাজার বছরি তত্ত্বের তথ্যভিত্তিক সমর্থন। বলা বাহুল্য, এ সমর্থন দীনেশচন্দ্রের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আনুকূল্য প্রকাশ নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যের গৌরবকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। শিক্ষিত সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই এই বইয়ের নামে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়'—এত বড়ো বাক্যাংশ ব্যবহার। পরবর্তী কালে অবশ্য চারখানির মধ্যে তিনখানা পুথির ভাষাপরিচয় সম্পর্কে শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু সে তো পরবর্তী বিচার-বিশ্লেষণের ফল। কিন্তু বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এই দীর্ঘ নামকরণে মাতৃভাষা ও মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে শাস্ত্রীর শ্রদ্ধাবোধই প্রতিফলিত হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থান দ্বিধামুক্ত ও সুনিশ্চিত। তখনকার শিক্ষিত সমাজে এখানেই তাঁর অনন্যতা।

।।৩।।

পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে উল্লেখ্য দ্বিতীয় বইটি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "The Origin and Development of the Bengali Language"। বাংলা ভাষার ইতিহাস বিষয়ে এ বই অদ্যাবধি অনতিক্রম্য এবং প্রকাশের সময়ও এ বই ছিল এক হিসেবে অদ্বিতীয়। সুনীতিবাবুর ODBL প্রকাশিত হবার আগে বাংলা ভাষার ইতিহাস বিষয়ে আরও কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু কিছু সদর্থক বৈশিষ্ট্য থাকলেও ভাষাবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাব থাকায় বইগুলিতে নানারকম সীমাবদ্ধতাও ছিল।[৫] কিন্তু ODBL সেদিক থেকে ত্রুটিমুক্ত। এই কারণেই গ্রিয়ার্সন ODBL-এর 'Foreword'-এ লিখেছেন—'Endowed with a thorough familiarity with Bengali, his native tougue,—he has been able to bring together an amount of material which no European could ever have hoped to collect; and he has had the further advantage of pursuing his theortical studies under the guidance of some of the greatest European authorities on Indian philology'। কিন্তু এই মহাগ্রন্থ প্রকাশিত

CENTRAL LIBRARY

হবার পর বাঙালি সমাজের শিক্ষিত অংশে যে উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত ছিল তা দেখা যায়নি। এ বইয়ের প্রচার এবং ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভাষাবিভাগ ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে। এই গন্ডির বাইরে সাধারণ শিক্ষিত সমাজে এই বইয়ের তেমন স্বীকৃতি দেখা যায় নি। এই বই প্রকাশের প্রায় দু'বছর পর শ্রীনাথ সেনের 'Truths of Language or Comparative Philology of the Sanskrit, Bengali and incidentally other Prakrits' (Parts I & II) প্রকাশিত হয়। বইটি শ্রীনাথ সেনের বাংলায় লেখা 'ভাষাতত্ত্ব' (১ম খণ্ড ১৯০০ খ্রি., ২য় খণ্ড ১৯০৯ খ্রি.) বইয়ের ইংরেজি ভাষান্তর। শ্রীনাথ সেনের এই বইয়ের বহু সিদ্ধান্তই ODBL প্রকাশের আগে অন্য গবেষকদের আলোচনায় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। অথচ ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের সময় শ্রীনাথ সেন তাঁর বাংলা বইয়ের পরে প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থগুলি এবং সদ্য প্রকাশিত ODBL-এর দিকে দৃক্‌পাত করে নিজের আগেকার রচনার পুনর্বিন্যাস করলেন না বা নিজের মতের সমর্থনে অন্য গবেষকদের সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার করলেন না। অর্থাৎ তাঁর পরবর্তী বইগুলি সহ ODBL-কে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। অন্য দিকে ভাষাতত্ত্বে পেশাদার আগ্রহ নেই অথচ ভাষা বা ভাষাতত্ত্বে সাধারণ আগ্রহ আছে এমন সাধারণ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও এই বইয়ের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করেননি। এরই একটা প্রতীকী ছবি পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-র (১৯৩০) অমিত রায়ের বৃত্তান্তে। অমিত রায় চরিত্রটি তখনকার বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আদর্শ দৃষ্টান্ত। নিজের শ্রমার্জিত সম্পদের পরিবর্তে বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির আইনি উত্তরাধিকারই তার অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্লভ উচ্চবর্গীয় ডিগ্রি তার ব্যক্তিত্বের অলঙ্কার এবং ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে তার একটা মোটের উপর সচেতনতা থাকলেও দেশ বা সমাজ সম্পর্কে তার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এ হেন অমিত রায়, টাটকা ODBL পড়ে। কেন পড়ে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> 'কিছুদিন ওর (অমিতর) কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্জের 'বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব', লেখকের সঙ্গে মতান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে'।

অর্থাৎ ODBL-এ সযত্ন অভিনিবেশের বদলে ছিদ্রান্বেষী পূর্বসংস্কার নিয়ে এলোমেলো ভাবে তার পাতা উল্টে যাওয়া। এটাই ছিল তখনকার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশের সাধারণ চিত্র। এই চিত্রের আরও স্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায় অধ্যাপক সুকুমার সেনের আত্মজীবনী 'দিনের পরে দিন যে গেল' বইতে:

> 'সুনীতিবাবুর বিরাট গ্রন্থ Origin and Development of the Bengali Language প্রায় দেড় হাজার পাতার বই হাফ ফুলস্ক্যাপ সাইজে ছাপা হয়ে কাপড় বাঁধাই দুখণ্ডে প্রকাশিত হল ১৯২৬ সালের শেষার্ধে, বোধ হয় জুলাই মাসে। দাম কুড়ি টাকা। বলা বাহুল্য, এ দাম খরচের অনুপাতে অনেক কম। ...তখনকার বাজারে সুনীতিবাবুর বইয়ের দাম পঞ্চাশ টাকা করলে কিছুমাত্র অন্যায় হত না। কথা উঠতে পারে ছেলেরা তা কিনতে পারত না। উত্তরে বলি, ক'জন ছেলে বইটি কিনেছিল? যারা কিনেছিল তাদের মধ্যে ক'জন বইটি পড়েছিল? যারা পড়েছিল তাদের মধ্যে ক'জন এর থেকে উপকার পেয়েছিল? যাঁরা বইটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁরা পঞ্চাশ টাকায় কিনতে গররাজি হতেন না। সুনীতিবাবুর বই ছাপা হয়েছিল ৫০০ কপি মাত্র। তার বিক্রি শেষ হতে বছর দশকের বেশি লেগেছিল। ১৯৫০ সালের দিকে বইটির সেকেন্ড হ্যান্ড বাজার দর ছিল একশো টাকা।...

CENTRAL LIBRARY

সুনীতিবাবুর বই বেরোলো। ইংরেজিতে লেখা। কোন উত্তেজনা হল না। বাংলায় লেখা হলে কি তা হত? মনে হয় না। তবে পিছনে ঢাকির দল থাকলে অবশ্যই হত।'

অর্থাৎ ODBL-এর সঙ্গে বাঙালি সমাজের সাধারণ শিক্ষিত অংশের তেমন কোনো কার্যকর যোগ স্থাপিত হয় নি। অথচ ODBL-এর কেতাবি বা অ্যাকাডেমিক মূল্য ছাড়াও সামাজিক মূল্যও কম নয়। ১৮৯৬ সালে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' গভীর অর্ন্তদৃষ্টির সাহায্যে দীনেশচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সহস্রাব্দব্যাপী গৌরব ও ঐতিহ্যের কথা প্রচার করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রকাশ করে তাকে একটা মজবুত তথ্যভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও সমাজের শিক্ষিত অংশের মধ্যে নানা সংশয় ও বাদানুবাদ দেখা দেয়। কিন্তু ODBL-এর পুরো কাঠামোটাই ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক। সুতরাং ODBL-এ বাঙালি সমাজের মাতৃভাষাচর্চার সহস্রাব্দব্যাপী ইতিহাস এমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা নিশ্চিতভাবে বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। অথচ আত্মবিস্মৃত উদাসীন বাঙালি সমাজের বৃহত্তর অংশ এই 'পরশ পাথর'-কে চিনতে পারে নি। তাই এই বই ঘিরে বাঙালি সমাজে দেখা গেল না কোনো উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনা। বাঙালির এই সাংস্কৃতিক সংকটের দিনে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সুকুমার সেনের আত্মজীবনীতে এর বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায়:

> 'সুনীতিবাবুর বই বেরোল। কিন্তু তাতে 'আ মরি বাংলা ভাষা'র ছড়িদারদের সাড়া মিলল না। তবুও বাঙালির মধ্যে মানুষ ছিল। এইরকম একজন মানুষ নিজের ঘরে সুনীতিবাবুকে সমুচিত সংবর্ধনা দিলেন। সেদিন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালি জাতির মুখপাত্র হয়েছিলেন। Origin and Development of the Bengali Language প্রকাশ উপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর পটলডাঙার বাড়িতে সুনীতিবাবুকে ও তাঁর কতিপয়—জনাকুড়িক—বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে প্রচুর জলখাবার খাইয়ে ছিলেন। অনেক খাবার তিনি নৈহাটি থেকে করিয়ে এনেছিলেন। তিনি জানতেন আমাকে সুনীতিবাবুর চেলা বলে। তা ছাড়া সুনীতিবাবুর বইয়ের ভূমিকায় আমার নাম আছে, শব্দনির্ঘণ্টি করে দিয়েছিলুম বলে। তাই আমারও নিমন্ত্রণ হয়েছিল।'

সুকুমারবাবুর বইতে শাস্ত্রীর নিমন্ত্রণ পত্রের পূর্ণ বয়ান ছাপা আছে। তাতে দেখা যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বয়ঃকনিষ্ঠ সুনীতিকুমারের কাজকে কী শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আয়োজিত এই সংবর্ধনা এই শ্রদ্ধারই উচ্ছ্বসিত প্রতিফলন। তবে তাৎপর্যের দিক থেকে এই সংবর্ধনা কোনো ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নয়, এটা একটা প্রতীকী সামাজিক অনুষ্ঠান। সেদিন বাঙালি সমাজ যে দায় বহন করে নি, হরপ্রসাদ সমাজের হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই দায় পালন করেছেন। সুকুমারবাবু তাই যথার্থই বলেছেন 'সেদিন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালি জাতির মুখপাত্র হয়েছিলেন।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে আমরা বড়ো পণ্ডিত হিসেবে জানি, কিন্তু তাঁর এই দায়বদ্ধ সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আমরা কতটা সচেতন? এ কথাটা গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১। বিবিধার্থ সংগ্রহ (৫ম পর্ব) ৪৯ খণ্ড ১৭৮০ শকাব্দ, পৃ. ১২-১৬।

২। (ক) বঙ্গ ভাষার ইতিহাস—মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৭১।

(খ) বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন, ১৮৭২-৭৩।

(গ) বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা—গঙ্গাচরণ সরকার ১৮৮০।

৩। (ক) ভাষাতত্ত্ব—শ্রী শ্রীনাথ সেন। ১ম খণ্ড আষাঢ় ১৩০৭, ২য় খণ্ড ভাদ্র ১৩১৬।

(খ) বাঙ্গালা ভাষা। প্রথম ভাগ (ব্যাকরণ)—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

(গ) The History of the Bengali Language—Bijaychandra Majumdar, 1920।

(ঘ) Outlines of an Historical Grammar of the Bengali Language—Muhammad Shahidullah, Journal of the Department of Letters (CU), Vol. III, 1920.

(ঙ) ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস—হেমন্তকুমার সরকার, ১৯২৩। আমার 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ' বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই রচনাগুলির মূল্যায়ন করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।

CENTRAL LIBRARY

শরৎনাথ ভট্টাচার্য ওরফে হরপ্রসাদ (শাস্ত্রী)

মনিরুজ্জামান

এক

যে কারণে আমরা ছেলের নাম রাখতে দেখি আল্লারাখা বা হরিরাখ, সেইরকম কারণেই, ভট্টাচার্য বংশীয় রামকমল ন্যায়রত্নের চতুর্থ পুত্র শৎরনাথ শৈশবে এক কঠিন অসুখ থেকে শিবের মানতে সেরে উঠলে তার এই নতুন জন্মকে নতুন নামে নিষিক্ত করা হয়। নাম হয় হরপ্রসাদ। ২৪ বৎসর বয়সে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে এম. এ.-তে প্রথমস্থান লাভ করে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃতে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সরকারের কাছ থেকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে D. Lit উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি সি. আই. ই. সম্মানেরও অধিকারী হয়েছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩-১৭ নবেম্বর ১৯৩১) সারাজীবন প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন। সন্ধাকর নন্দীর ঐতিহাসিক দ্ব্যর্থ কাব্য 'রামচরিত' (যাতে একই সাথে রামায়ণের রাম ও বাংলার রামপালের কথা বিবৃত)-এর মত কঠিন কাব্য সম্পাদনা, কাব্যরীতিতে রচিত বহু প্রাচীন শিলালেখ বা তাম্রশাসন সম্পাদনা, (যেমন, বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন পাঠ ও ব্যাখ্যাদান, ইত্যাদি) প্রভৃতি তার বিখ্যাত কাজগুলির অন্যতম। এছাড়া বহু প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা, (কালিদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখের কাব্যাদি) এবং কিছু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কিংবদন্তী ভিত্তিক উপন্যাস-ধর্মী সৃষ্টিকর্ম আছে যেগুলির জন্যও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেন। তবে পুঁথি সংগ্রহই হচ্ছে তাঁর স্মরণীয় কাজ। ম্যাক্সমূলার সংগ্রহশালার দায়িত্ব লাভ করেন তিনি এ কারণেই। তাঁর নিজস্ব পুঁথি-সংগ্রহের সংখ্যা ছিল ৮১০৮টি। তবে অপরিচিত ও অজ্ঞাতপূর্ব পুথির কথা লোকের মনে থাকে না। তাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মূল কাজের প্রসঙ্গে সে সবের আলোচনা খুব কমই হয়। সাধারণ মানুষ ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির লোকের কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় হাজার বছর পুরনো বাংলা পুঁথি তথা চর্যাপদের আবিষ্কর্তা রূপে। এই পুথি ও তৎসহ আরও কিছু মূল্যবান উপাদান তিনি নেপালের রাজদরবারের পুথিশালা থেকে তিনবার অনুসন্ধানের পর ১৯০৭ সালে আবিষ্কার করেন (প্রকাশ ১৯১৬)। বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ-সূত্র নিয়ে এর পরই শুরু হয় বিভিন্ন গবেষণা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য নিয়ে গৌরব করার মূলেও যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গের উত্থাপন ও তার মূল্যায়নের মূলেও তেমনি তিনি। এইরকম বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাজা রামপালের তথ্য (এটিও নেপাল থেকে আবিষ্কৃত), বঙ্গাধিপ হরিবর্মা (বিক্রমপুর), তৎপিতা জাতবর্ম, (চেদিরাজ কর্ণদেবের জামাতা ১১শ শতক) প্রমূখের তথ্যাদি। তারও অধিক তিনি প্রাচীন বাংলার চান্দ্র ব্যাকরণ প্রণেতা চন্দ্রগোমী ও তার বৌদ্ধ অনুসারীদের ব্যাকরণ ও অভিধান এবং দর্শনাদিরও সন্ধান দেন। সংস্কৃতে অসাধারণ পান্ডিত্য ও গভীর অধ্যয়নের ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। 'বাংলার বৌদ্ধ সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধ তাঁর বৌদ্ধদের জ্ঞানচর্চা বিষয়ক ঐতিহাসিক দলিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনীষার বিপুলতার এ সবই এক সামান্য অংশ মাত্র। ধর্মঠাকুরের পরিচয় প্রকাশ (প্রথম) তাঁর বঙ্গসংস্কৃতি-সন্ধানের আর এক নিবিড় অধ্যায়।

দুই

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ওপর যাঁদের প্রভাব থাকা সম্ভব বলে মনে করা হয় এর একজন বঙ্কিমচন্দ্র,

কারণ দুজকেই নৈহাটি-কাঁঠাল পাড়ায় ছিলেন এবং ইতিহাস-চেতনা ও সাহিত্যালোচনায় বঙ্কিমীআদর্শ ও রীতির অনুসারী ছিলেন হরপ্রসাদ। সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্য (বিশেষত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের) আলোচনায় তিনি পাশ্চাত্য রীতি গ্রহণ করেন নি বটে, তবে সংস্কৃত রীতিকেও আদর্শ মনে করেন নি। তাঁর মেঘদূত (কালিদাস) আলোচনাটি যে মনোগ্রাহী হয়েছিল তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ প্রেম। অবশ্য বঙ্কিমের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদ কাজ করেছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে তুলনায় অধিক মানবতাবাদী। তাঁর বেশ কিছু আলোচনা ইতিহাসাশ্রয়ী এবং মানবিক দৃষ্টির ঔদার্যে পল্লবিত। আবার ইতিহাস আলোচনায় তিনি যেন কতকটা কল্পনা বা বঙ্কিমী রোমান্স-প্রিয়তায়ও আক্রান্ত। আসলে এটি তঁর একটি বিশেষ ভঙ্গি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ওপর অপর যে প্রজ্ঞাবানব্যক্তির প্রভাব সুদূর প্রসারিত হয়েছিল, তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এই মনীষীর সাথে তাঁর পরিচয় না হলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অর্ধেক জীবনই হয়ত অপূর্ণ থেকে যেত। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ অনুসন্ধানে রাজেন্দ্রলাল মিত্রই তাঁকে নেপালে যেতে অনুপ্রাণিত করেন ও সন্ধান দেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অসম্পূর্ণ কাজ তিনিই সম্পন্ন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক স্মৃতিচারণে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তুলনাও করেছিলেন। এটাই সঙ্গত।

তিন

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর পাণ্ডিত্যের কারণে যেমন খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁর রচনা-দুষ্টতার জন্য তেমনি সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছেন। আগেই বলেছি তাঁর রচনার একটা নিজস্ব ভঙ্গি ছিল। এটিই তার কারণ। কল্পনা-মিশ্রিত রচনায় তাঁর যে হাত ছিল, সেটিই তিনি নীরস ইতিহাসকে আকর্ষণীয় করার জন্য তথা অতীত বর্ণনায় প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হন। তাতেও দোষ ছিলো না, কিন্তু এইরূপ রচনায় তো বটেই, তন্নিষ্ঠ রচনায়ও একই রীতি-প্রযুক্ততার কারণে প্রামাণ্যাভাব দেখা দেয়। তাঁরই সহকর্মী ও শিষ্য ডঃ সুশীলকুমার দে এ জন্য এভাবে তার সমালোচনা করেন

'হরপ্রসাদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকার্যক করিতে পারিতেন সত্য
কিন্তু তাঁহার কল্পনা গল্পকেও ইতিহাসে পরিণত করিতে কণ্ঠিত হইত না।

তিনি পশ্চিমী রীতিতে রেফারেন্স বা সূত্র উল্লেখ ব্যতিরেকে ঘটনার উল্লেখ করতেন। নৈহাটি থেকে প্রকাশিত হরপ্রসাদ রচনাবলী সম্পাদনা কালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে এজন্য বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। একবার SOAS গ্রন্থাগারে (লন্ডন) তাঁর রচনার একটি সমলোচনা আমার (বর্তমান লেখকের) চোখে পড়ে। সমালোচক দীনেশচন্দ্র সরকার (১৩৮৯:১৮১-৮৯) উল্লেখ করেন যে শাস্ত্রী মহোদয়ের কাজের মধ্যে বেশ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পাণ্ডুলিপি অনুবাদে ত্রুটি (যথা-যোগপুরাণের এক স্থলে 'গঙ্গাজলের মত পিতার তর্পণের বস্তুটি বোঝাতে পারেন নি'), তাম্রলেখ সম্পাদনে পাঠটি সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে উদ্ধারের বা প্রকাশে ত্রুটি (বীরূপসেনের তাম্রশাসন পাঠ ও ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের আলোচনার পাশে ননীগোপাল মজুমদারের উৎকৃষ্ট আলোচনা' এবং পরে উপর্যুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকারের আলোচনা তুলনীয় ইত্যাদি; অবশ্য তিনি অনুরূপ ত্রুটি অন্যদের মধ্যেও, যেমন ভান্ডার করের মধ্যেও, বিরল ছিল না বলে উল্লেখ করেছেন এবং এজন্য দায়ী করেছেন সহকারীদের সাহায্যের ক্ষেত্রে কঠোরতার অবলম্বনের অভাবকে। তবে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজেরও "ঐতিহাসিক সূক্ষ্মদৃষ্টির কিঞ্চিৎ অভাব দেখা যায়।" আর এরই ফলে রাজস্থানের মন্দসোরে প্রাপ্ত ও বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত দুইখানি শিলালেখে একই নামের মিল দেখে একই রাজা ভেবে নেন তিনি এবং যোধপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা

বর্ণনা করেন। (চন্দ্রবর্মা রাজা)। দীনেশ সরকারের মতে, "এই ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আজ একেবারেই নিরর্থক।" (পৃ: ১৮৮)

যাইহোক, এইরূপ 'hasty generalisation'-এর কারণ তাঁর কালে ধরা না পড়লেও পরে তা পরিষ্কার হয়। আর তাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রকৃত কাজ সমূহের এবং তার পদ্ধতিরও মূল্যায়ন আজ আশু কর্তব্য। বিক্রমপুর (ইদিলপুর ও মদনপাড়া গ্রামে)-এ প্রাপ্ত যে শিলালেখ-এর ভুল পাঠের কারণে (বিশ্বরূপ' স্থলে 'কেশব') জার্মান পণ্ডিত কীলহর্ন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠকেই যথার্থ বলেছিলেন। কিন্তু কোনও মহলেরই তাতে সায় ছিল না। আধুনিক গবেষণায় এখন শাস্ত্রীর পাঠের যুক্তিযুক্ততাই শুধু প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সই সাথে এও প্রমাণিত হয়েছে যে পূর্ব লিখিত একটি নাম ('সূর্য') ঘষে তুলে সেখানে চার অক্ষরের 'বিশ্বরূপ' লিখতে গিয়ে সবই অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং "সেটাই ভুল করে 'কেশব' পাঠ করা হয়েছে।" এইরূপভাবে হরপ্রসাদ আরও বহুস্থলেই নিজস্ব ধারণা ও ইতিহাস-জ্ঞানকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন এর আর একটি উদাহরণ, ভবদেব ভট্টের উপাধি থেকে তাঁকে অহেতু বালবলভীর রাজা সাব্যস্ত করার বিষয়টিও তিনি খণ্ডন করতে সক্ষম হন। এর সপক্ষে এখন জানা যাচ্ছে যে মেজর কিটো এশিয়াটিয় সোসাইটি থেকে শিলালেখ সরাতে গিয়ে যে অপকর্মটি সাধন করেছিলেন (দুটোর স্থলে তিনটি শিলালেখ ভুবনেশ্বরে অপসরণ করিয়েছিলেন; তাতেই এই স্থানগত বিভ্রাট ঘটে। উক্ত শিলালেখের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের কোনই সংযোগ ছিল না।), তাতেই এই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং তা ধাধাঁর মত অমীমাংসিত আকার পায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' কে হাজার বছরের পুরনো বাংলা গান বলে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পরেছিলেন, যদিও দোহাগুলিকেও তিনি ভুল করেছিলেন বাংলা বলে। তাঁর দোষ শুধু এইটুকুই। এই আতিশয্যটুকু যদি না থাকতো তাঁর মধ্যে তাহলে তাঁর আবিষ্কারের মূল্যায়ন তিনি স্বকালেই অনুধাবন করে যেতে পারতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা সত্ত্বেও যে তাঁর বাল্মীকির জয়, কাঞ্চনমালা, বেনের মেয়ে প্রভৃতি গ্রন্থ সমালোচকদের হাতে মূল্যায়িত হতে পারলো না, তার জন্য আবার হয়ত কখনও আমাদেরই কালের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে; আশ্চর্য কি!

আজ আমি তাঁর জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্তিতে তাঁকে জানাই আমার অকৃত্রিম প্রণতি।

সূত্র :

দীনেশচন্দ্র সরকার ১৩৮৯: সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড)। কলিকাতা, সাহিত্যালোক, (১২) + চিত্র + ২৩৯ পৃ + চিত্র। 'ত্রয়োবিংশ প্রসঙ্গ (১৮১-১৮৯ পৃষ্ঠা)।

ভবতোষ দত্ত ১৪০১: মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (শিপ্রা রক্ষিতদস্তিদার-এর রচিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম' গ্রন্থের সমালোচনা)। চতুরঙ্গ, শ্রাবণ সংখ্যা। (পৃ. ৫৩-৫৪)।

CENTRAL LIBRARY

নৈহাটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বসত বাড়ি

CENTRAL LIBRARY

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃষ্টিতে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি

মণিকুন্তলা হালদার দে

বৌদ্ধধর্ম—যা ভারতীয় আর্যসভ্যতার উৎস থেকে উত্থিত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতাকে নতুন আকার দান করেছিল তা শেষ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। যদিও এটাই চিরন্তন সত্য যে জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয় এবং উত্থান ও পতন শব্দ দুটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। বস্তুতঃ, বৌদ্ধধর্মের উন্নতির কারণগুলো আলোচনা করা যতখানি সহজ, অবনতির কারণগুলো নির্ণয় করা ঠিক ততখানি সহজ নয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয় ও অবনতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পাশাপাশি পুনরুত্থানের কথাও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

যাই হোক্, সর্বাগ্রে দেখা দরকার যে, যে বৌদ্ধধর্ম একসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে তার প্রভাব বিস্তার করে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়েছিল তা কেন কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। যদিও উল্লেখ্য যে বহির্বিশ্বে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম একই সময়ে সমমর্যাদায় স্থাপিত হয়েছিল। ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন আকস্মিক ঘটেছিল বলা যাবে না, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যন্ত ধীরগতিতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটতে থাকে। অষ্টম শতাব্দী থেকেই বৌদ্ধধর্মের পতন শুরু হয় এবং মধ্যযুগের অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই ধর্ম প্রায় অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়ে যায়। ঐ অবলুপ্তির সময়কাল ও কারণ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়াও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন।

এ বিষয়ে প্রধানতঃ চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনা ও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী ও তার পরবর্ত্তীযুগের অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারতীয়, সিংহলী, তিব্বতীয় ও চীনা সাহিত্যগুলোর বর্ণনার ওপর নির্ভর করতে হয়। কারণ বৌদ্ধ সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের উত্থান সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা থাকলেও বৌদ্ধধর্মের তিরোধান সম্পর্কে বিশেষ তথ্যাদি পাওয়া যায় না।[১] বরং অন্যান্য সাহিত্যে যথা, সংস্কৃত, তিব্বতীয় ও চীনা সাহিত্যগুলোতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বৌদ্ধধর্মের অবনতির কথা লিপিবদ্ধ আছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্র দেশীয় বৌদ্ধসাহিত্যগুলোর নীরবতার স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করে বলেছেন, যে "The rise of the sun and its waxing midday splendour often turn men's thought away from the melancholy survey of its softly dying rays."[২] এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের যথা, কাশ্মীর, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর ও পশ্চিম ভারত, বাংলাদেশ, ওড়িশা ও দক্ষিণভারতের বৌদ্ধধর্মের সঠিক অবস্থার পর্যালোচনা না করলে বৌদ্ধধর্মের পতন সম্পর্কে আলোচনা করা দুরূহ হয়ে যাবে।

কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম

প্রধানতঃ হিউয়েন সাঙ[৩] ও ইৎসিং[৪]-এর বর্ণনা, কাশ্মিরী পণ্ডিত কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী'[৫], তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের বর্ণনা[৬] ও Bu-ston-এর বর্ণনা[৭] থেকে সামগ্রিকভাবে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের কথা জানা যায়। যদিও কাশ্মীরের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু পরস্পরবিরোধী বর্ণনা রয়েছে। তারনাথ বর্ণনা করেছেন যে কাশ্মীরের রাজা তুরস্ক যিনি সুদীর্ঘকাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেছিলেন এবং ঐতিহাসিকরা যাকে মিহিরকুল বা মিহিরগুল[৮] নামে অভিহিত করেছেন তিনি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম নিপীড়ক ছিলেন।[৯] কথিত আছে মিহিরকুল ৫৩০ খৃষ্টাব্দে

CENTRAL LIBRARY

মালবরাজ যশোবর্মন কর্তৃক নিহত হন।[১৫] যাই হোক সমস্ত উপাদানগুলোই একমত যে কাশ্মীরে কুষাণ শাসনের অবসানের পরই সেখানে বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটে।

হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে তিনি যখন সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধস্থাপত্য ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন মন্দির দেখেছিলেন যেগুলো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আকর্ষণ করতো।[১১] ইৎসিং ও অন্য এক চীনা পরিব্রাজকের মতে কাশ্মীরের রাজারাও ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিলেন।[১২] কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী' অনুযায়ী পরবর্তীকালের কাশ্মীররাজ ক্ষেমগুপ্তও[১৩] বৌদ্ধধর্মের উৎপীড়ক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বিখ্যাত জয়েন্দ্রবিহারে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করেন এবং সেখানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪] ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেছেন যে উপরোক্ত অত্যাচারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মীয় নয় সম্ভবতঃ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীকালে একাদশ শতাব্দীর দুজন রাজার নাম পাওয়া যায় যথাক্রমে, কলস ও কলসের পৌত্র হর্ষ, যারা বৌদ্ধধর্মের উৎপীড়ক হিসেবেই ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন।[১৫] হর্ষ সম্পর্কে বলা হয় যে বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্বংস করা তাঁর কাছে অত্যন্ত উল্লাসের বিষয় ছিল। কিন্তু ডঃ রমেশ মিত্রের মতে হর্ষ শুধুমাত্র যে বৌদ্ধধর্মেরই বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তাই নয় তিনি মূর্ত্তি ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় মেতেছিলেন।[১৬] অন্যদিকে, কাশ্মীরে দ্বাদশ শতাব্দীর বহু বিশালাকার স্তূপ ও মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে দ্বাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম সমস্ত রকম বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে কাশ্মীরে অস্তিত্বশীল ছিল।[১৭] কিন্তু চোদ্দশ শতাব্দীতে একটা স্থানীয় মুসলমানবংশ সিংহাসন লাভ করে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন।[১৮] ফলস্বরূপ, ডঃ রমেশ চন্দ্র মিত্রমহাশয়ের মতে মুসলমান শাসনকালে সম্ভবতঃ বহু ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়।[১৯] কাশ্মীরের অন্য প্রদেশ লাডাকেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং সেই কারণেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা হীনপ্রভ হয়ে পড়ে।[২০] উল্লেখ্য যে 'রাজতরঙ্গিণী' অনুযায়ী মুসলমান আক্রমণের অনেক আগেই বৌদ্ধধর্মের পতন শুরু হয়। কারণ 'রাজতরঙ্গিণী'তে রক্ষণশীল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পাশাপাশি কিছু বিবাহিত ভিক্ষুর উল্লেখ আছে যারা সম্ভবতঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। জানা যায় যে সেইসময় কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ম—উভয় ধর্মই তান্ত্রিকতার প্রভাবে প্রায় সমপর্যায়ে অবস্থান করে এবং শিববুদ্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।[২১]

পরিশেষে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির প্রসঙ্গে বলা যায় যে সেখানে বৌদ্ধধর্ম নিপীড়ক রাজাদের হাতে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও পরবর্তী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা পুনরুজ্জীবিত হয় মহাযান বৌদ্ধধর্মরূপে।[২২] একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাকার ক্ষেমেন্দ্র[২৩] তাঁর সাহিত্যে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সেখানে ভগবান বুদ্ধের জন্মদিন ব্রাহ্মণ্য পঞ্জিকাতে একটা পবিত্র দিনরূপে চিহ্নিত এবং সেখানে বুদ্ধের জন্মদিন অত্যন্ত উৎসাহসহকারে পালন করা হয়। সুতরাং কাশ্মীরে ধর্মীয় অত্যাচারের জন্যই বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি ঘটেছে তা বলা হয়তো সমীচীন হবে না।

সিন্ধুপ্রদেশে বৌদ্ধধর্ম

চীনা পরিব্রাজকগণ যথা, হিউয়েন সাঙ ও ইৎসিং সিন্ধুপ্রদেশে বৌদ্ধধর্মের অবস্থার কথা তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণনা করেছেন। হিউয়েন সাঙের মতে কয়েকশো বিহারে হাজার হাজার আচার্য বসবাস করতেন কিন্তু পাশাপাশি সাধারণ ভিক্ষুরা নিম্নস্তরের জীবনযাপন করতেন। তিনি পুনরায় বর্ণনা করেছেন যে অষ্টম শতাব্দীতে তাঁর সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থানকালেই আরবরা সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করে

ধ্বংসলীলা চালায়।[২৪] আর একজন পরিব্রাজক ইৎসিং-এর বর্ণনানুযায়ী সম্মিতীয় সম্প্রদায় নামে বৌদ্ধধর্মের এক শাখার অনুগামীরাই কেবলমাত্র সেখানে বসবাস করতো।[২৫] আবার, 'চাচ্‌নামা'[২৬] নামে একটা আরবদেশীয় গ্রন্থানুসারে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম একসময়ে সিন্ধুপ্রদেশে অস্তিত্বশীল ছিল এবং পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম অন্তর্হিত হয়ে যায় যদিও সঠিক কোন সময়ে এবং কিভাবে বৌদ্ধধর্ম সিন্ধুপ্রদেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল তা রহস্যাবৃতই থেকে গেছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্রের মতে সিন্ধুপ্রদেশে সম্মিতীয় সম্প্রদায় সম্ভবতঃ ঐ স্থানের হিন্দুদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল কারণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুদের বহু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।[২৭] এবিষয়ে আরও একটা বিষয় উল্লেখ্য যে বৌদ্ধধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইসলামিক চিন্তাধারারও মিলন ঘটেছিল কারণ মুসলমানী 'সুফি' রহস্যাবৃত মতবাদ বৌদ্ধদের গূঢ় বা গুহ্য মতবাদেরই অনুরূপ বলা যায়।[২৮] ইসলামিক 'ফণা' বা 'মকত্তামৎ' মতবাদ সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা যায়। উপরন্তু ইব্রাহিম ইব্রু আদমের বল্ক যুবরাজের গৃহত্যাগের দ্বারা সুফি সন্ন্যাসী হওয়ার ঘটনাটি বুদ্ধের গৃহত্যাগের ঘটনার কথাই মনে করে দেয়।[২৯]

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধধর্ম

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতির ইতিহাস জানার জন্য প্রধানতঃ তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের বর্ণনার ওপরই নির্ভর করতে হয়। কারণ, সেখানকার বৌদ্ধধর্মে পরবর্তী পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ দেখা যায় অর্থাৎ তন্ত্রযান বা তন্ত্রযান থেকে পুনঃপরিবর্তন ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ সম্পর্কে এত ভিন্ন ভিন্ন তথ্য রয়েছে যে সঠিক ইতিহাস উপস্থিত করা কঠিন। অন্যদিকে, বৌদ্ধধর্মের নির্যাতনকারী বলে খ্যাত ব্রাহ্মণ কুমারিল ভট্ট বা শংকরাচার্যের ঘটনাগুলো বৌদ্ধধর্মের ওপর ঐতিহাসিক দিক থেকে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। আবার, রাজাদের শিলালিপির অভাব বা অন্যান্য প্রামাণ্য তথ্যের অভাব থেকে প্রমাণ করা যায় না যে কোনও রাজার পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলেই একটা ধর্মের অস্তিত্ব লোপ পাবে।

যাইহোক, অষ্টম, নবম ও একাদশ শতাব্দীর চীনা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা বিবরণানুযায়ী মালব, পেশোয়ার ও বলভী ছিল বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষার পীঠস্থান এবং উল্লেখ্য যে মুসলমান আক্রমণের পরবর্তী সময়েও রাজপুতানা বা সিন্ধুগুজরাট অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[৩০] 'তবকৎ-ই-আকবরী'[৩১] গ্রন্থে বলা আছে যে সুলতান মামুদ (১০২২ অব্দ) যখন ভারত অভিযান করেছিলেন তখন উপরোক্ত স্থানগুলো সিংহের উপাসক অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। Eliot সাহেব ঐ স্থানটি 'শাক্যসিংহ' বা বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসস্থান ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩২] অন্যদিকে, তিব্বতীয় উপাদানে বাংলাদেশের রাজা নয়পাল (১০৪২-১০৫৮ খৃ.) এর সঙ্গে কলচুরিরাজ কর্ণের[৩৩] একটা যুদ্ধের উল্লেখ আছে যেখানে বর্ণনা আছে যে রাজা কর্ণ মগধ অধিকার করতে সমর্থ না হয়ে কিছু বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করেন ও পবিত্র বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি স্বদেশে বহন করে নিয়ে যান।[৩৪] কিন্তু উল্লেখ্য হল যে কলচুরিরাজাদের সময়ে মলয়সিংহের রেওয়ালিপি[৩৫] (১১৯২ অব্দ), চরখরি লিপি[৩৬], সারনাথের একটা লিপির বর্ণনানুযায়ী কলচুরি রাজাদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার সাক্ষ্যই বহন করে। সুতরাং ডাঃ রমেশ মিত্রের মতকে সমর্থন করে বলা যায় যে লুঠতরাজের ঘটনার নেপথ্যে হয়তো সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় ঘৃণা কাজ করেনি।[৩৭] এরপরের ঘটনা হল মুসলমান আক্রমণ। তুর্কী মহম্মদ ঘুরী ১২০৩ সালে বৌদ্ধধর্মের দুটি প্রধান বৌদ্ধ পীঠস্থান যথা নালন্দা ও বিক্রমশীলায় ধ্বংসকার্য চালান নির্বিচারে।[৩৮] কিন্তু পাশাপাশি উল্লেখ্য যে যখন তিব্বতী পরিব্রাজক ধর্মস্বামী (১১৯৭-১২৬৪ অব্দ) ঐ স্থান পরিভ্রমণে আসেন তখন তিনি বৌদ্ধভিক্ষুদের

CENTRAL LIBRARY

সেস্থানে অধ্যয়ন করতে দেখেন। যদিও ধর্মস্বামীর অবস্থানকালেই তুর্কীদের পুর্নবার নালন্দাতে আক্রমণ ও ধ্বংসের কথা জানা যায়।[৩৯] পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এই মত পোষণ করেন যে মুসলমান আক্রমণের পরও সেখানে বহু মন্দির ও বিহার নির্মিত হয়েছিল।[৪০] তারনাথও তাঁর বর্ণনায় গুজরাট, রাজপুতনায়, স্যাত্এর উড্ডিয়ানে মুসলমান বিজয়ের পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন।[৪১]

এ প্রসঙ্গে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত 'বুদ্ধচরিত' নামে একটি পদ্যরচনার কথা বলা যায় যেখানে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়েছে। এটি ১৭১১ সালের রচনা এবং নিম্নমানের সংস্কৃত, হিন্দি ও বিহারী ভাষার এটি সংমিশ্রণ।[৪২] সুতরাং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের স্বস্থানেও ধর্মের প্রায় অবলুপ্তির কোন নির্দিষ্ট তারিখ বা প্রকৃতির সঠিক বর্ণনা করা দুরূহ ব্যাপার।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম

ঐতিহাসিকরা বাংলাদেশে এবং এর নিকটবর্তীস্থানে বৌদ্ধধর্মের অবনতির কারণের স্বপক্ষে চিত্তাকর্ষক ঘটনার উপস্থাপন করেছেন। জানা যায় যে সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক কনৌজরাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে গৌড়ের অধিপতি শশাঙ্ককে বৌদ্ধধর্ম বিরোধী বলা হলেও, তাঁর কাজকর্ম বৌদ্ধধর্মের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। কারণ, হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুযায়ী রাজমহলের কাছে কজঙ্গল, সমতট ও শশাঙ্কের রাজ্য কর্ণসুবর্ণতে সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের কিছু বিহার ও বৌদ্ধভিক্ষু অস্তিত্বশীল ছিল। বস্তুতঃ সেখানে হিন্দুমন্দিরের পাশাপাশি বৌদ্ধ বিহারেরও প্রাচুর্য ছিল।[৪৩] সুতরাং শৈবধর্মাবলম্বী শশাঙ্কও রাজ্য থেকে বৌদ্ধধর্মের উৎখাত করতে পারেননি। পুনরায়, অন্য চীনা পরিব্রাজক ইৎসিংও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন।[৪৪] সেইসময় তাম্রলিপ্তি বৌদ্ধধর্মের একটি সম্প্রদায় 'সর্বাস্তিবাদী'দের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। এপ্রসঙ্গে সমতটের ব্রাহ্মণ শীলভদ্রের নামোল্লেখ করা যায় যিনি হিউয়েন সাঙের আচার্য ছিলেন।

যাই হোক্, হিউয়েন সাঙ-এর পরবর্তীকালের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা লাভ করলে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যেতে থাকে এবং বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহারগুলো ক্রমশঃ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এটিও লিপিবদ্ধ আছে যে জনসাধারণ তাদের গৃহনির্মাণের জন্য ধ্বংসস্তূপগুলো থেকে বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে চলে যেতেন।[৪৫]

এরপর বৌদ্ধধর্ম বহুদিন তমসাবৃত থেকে পালরাজদের সময়ে নতুন উদ্যমে মহাযানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পাল রাজাদের সময়কালের অভিলেখগুলো প্রমাণ করে যে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে। পালরাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু তাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য সামাজিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মকেই অনুসরণ করতো। বস্তুতঃ লিখিত উপকরণ ও স্থাপত্যকলার নিদর্শন ইত্যাদিগুলো প্রমাণ করে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পালযুগে মিলেমিশে পাশাপাশি অবস্থান করতো।[৪৬]

পরবর্তীকালে বাংলার বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের আচার আচরণের মধ্যে গূঢ়, রহস্যময় বিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

আসামে বৌদ্ধধর্ম

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনানুযায়ী আসামে বৌদ্ধধর্মের প্রচলন থাকলেও তা গুপ্তভাবে

অবস্থান করতো কারণ সেখানে তিনি কোন বৌদ্ধবিহার দেখতে পাননি।[৪৭] তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচুর সংখ্যক দেবমন্দির তিনি সেখানে দেখেছিলেন। তাঁর মতে সেখানের রাজারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক না হলেও বৌদ্ধপণ্ডিত বা শ্রমণরা সেখানে অত্যন্ত উষ্ণ সম্বর্দ্ধনা লাভ করেতেন আবার, দশম শতাব্দীর আসামের রাজা ইন্দ্রপালের সময়কালের (১০৫০ অব্দ) একটা তাম্রপট্ট পাওয়া যায় তাতে তথাগত বুদ্ধের অনুশাসন লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৪৮] এর থেকে অনুমান করা হয় যে সম্ভবতঃ কিছু সময়ের জন্য হলেও আসামে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতিলাভ করেছিল।[৪৯] পুনরায়, Edward Gait মন্তব্য করেছেন যে বৌদ্ধধর্ম কোন সময়েই আসামে বা কামরূপে বিশেষ প্রসারলাভ করেনি। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রাচীনকালের আসামের গ্রন্থগুলোতে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ রয়েছে অতি ক্ষীণ ভাবে। গৌহাটীতে একটা জনার্দন বুদ্ধমূর্তির উপাসনা করা হয় বটে কিন্তু পণ্ডিত Bloch-এর মতে ঐটি আদৌ বুদ্ধমূর্তি নয় এটা বিষ্ণুমূর্ত্তি।[৫০] এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে আসামে বুদ্ধ ও বিষ্ণু এক হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে যুক্তি হল হয়তো সেখানে একসময় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল।

ওড়িশায় বৌদ্ধধর্ম

ওড়িশা (উড়িষ্যা) ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল রূপে পরিগণিত। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ওড়িশার গুরুত্ব অপরিসীম। সেখানে বৌদ্ধধর্মের ক্রম অবলুপ্তির প্রমাণস্বরূপ বহু প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিখিত নিদর্শন পাওয়া গেছে। হিউয়েন সাঙ ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ স্থাপত্যের উল্লেখ করেছেন হিন্দু ও জৈন দেবপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি। চীনা বিবরণ অনুযায়ী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।[৫১] অন্যদিকে রক্ষণশীল বৌদ্ধরাজাদেরও ব্রাহ্মণদের দান করার কথা জানা যায়।[৫২]

পুনরায়, দশম শতাব্দীর হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গেছে যা হিন্দুধর্মের মধ্যে দেবতারূপে বুদ্ধের অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত বহন করে। তিব্বতীয় গ্রন্থেও ওড়িশায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের কথা বিবৃত রয়েছে।[৫৩] দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের সময়ও বহু ভিক্ষুকে ওড়িশায় আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা গেছে।[৫৪] তিব্বতীয় পণ্ডিত তারনাথের বর্ণনানুযায়ী ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণ থেকে ওড়িশা অব্যাহতি পেয়েছিল কারণ অন্যান্য সুপরিচিত বৌদ্ধ বিহারগুলো যথা ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা ধ্বংসের সম্মুখীন হলে বৌদ্ধপণ্ডিতরা ওড়িশাতেই স্থান গ্রহণ করে।[৫৫] পরবর্তী ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ওড়িশার প্রতাপরুদ্র নামে এক রাজার কথা জানা যায় যিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক থাকলেও পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের একজন উৎপীড়ক বলে চিহ্নিত হন।[৫৬]

বস্তুতঃ ওড়িশাতে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম মিশেই গিয়েছিল। কারণ, শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু[৫৭] এবং Sir Charles Eliot[৫৮] বলেছেন যে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির সম্ভবতঃ বৌদ্ধ স্থাপত্যই ছিল। শ্রীবসু এর সমর্থনে ওড়িয়া কবি সরলদাসের মহাভারতের একটা ছান্দিক উক্তির তর্জমা করে বলেছেন "I pay my humble respects to the incarnation of Buddha who in the form of Buddha dwells in the Nīlācala i.e., Puri."[৫৯] উল্লেখ্য যে বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার বা বুদ্ধাবতার বলতে কখনও কখনও জগন্নাথদেবকেই বোঝাচ্ছে।[৬০] Eliot সাহেব বলেছেন যে জগন্নাথদেবের মন্দিরের গর্ভগৃহে এক বিশালাকার বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল যার পিছনে দেওয়াল তৈরী করা হয়েছিল এবং জগন্নাথদেবের কাঠের মূর্তিটি একটা বৌদ্ধ নিদর্শন বা ধাতু ঘিরে তৈরী।[৬১] Eliot এর বর্ণনায় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ওড়িশার অত্যাচারী রাজা

CENTRAL LIBRARY

প্রতাপরুদ্রের সময়ের বা কিছু পরের ছজন কবির নাম পাওয়া যায় যাদের মধ্যে অচ্যুতানন্দ দাস ও চৈতন্যদাস ছিলেন প্রধান।[৬২] গ্রন্থ দুটো ওড়িশার বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের, কিন্তু উল্লেখ্য হল ভগবান কৃষ্ণ বা যিনি মুখ্যদেবতা তিনি কিন্তু প্রায় সর্বদা 'মহাশূন্য' বলে গ্রন্থ দুটোতে বর্ণিত যা মহাযান বৌদ্ধদের একটা প্রধান বিভাজন 'শূন্যবাদের' সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৬৩] সেখানে উদ্ধৃতি আছে যে কলিযুগে বুদ্ধের অনুগামীরা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করবে, সেখানে তিন হাজার ভেকধারী বৌদ্ধ ওড়িশার বিভিন্ন অংশে ছদ্মনামে বসবাস করছে এবং 'হরি' বিভিন্ন বুদ্ধের অবতার হয়ে বিরাজ করছেন এবং এই পৃথিবীতে পুনরায় বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটবে।[৬৪] 'শূন্যসংহিতা' ও 'নির্গুণ মাহাত্ম্য' গ্রন্থগুলোতে আরও উপদেশ আছে যে ওড়িশার বৈষ্ণবরা বৌদ্ধদের 'ত্রিশরণ' অর্থাৎ 'আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম, মাতা আদিশক্তির (অর্থাৎ ধর্মের) ও সংঘের শরণ নিলাম' এই অনুযায়ী চলতো—চৈতন্যদাস তাঁর গ্রন্থে পঞ্চ বিষ্ণুর কথা বলেছেন যাঁরা সম্ভবতঃ পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[৬৫] এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতামত উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে মুসলমানদের হাতে যে ভাবে বাংলার বৌদ্ধধর্ম নষ্ট হয়েছিল ওড়িশাতে তা হয়নি। উড়িশা আরও চারশো বছর স্বাধীন ছিল[৬৬] এবং ওড়িশার জগন্নাথদেব নিজেই বুদ্ধমূর্ত্তি।[৬৭] সুতরাং বলা যায় যে পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির সম্ভবতঃ আগে বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানই ছিল।[৬৮] পরে তিনি নারায়ণের অবতার হয়ে নবম অবতার বা বুদ্ধাবতার। প্রভু নিত্যানন্দের অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য চূড়ামণি দাসের চৈতন্যচরিত কাব্যের নাম 'গৌরাঙ্গবিজয়'। সেখানে চূড়ামণি দাস জগন্নাথদেবকে বুদ্ধঅবতারই বলে গেছেন।[৬৯] মধ্যযুগীয় বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থেও জগন্নাথদেবকে বুদ্ধেরই প্রতীকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। চণ্ডীদাসের একটা প্রচলিত গাথা পাওয়া যায় যেখানে বলা আছে যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তিগুলো বুদ্ধের ত্রিরত্নেরই প্রতীক।[৭০] তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চিন্তাধারাতেও জগন্নাথদেবকে উপায়রূপে, সুভদ্রাকে প্রজ্ঞারূপে বর্ণনা করা হয়েছে যাদের সম্মিলিত রূপ হচ্ছে বলরাম যা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে বোধিচিত্ত এবং যা অন্যদিকে জাগতিক পৃথিবীস্বরূপ বলা হয়েছে।[৭১]

লামা তারনাথের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে ১৫৬৮ সালে ওড়িশায় মুসলমান আক্রমণের সময় ওড়িশার সর্বশেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেবও বৌদ্ধরাজা ছিলেন যিনি কিছু বৌদ্ধমন্দির ও বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন।[৭২] সপ্তদশ শতাব্দীর মহাদেব দাস[৭৩] নামে একজন বৌদ্ধ কবির নাম পাওয়া যায়। এছাড়া Eliot সাহেব ওড়িশার 'বাথুরি' বা 'বাউরী' নামে একটা গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন যারা 'ভেকধারী বৌদ্ধ' ছিলেন এবং যারা প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে আসতেন।[৭৪] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উড়িশাতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব নিয়ে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন। পরে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হবে।

দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম

দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু উপাদান পাওয়া যায়। ফরাসী অধ্যাপক A. Chavannes[৭৫] এর বিবরণী, চীনা ভ্রমণ বৃত্তান্ত, দক্ষিণী টীকাগ্রন্থ ও তিব্বতীয় উপাদান অনুযায়ী দক্ষিণভারতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ষোড়শ শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিল।[৭৬] সুতরাং প্রচলিত যে প্রবাদ নবম শতাব্দীতে শংকরাচার্যের সংস্পর্শে এসেই বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল সেটা বলা সমীচীন নয়।[৭৭] বস্তুতঃ শংকরের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই বৌদ্ধধর্মের অবনতি শুরু হয়েছিল। কারণ, হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুযায়ী অন্ধ্র, ধান্যকটক, চুল্য বা চোলপ্রদেশে এবং মালকূটে বৌদ্ধধর্মের পতন লক্ষ্য করা গেছে। ইৎসিং কিন্তু দক্ষিণভারতের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে প্রায় নীরব ছিলেন শুধুমাত্র তিনি 'ন-কিয়া-পো-তন-নরের' অর্থাৎ নেগাপত্তমের উল্লেখ করে

CENTRAL LIBRARY

বলেছেন যে সিংহলী বৌদ্ধরা নেগাপত্তম ভ্রমণ করেছিলেন।[৭৮] দক্ষিণভারতের নেগাপত্তম বৌদ্ধদের অন্যতম তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত। বহু বুদ্ধমূর্ত্তি সেখানে পাওয়া গেছে এবং চোলদের রাজত্বকালেও নেগাপত্তমে ব্রহ্মদেশ থেকে কিছু ভিক্ষু এসেছিলেন।[৭৯] Chavannes তাঁর গ্রন্থে কোইয়ু-লৌ-কিয়া (কৌলৌক) নামে একটা সুবিখ্যাত বিহারের উল্লেখ করেছেন যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের এক রাজা।[৮০] পুনরায়, Huei-Ch'ao নামে অন্য এক চীনা পরিব্রাজক তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধমঠেরও কথা বলেছেন। সেখানে তিনি মহাযান ও হীনযান দু সম্প্রদায়েরই বৌদ্ধভিক্ষুদের অবস্থান লক্ষ্য করেছিলেন।[৮১] পুনরায়, বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক থেকে যেমন, 'মালতীমাধব' ও 'কাদম্বরী', দক্ষিণভারতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রচলনের কথা জানা যায়।[৮২] পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে তান্ত্রিক বজ্রযান সম্প্রদায় দক্ষিণভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[৮৩] চতুর্দ্দশ শতাব্দীর 'নিকায়সংগ্রহ' গ্রন্থে বজ্রযানকে বজ্রপর্বত সম্প্রদায় বলা হয়েছে যাকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন দক্ষিণ ভারতের শ্রীপর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৮৪] তিব্বতীয় উপাদান অনুযায়ী তিব্বতী রাজা স্রোন-সাঙ-গাম-পো সপ্তম শতাব্দীতে এগারোটি মুখাবয়বযুক্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি দক্ষিণ ভারত থেকে তিব্বতে আনিয়েছিলেন।[৮৫]

যাই হোক্, দক্ষিণভারতের যে কয়েকজনকে ঘিরে বৌদ্ধধর্মের নিপীড়ক হিসেবে অপবাদমূলক প্রবাদ আছে তাঁদের মধ্যে অষ্টম শতাব্দীর (মতান্তরে সপ্তম) কুমারিল ভট্ট ও নবম শতাব্দীর শংকরাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুমারিল ভট্টের আবির্ভাব ও উৎপীড়ন বৌদ্ধজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কুমারিল ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে প্রথমে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে শৈবধর্মাবলম্বী হন এবং একজন অত্যন্ত শক্তিশালী বৌদ্ধবিরোধীরূপে প্রতিপন্ন হন।[৮৬] কথিত আছে কুমারিল উজ্জয়িনীর রাজা সুধন্বার সহায়তায় আসমুদ্রহিমাচলের আবালবৃদ্ধ বৌদ্ধদের সংহারে বদ্ধপরিকর হন।[৮৭] 'কেরলউৎপত্তি'[৮৮] নামে কেরলের ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে কুমারিল ভট্ট কেরল থেকে বৌদ্ধদের বিতাড়িত করেছিলেন। তিব্বতীয় উপাদানেও কুমারিল ভট্টকে অন্যতম বৌদ্ধধর্মের নিপীড়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৮৯] শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কুমারিল প্রসঙ্গে বলেছেন, "......was one of the most potent forces actively employed in bringing about this decline".[৯০]

কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে কুমারিলের রচনাগুলোতে কিন্তু বৌদ্ধধর্মবিরোধী কোন বিশেষ মনোভাব প্রকাশ হয়নি। কুমারিলের 'তন্ত্রবার্ত্তিক'[৯১] গ্রন্থানুসারে বৌদ্ধধর্মীয় চিন্তাধারাকে তিনি প্রামাণ্য হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন (যেহেতু উপনিষদ থেকেই বৌদ্ধধর্মের মতবাদের আগমন বলে ধরা হয়)। কুমারিল বৌদ্ধধর্মকে সাংখ্য, যোগ, পঞ্চতন্ত্র ও পাশুপত ইত্যাদির সমপর্যায়েই স্থাপন করেছিলেন। কুমারিল বৌদ্ধ 'বিজ্ঞানবাদ' মতবাদকেও সুযুক্তিপূর্ণ বলে স্বীকার করেছিলেন।[৯২]

পরবর্তী প্রসঙ্গ দক্ষিণভারতের হিন্দু দার্শনিক সুবিখ্যাত শংকরাচার্য সম্পর্কিত। ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে শংকরাচার্যের চিন্তাধারা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সম্ভবতঃ ৭৮৮ অব্দে মালাবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নম্বুদ্রিরি ব্রাহ্মণ। শংকর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ চারটি মঠের প্রতিষ্ঠাতা, যথা—শৃঙ্গেরী, পুরী, দ্বারকা ও হিমালয়ের বদ্রীনাথ মঠ।

আগেই বলা হয়েছে যে শংকরকে ঘিরে বহু অপবাদমূলক প্রবাদ আছে যে তিনি বৌদ্ধধর্মের নিপীড়ক ছিলেন। তিব্বতীয় উপাদানে বলা হয়েছে যে শংকরের আগমনে বৌদ্ধবিহারগুলো কম্পমান হত এবং ভিক্ষুগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যেত।[৯৩] এমনকি সুদূর নেপালের বৌদ্ধভিক্ষুদের ওপরও তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৯৪] শংকরচার্যের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে শংকরাচার্য বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আসমুদ্রহিমাচলের বৌদ্ধদের ওপর ধ্বংসলীলা

চালান।[৯৫] শংকর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলেছেন যে বুদ্ধ মানুষের শত্রুবিশেষ এবং বুদ্ধের শিক্ষা হল পরস্পরবিরুদ্ধ ও দ্বন্দ্বমূলক।[৯৬]

অন্যদিকে বলা দরকার কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে শংকরাচার্য বৌদ্ধধর্মের আদৌ বিরোধিতা করেননি বরঞ্চ এর আংশিক মত ও ভাবধারার দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৯৭] এবিষয়ে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় শংকরাচার্যের গুরু আচার্য গোবিন্দের, পুনরায় যাঁর গুরু ছিলেন গৌড়পাদ। গৌড়পাদের গ্রন্থে বর্ণিত গৌরপাদের নিজস্ব দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শন কোন কোন জায়গায় এমন নিবিষ্টভাবে মিশে রয়েছে যে গৌড়পাদকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করতে হয়েছে যে তিনি যা বলছেন তা তাঁর স্বভাবোক্তি, বুদ্ধের কথা নয়।[৯৮] মহাযান সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদপূর্ণ উক্তিগুলোর জন্য অনেকে মনে করেন যে তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন।[৯৯] গৌরপাদের 'অলাতশান্তি' গ্রন্থটিতে বৌদ্ধ মাধ্যমিকদর্শন বর্ণিত আছে। গৌড়পাদের একটা ক্ষুদ্র রচনা 'দশাবতারস্তোত্র'তে তিনি বুদ্ধকে একজন 'পরমযোগী' বলে বর্ণনা করে দেবতাদের স্থানেই বসিয়েছেন।[১০০] বস্তুতঃ শংকরাচার্যের 'শৃঙ্গেরী' মঠ বৌদ্ধবিহারের স্থানেই এবং বৌদ্ধবিহারের ভাবধারায় নির্মিত হয়েছিল।[১০১] আরও বলা যায়, শৃঙ্গেরী মঠের স্থাপত্যকলাতেও বৌদ্ধ নিদর্শন সুস্পষ্ট।[১০২] মঠটির সংলগ্ন গ্রামে একটা বুদ্ধমূর্তি আছে যেটি শৃঙ্গেরী স্বামীর ভক্তদের দ্বারা পূজিত হয়। এবিষয়ে Sir Charles Eliot-এর মন্তব্য উল্লেখ্য—'Sankar's approval both in theory and in practice of the monastic life is Buddhistic rather than Brahmanical'.[১০৩]

অন্যদিকে, শংকরের 'অদ্বৈতবাদ' বা 'মায়াবাদ' মতটি 'পদ্মপুরাণে'[১০৪] তীব্র নিন্দাসহকারে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদর্শন' বলে বর্ণিত।[১০৫] শংকরের মূল তত্ত্বগুলো আলোচনা করলে দেখা যায় যে বৌদ্ধদের মাধ্যমিকদর্শন সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত না থাকলে তাঁর 'অদ্বৈত' মতবাদ বুঝতে পারা যায় না।[১০৬] শংকরের 'মোক্ষ' সম্পর্কিত ধারণা বৌদ্ধ 'নির্বাণবাদেরই' অনুরূপ এবং নাগার্জুনের 'শূন্যতা' শংকরের 'নির্গুণব্রহ্মের' সমতুল্য।[১০৭]

যাই হোক্, শংকরাচার্য ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধবাদী বলেই পরিগণিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীশরৎকুমার রায় মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখ্য—"যে সকল সুধী বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নূতন হিন্দুধর্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহারা এই ধর্মের উচ্চনীতি বরণ করিয়াই ইহাকে পরাভূত করিয়া থাকিবেন।"[১০৮]

উপরোক্ত প্রদেশগুলো ছাড়াও নেপালের বহুল প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম একসময়ে বহির্শত্রুর অর্থাৎ মুসলমান আক্রমণ ছাড়া বা ধর্মের নিপীড়ন ছাড়াই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। বস্তুতঃ নেপালে শৈবধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম মিলেমিশে গিয়েছিল শুধুমাত্র আচার ব্যবহারেই নয়, দার্শনিক মতবাদের ক্ষেত্রেও।[১০৯]

সুতরাং উপরিলিখিত প্রদেশগুলোর বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বৌদ্ধধর্মের পতনের নির্দিষ্ট কয়েকটা কারণ নিরূপণ করা যায় যেমন— ১) বৌদ্ধসঙ্ঘের নৈতিক অধঃপাত ২) মুসলমানী আক্রমণ ৩) হিন্দু ধর্মের নবশক্তিলাভ ও ৪) পরিশেষে হিন্দুধর্মের সঙ্গে একাত্মতা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধধর্মের অবনতির কারণ হিসেবে সর্বাগ্রে বৌদ্ধ সংঘের নৈতিক অধঃপাতের কথা বলেছেন এবং এর ওপর অতি সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন।

বৌদ্ধসঙ্ঘের নৈতিক অধঃপাত

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বৌদ্ধধর্মের বিচার করলে দেখা যাবে যে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে

CENTRAL LIBRARY

তিনটি স্তর বা পর্ব রয়েছে যথা,—আভিধর্মিক স্তর অথবা বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর থেকে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত; বুদ্ধের গূঢ় শিক্ষাতত্ত্বের ক্রমবিকাশের স্তর যা প্রধানতঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এবং মন্ত্রতন্ত্রসম্বলিত বৌদ্ধধর্মের স্তর যার বিকাশ ঘটেছিল পঞ্চম শতাব্দী থেকে।

প্রথম স্তরে বৌদ্ধধর্মের আদিরূপ অক্ষুন্নই ছিল যা ছিল মূলতঃ মনোবিদ্যাগত অর্থাৎ বাস্তববাদী জীবসাধারণের মানসিকতার বিশ্লেষণ, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধ্যানযোগ। দ্বিতীয় পর্বে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ধর্মসংক্রান্ত বিধানগুলোর বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যার প্রবণতার দ্বারা, তখন বিহারজীবনের গুরুত্ব অক্ষুন্ন থাকলেও তাদের মতবাদের সঙ্গে নতুন 'বোধিসত্ত্ব' (যিনি বুদ্ধত্ব বা বোধিজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হয়েছেন) আদর্শ যুক্ত হয়েছিল। এই আদর্শানুসারে যে কোন ব্যক্তি, তিনি গৃহী বা সন্ন্যাসী যাই হোন না কেন পুণ্যকাজের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে বুদ্ধত্বলাভ করতে পারতেন, প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে বস্তুর স্বভাব বা যথাযথভাবে বস্তুকে জানাই ছিল সেই যুগের বৌদ্ধধর্মের আদর্শ। যাই হোক্, এক কথায় নতুন আদর্শযুক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই 'মহাযান' নামে খ্যাত। শ্রীহরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয়ের মতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির সময় যে সব ভিক্ষুরা সংঘ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে 'মহাসাংঘিক' নামে ভিন্ন একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলো তারাই সম্ভবতঃ মহাযানের সৃষ্টিকর্তা।[১১০] মহাযান ধর্মে উদারতাই প্রধান, জগৎ উদ্ধারই ছিল মহাযানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মহাযানের মধ্যে মন্ত্র, তন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস, মণ্ডল ইত্যাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ বা যোগবিধি প্রবেশ করে ধর্মজগতে উৎপন্ন হয় এক অভিনব মহাযান ধর্মের, যাতে পরবর্তীকালে কতকগুলো গূঢ়, রহস্যময় গুপ্তবিদ্যার আবির্ভাব হয়। মহাযান নিঃসন্দেহে বৌদ্ধধর্মের বিপুল বিস্তৃতির জন্য প্রশংসনীয় কিন্তু অন্যদিকে মহাযানই বৌদ্ধধর্মের গুণগতমানের অধঃপতন ত্বরান্বিত করেছিল। এ বিষয়ে Sir Charles Eliot-এর মন্তব্য উল্লেখ্য যে "it was to the corruptions of the Mahāyāna rather than of the Hīnayāna that the decay of Buddhism in India was due."[১১১] শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে মহাযান অত্যন্ত উচ্চমার্গের এবং মহাযানধর্ম আয়ত্ত করতে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। এই কারণেই মহাযানের আচার্যরা মহাযান পাঠের বিকল্প ফল পাবার জন্য 'ধারণী' বা দীর্ঘমন্ত্র যা প্রধানতঃ ৫০ থেকে ১০০ অক্ষরে রচিত সেগুলো মুখস্থ করতে, জপ করতে, ও 'ধারণী' পুঁথিপূজো করতে নির্দেশ দেন। ক্রমে সংক্ষিপ্ত অর্থশূন্য মন্ত্র যথা, 'ওঁ ধুনু ধুনু ক্রীং ফট্ স্বাহা', 'ওঁ কীলে কীলে তথাগতোহধ্যবসান্তে বরহে উত্তমোত্তম-তথাগতে ভব ক্রীং ফট্ স্বাহা' ইত্যাদি সহকারে মহাযান মতে পূজো করার জন্য বিশাল সংখ্যক ধারণী তৈরী হয়েছিল মহাযানে।[১১২] জানা যায় যে নালন্দাবিহারে সেই সময় উপরোক্ত জনপ্রিয় উপায়ে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা দেওয়া হত। এইভাবে অসংখ্য ধারণী তৈরী হয়। যার মধ্যে 'বৃহদ্ধারণী' সংগ্রহে ৪১১ টি ধারণী পাওয়া যায়। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম শেষ অবস্থায় ধীরে ধীরে অর্থশূন্য এক বা দু অক্ষর মন্ত্রে যেমন—হুং, ফট্, ক্রীং, স্বাহা ইত্যাদিতে পর্যবসিত হয়। নবম শতাব্দীর পালরাজাদের সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন যান বা বিভিন্ন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রচলন দেখা যায় যেগুলো মূল বৌদ্ধ ধর্মের অশেষ ক্ষতিসাধন করে ধর্মের মধ্যে বিকৃতির আনয়ন করে এবং শেষে হিন্দুদের তন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।[১১৩]

যাই হোক্, শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধধর্মের অধঃপাতের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই 'সহজযান' নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে 'সহজযানে'ই বৌদ্ধসংঘের মান নানাভাবে নিম্নস্তরে নেমে যায় এবং এই কারণেই বৌদ্ধধর্মে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে।[১১৪] শ্রীশরৎকুমার রায় মহাশয়ও বৌদ্ধসংঘের মধ্যে নানান পথে প্রবেশমান বিকৃতিগুলোর আলোচনা করেছেন। তিনিও উল্লেখ করেছেন যে মহাযানীরা ধর্মের সরলীকরণ করার জন্য এবং সাধারণ উপাসক ও ভিক্ষুদের মধ্যে

CENTRAL LIBRARY

প্রভেদ প্রায় তুলে দেবার জন্য কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এই সুযোগ নেয় এবং এর ফলে সংঘের গুণগত মান নিম্ন থেকে নিম্নস্তরে নামতে থাকে।[১১৫] পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বিবৃত করেছেন যে সহজযানীরা বৌদ্ধধর্মকে সহজ করতে গিয়ে ব্যভিচারের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল।[১১৬] 'সহজের' আক্ষরিক অর্থ হল যা 'সহজাত' অর্থাৎ যা 'একত্রে জন্মায়' এবং প্রয়োগিক অর্থ হল 'অদ্বৈত সুখ' বা 'মহাসুখকর অবস্থা'। বুদ্ধদেব যে কামোপভোগ নিবারণের জন্য ও চরিত্রবিশুদ্ধির ওপর জোর দেবার জন্য নিয়ম করেন সেই চরিত্রবিশুদ্ধি সহজযান একেবারেই পরিত্যাগ করে। বৌদ্ধধর্ম সহজ করতে গিয়ে সহজযানীরা যে মত প্রচার করছিল তার জন্য তারা পঞ্চকামোপভোগে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সহজযানীরা দেহতত্ত্বের গান ও 'সান্ধ্যভাষায়' গান লিখতে শুরু করেন। সান্ধ্যভাষার অর্থ হল 'আলোআঁধারি ভাষা'। প্রথমে শুনলে একরকম অর্থ হয় এবং ভেবে দেখলে তার গূঢ় বা নিবিড় মারাত্মক অর্থ দাঁড়ায়। শাস্ত্রীমহাশয় বর্ণনা করেছেন যে দেহতত্ত্বের মধ্যে এসে সহজিয়ারা ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পড়তে থাকে এবং 'ক্রমে বৌদ্ধধর্ম নেড়ানেড়ির দলে চলে যেতে থাকে'।[১১৭] তিনি একদশ শতাব্দীর শেষ দিকের রচনা কৃষ্ণমিশ্রর 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'[১১৮] এর তৃতীয় অঙ্কের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে বৌদ্ধ ও জৈনদের সম্পর্কে নিন্দনীয় কথা লেখা আছে। এই সময় থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিবাহ করতে আরম্ভ করে। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায়, কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে চাচ্‌নামা গ্রন্থেও বিবাহিত বৌদ্ধভিক্ষুদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১৯] পরবর্তীকালে মহাযানীরা বোধিসত্ত্বের সুউচ্চ চিন্তাধারা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মনে করতেন যে শাক্যমুণি বুদ্ধ যেহেতু বিবাহিত ছিলেন সেহেতু বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও বিবাহ করতে পারেন।[১২০] পুনরায়, মহাযানী একটা শাখা বৈতুল্যবাদীদের মধ্যে এটাও প্রচলিত ছিল যে কোন কোন বিশেষ কারণে 'মৈথুন ধর্ম' বা 'মেথুন ধম্ম' পালন করা যায়।[১২১] এ বিষয়ে অধ্যাপক যোশী মন্তব্য করেছেন যে নারীশক্তি সহযোগে তন্ত্রসাধনার উৎস হয়তো এটাই ছিল।[১২২]

এরপর বৌদ্ধধর্মের মধ্যে গুহ্যপূজা[১২৩] আরম্ভ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বর্ণনা করেছেন যে সেসময় যেসব দেবমূর্ত্তির পূজো করা হত সেগুলো বাইরে লোকজনের সামনে বের করা যেত না কারণ সেগুলো ছিল অশ্লীল মূর্তি, মূর্ত্তিগুলোর সেযুগে নাম ছিল 'শম্বর'[১২৪]। এইসব অশ্লীল মূর্ত্তিগুলোই তখন বৌদ্ধদের প্রধান উপাস্য হয়ে দাঁড়ায়। বোধিসত্ত্ব ও যোগিনীদের মিলিত ধ্যানকে বলে সাধন। 'সাধনমালা'[১২৫] বলে একখানি গ্রন্থ আছে যেখানে এরকম ২৫৬টি সাধনমন্ত্র লেখা আছে। সেইসব উপাসনার প্রকার এতই অশ্লীল যে সভ্যসমাজে তা বর্ণনার অতীত। শাস্ত্রীমশাই একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের উল্লেখ করেছেন যিনি বৌদ্ধদের এধরণের পুঁথিকে 'ঘোমটা দেওয়া কামশাস্ত্র' বলে বর্ণনা করেছেন।[১২৬] তিনি আরও বলেছেন যে কামশাস্ত্র যেখানে শেষ হয়, সেখানেই নাকি বৌদ্ধদের গুহ্যপূজার আরম্ভ।[১২৭] 'শ্রী গুহ্যসমাজ তন্ত্র'[১২৮] বা 'তথাগতগুহ্যক' নামের গ্রন্থে বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল ক্রিয়াকর্মের উপদেশ দেয়া আছে তার থেকে ভয়ানক ও ঘৃণিত মত বা ক্রিয়াকর্মের কল্পনাও করা যায় না। অন্যদিকে, বুদ্ধদেব প্রাণীহিংসার একান্ত বিরোধী হলেও তিনি নাকি তন্ত্রশাস্ত্র 'তথাগতগুহ্য'তে গুহ্যসিদ্ধিলাভ করার জন্য বিষ্ঠা, মূত্র বিভিন্ন মাংসসহযোগে সেবন করতে বলেছেন। কারণ হিসেবে বলেছেন যে এগুলো না করলে সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয় না।[১২৯] পুনরায় গ্রন্থটিতে নির্দেশ দেওয়া আছে যে 'সাধক কোনো সদাশয় চন্ডালের বারো বছরের কন্যাকে বিশেষভাবে প্রত্যহ নির্জনে সেবা (অর্থাৎ পরিচর্যা) করবে।'[১৩০] অর্থাৎ সর্বপ্রকার কামোপভোগের দ্বারাই অচিরেই সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব কেবলমাত্র দুস্কর কঠোর নিয়ম পালনের দ্বারা নয়।[১৩১] 'তথাগত গুহ্যক' ছাড়াও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এধরণের আরো অনেক পুস্তকের কথা বলেছেন যথা—সম্পুটতন্ত্র, হেরুকাভ্যুদয়, গুহ্যবজ্র, হেবজ্রতন্ত্র, কালচক্রগর্ভতন্ত্র, চক্রসম্বরতন্ত্র, জ্ঞানগর্ভ, জ্ঞানতিলক, যোগিনীসঞ্চার্য্য, মহাসম্বোরোদয়,

CENTRAL LIBRARY

যোগিনীতন্ত্ররাগপরমমহাদ্ভুত, মহামুদ্রাতিলক, আর্যাডাকিনীবজ্র, পঞ্জরমহাতন্ত্ররাজকল্প ইত্যাদি।[১৩২] এইসব গুহ্যবিদ্যার পুস্তকের আবার টীকা, টিপ্পনী, পঞ্জিকা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, প্রয়োগ পদ্ধতি প্রকরণও অনেক আছে। সুতরাং এই সব পুস্তক পড়ে, তার নির্দেশানুযায়ী ক্রিয়াকর্ম হত যখন, তখন বলা বাহুল্য, অধঃপাতের আর কিছু বাকী থাকতো না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পর্যালোচনা করে বলেছেন যে, যে মূল বৌদ্ধধর্মে দেবতার সংস্রব ছিল না, দেবতার পূজার্চনার কোন স্থান ছিল না সেখানে কিন্তু বুদ্ধের দেহরক্ষার পর চারপাঁচ শতকের মধ্যেই বৌদ্ধবিহারগুলোতে প্রথমে বুদ্ধের প্রতীক চিহ্ন ও পরে বুদ্ধমূর্ত্তি পূজোর প্রচলন হয়। শুধুমাত্র শাক্যমুনি বা গৌতমবুদ্ধই নয়, ক্রমে ক্রমে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধদের পঞ্চশক্তি বা সঙ্গিনীদের পূজোরও প্রচলন ঘটে। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পাশাপাশি পঞ্চ বোধিসত্ত্বের আগম ঘটে যাঁদের মধ্যে জ্ঞানের দেবতা মঞ্জুশ্রী ও করুণার প্রতিমূর্ত্তি অবলোকিতেশ্বর ও তারাদেবী অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেন।[১৩৩] তিনি বৌদ্ধসংঘের বিকৃতিকরণের প্রসঙ্গে বলেছেন যে ভিক্ষুণীসংঘ তৈরী হবার পর বুদ্ধ সংঘের বিশুদ্ধিকরণের জন্য বহু কঠোর নিয়মের প্রচলন করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সংঘের মধ্যে বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করতে আরম্ভ করে এবং এইভাবে একদল গৃহস্থ ভিক্ষুর সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, ঐ সব গৃহস্থ ভিক্ষুদের থেকে সংঘের ভিক্ষুদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বেশি ছিল। এইসব গৃহস্থ ভিক্ষুদের 'আর্য' নামে অভিহিত করা হত এবং গৃহস্থ ভিক্ষুরা ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। কথিত আছে, ঐ সব গৃহস্থ ভিক্ষুদের সন্তানাদি স্বভাবতই ভিক্ষু বলেই পরিচিত হত।[১৩৪] গৃহস্থ ভিক্ষুদের পুত্ররা হিন্দুদের সমাজের সংস্কার 'পৈতে' গ্রহণের ন্যায় ত্রিশরণ গ্রহণ, পঞ্চশীল গ্রহণ করতো।[১৩৫] গৃহস্থ ভিক্ষুরা কাজকর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতো। এভাবে 'জাত-বৈষ্ণব' সম্প্রদায়ের ন্যায় 'জাতভিক্ষু' নামে একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। শরৎকুমার রায় মহাশয় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে "এইরূপে বৌদ্ধধর্মের পৌরহিত্যের কাজটি মূর্খদের হস্তে পড়িয়া বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি হইতে লাগিল।"[১৩৬] ডঃ রমেশ মিত্র মহাশয়ও বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের জন্য সরাসরি দায়ী করেছেন সংঘের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের বিকৃতিকরণকে বা সংঘকে কলুষিত করাকে।[১৩৭] পরবর্তীকালের বৌদ্ধগ্রন্থগুলোতেও এর সাক্ষ্যপ্রমাণ বর্তমান। চীনাভাষায় অনূদিত একটা সূত্রে ধর্মের পতন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে 'ভিক্ষুগণ সকল পাপকর্ম করে আনন্দলাভ করবে। তাঁরা চৌর্যকার্যে যুক্ত হবে, লুণ্ঠনরাজ চালাবে, গবাদিপশু চরাবে ও কৃষিকার্য করবে। তারা নিম্নস্তরের কাজকর্ম করবে, দেশের রাজাগণও রাজকার্য করবে না'।[১৩৮] পুনরায় 'রাষ্ট্রপাল-পরিপৃচ্ছা'[১৩৯] গ্রন্থেও সমপর্যায়ের ভবিষ্যৎবাণীর উল্লেখ আছে যে বুদ্ধ একস্থানে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন যে ভিক্ষুগণ নেশায় আক্রান্ত হবেন, বিবাহ করবেন ও জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবেন।

শুধুমাত্র চৈনিক উপাদানেই নয় তিব্বতীয় বু-তোনএর[১৪০] গ্রন্থ ও জাপানের উপাদানগুলোতেও ভিক্ষুদের নিম্নস্তরের মনোবৃত্তির কথা বলা আছে।[১৪১] চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃত করেছেন ভরুকচ্ছের ভিক্ষুদের বিদ্যাশিক্ষায় অবহেলার কথা, চোলদেশের ভিক্ষুগণের নিম্নস্তরের অভ্যাসের কথা এবং সিন্ধুপ্রদেশের লালসাভোগী আচার্যদের লাম্পট্যের কথা।[১৪২] অপর চীনা পরিব্রাজক ইৎসিংও আচার্যদের দুর্নীতির কথা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন।[১৪৩] মুসলমান ঐতিহাসিকরা আরবদের সিন্ধুপ্রদেশ জয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে ৮ম শতাব্দীতে বহু বিবাহিত ভিক্ষু সিন্ধুপ্রদেশে দেখা যেত। এছাড়া বিভিন্ন দেশীয় উপাদানে যথা—কল্হণের 'রাজতরঙ্গিনী'তে বলা আছে যে যুকাদেবীর তৈরী বৌদ্ধবিহারের অর্দ্ধেক

CENTRAL LIBRARY

অংশ দেওয়া হয়েছিল অবিবাহিত ভিক্ষুদের আর অর্দ্ধেক দেওয়া হয়েছিল বিবাহিত ভিক্ষুদের। শুধু তাই নয়, বিবাহিত ভিক্ষুরা জমিজমা, সম্পত্তির অধিকারীও ছিলেন।[১৪৪] মহেন্দ্রবর্মণ রচিত একটি নাটক 'মত্তবিলাস'এ বলা আছে যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মদ এবং নারীতে আচ্ছন্ন হবার সপক্ষে বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিত।[১৪৫] পুনরায়, 'ভগবজ্জুকম'[১৪৬] এ বলা আছে যে বৌদ্ধবিহারগুলোতে যখন হতদরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরা ভিড় জমাতো খাদ্যলাভের আশায়, তখন তাদের খাদ্য দেওয়া হত মস্তক মুণ্ডনের পরিবর্তে।[১৪৭] আবার ভিক্ষুদের বর্ণনা পাওয়া যায় যে তাঁরা প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় চীবর, ভিক্ষাপাত্র এবং ছত্র গ্রহণ করলেও শীঘ্র তাঁরা প্রথম দুটি উপকরণ পরিত্যাগ করতো।[১৪৮] দণ্ডিণ-এর 'দশকুমারচরিতম্' গ্রন্থে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাঁরা খবর আদানপ্রদানের কাজে যুক্ত থাকতেন এবং সেই কাজ পরিচালনা করার জন্য একজন প্রধান ভিক্ষুণী থাকতেন ঠিক যেমন কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' গ্রন্থে একজন পরিব্রাজিকার কথা বলা আছে।[১৪৯] 'মালতীমাধব' নাটকে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসিনী ও তাঁর দুজন সহচরীকে দেখা যায় এক প্রেমিকযুগলের গোপন সম্পর্কে সাহায্য করতে।[১৫০] কৃষ্ণমিশ্রর 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়'এ, ক্ষেমেন্দ্রর 'নর্মমালা'তে, কবিরাজ শঙ্খধরের নাটক 'লটকমেলক'তে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের বিভিন্ন ধরণের সাংসারিক কাজকর্মে জড়িয়ে পরতে দেখা গেছে। এমনকি সন্ন্যাসিনীদের ধোপিনীর কাজেও যুক্ত থাকতে দেখা গেছে।[১৫১] পুনরায়, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের সম্মানহীনতার কথা প্রকাশ পেয়েছে সংস্কৃত গ্রন্থ 'সাহিত্যদর্পণে' (৩,১৫৭) যেখানে 'প্রব্রজিতা'দের একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে সখী এবং নটীদের সঙ্গে, যারা খবর আদানপ্রদানের কাজে নিযুক্ত থাকতেন।[১৫২] অন্যদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অত্যন্ত সম্মানজনক পদেও আসীন থাকতে দেখা গেছে, যেমন তিব্বতীয় উপাদানে বলা আছে যে প্রসিদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতী রাজার আমন্ত্রণে তিব্বতে যাওয়ার আগে ভিক্ষুণী বিহারের সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিব্বতে গিয়েছিলেন।[১৫৩]

অন্যদিকে, প্রকৃত ভিক্ষুরা কিন্তু বিহারেই থাকতেন এবং বিহারের জমিজমার আয় থেকেই কোনরকমে জীবনধারণ করতেন।[১৫৪] রাজনৈতিক অস্থিরতায় বৃহৎ রাজশক্তিগুলো যখন ক্রমশঃ ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হচ্ছিল তখন অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে রাজারাও বিধর্মী হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও রাজসম্মান থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন কারণ রাজারাও আর বিধর্মী পণ্ডিত প্রতিপালন করতে পারতেন না। সুতরাং প্রকৃত ভিক্ষু ও বৌদ্ধবিহারগুলোর অবস্থা ক্রমান্বয়ে শোচনীয় হয়ে উঠতে থাকে। আবার চরিত্রহীন, পাপাচারযুক্ত সামাজিক বৌদ্ধগণের ক্রিয়াকাণ্ডে লোকসাধারণের মনে বৌদ্ধদের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে বৌদ্ধরা সমাজে ধর্মবলহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে।[১৫৫]

মুসলমান আক্রমণ

এরপর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমশাই আলোচনা করেছেন মুসলমান আক্রমণ সম্পর্কে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্মের অভ্যুত্থানও বৌদ্ধধর্মের পতনের অন্যতম কারণ। এটি অনস্বীকার্য যে উত্তরভারতের সীমান্তপ্রদেশে, কাশ্মীর, পাঞ্জাবপ্রদেশে মুসলমানদের অমানবিক অত্যাচারে ভারতের বৌদ্ধধর্মের বিশেষ ক্ষতিসাধন ঘটে। ঐতিহাসিক V.A. Smith এর মতে সকল ধর্মীয় উৎপীড়নকারীর মধ্যে মুসলমানরাই ছিল সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী।[১৫৬] বস্তুতঃ মুসলমানদের অত্যাচারের সাক্ষরই ইতিহাস বহন করছে বলা যায়। বৌদ্ধ বিহারগুলো ধ্বংস করে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা করে তারা ধর্মীয় অত্যাচার চালায়। এ বিষয়ে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে আফগানিস্তানের পাঠানরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সেই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য

ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করবার নিমিত্তে বঙ্গদেশে এসে বৌদ্ধ বিহারগুলো ধ্বংস করে দেয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে মুসলমান আক্রমণের সময় বল্লাল সেন ছিলেন বঙ্গদেশের রাজা। তাঁর সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিল আটশো ঘর এবং অবশিষ্ট সবই ছিল বৌদ্ধ।[১৫৭] কথিত আছে যে, এক ওদন্তপুরী বিহারেই দুহাজার আসল ভিক্ষুদের বধ করা হয়।[১৫৮] বিক্রমশীলা, নালন্দা ও জগদ্দল প্রভৃতি বড় বড় বিহারগুলোরও একই দশা ঘটে।[১৫৯] যাই হোক, শাস্ত্রীমশাই-এর মতে আসল ভিক্ষু এই সময় থেকেই প্রায় লোপ পেয়েছিল। যদিও কিছু আসল ভিক্ষু ভারতের উত্তরে নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া এবং দক্ষিণে শ্রীলংকা (সিংহল) ও মায়ানমারে (ব্রহ্মদেশে) পালিয়ে গিয়েছিল[১৬০] এবং এই পর্যন্তই বাংলার বৌদ্ধধর্মের অবস্থানের শেষ। তিনি অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে এক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন যে "নাগার্জুনের মতো তীক্ষ্ণধী মনীষী 'মাধ্যমিককারিকা'য় যে ধর্মের দৃঢ় দার্শনিক ভিত গড়ে দিয়েছিলেন তার মহিমা ক্ষয় হতে হতে সাত-আটশো বছরে এমন রূপান্তর ঘটে গেল যে তাকে আর বুদ্ধদেবের ধর্ম বলে চেনা সম্ভব ছিল না।"[১৬১] তাঁর মতে মুসলমান আক্রমণ হল তারই 'প্রায়শ্চিত্ত'। তিনি বলেছেন "বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভ চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখানো—এই সকলের পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গদেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল।"[১৬২]

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিরূপিত বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের কারণ হিসেবে বৌদ্ধসংঘের বিকৃতিকরণ ও মুসলমানী আক্রমণ ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলো কারণ উল্লেখ করা যায় যেমন—হিন্দুধর্মের নবশক্তিলাভ, অবৌদ্ধ শাসকদের প্রতিকূলতা ও পরিশেষে হিন্দুধর্মের সঙ্গে একাত্মতা। ডঃ অনুকূল চন্দ্র ব্যানার্জ্জী অতিরিক্ত একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বৌদ্ধধর্মের 'দুঃখবাদ' এর।[১৬৩] ডঃ ব্যানার্জ্জী মতে বৌদ্ধধর্মের মূলঅংশ 'চত্তারি অরিয়সচ্চানি' অর্থাৎ চারটি আর্যসত্যের প্রধান বিষয় যে তত্ত্বমূলক দুঃখবাদ, 'জগৎ দুঃখময়, জন্ম দুঃখময়, সুখ ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মত'—এই মতবাদ সাধারণ লোকেরা পরবর্তীকালে মেনে নিয়ে পারেনি। কারণ মানুষ সুখ চায়, দুঃখ মানুষের অপছন্দের। হয়তো 'দুঃখবাদ'ও বৌদ্ধধর্মের ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা হারানোর একটি কারণ বলে ধরা যায়।[১৬৪] হিন্দুধর্মের নবশক্তিলাভের প্রসংগে বলা যায় যে যখন বৌদ্ধধর্ম তার বৈপ্লবিক মতবাদ নিয়ে বেদ ও উপনিষদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করে জনসাধারণকে দ্রুত বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণ করছিল ঠিক তখনই হিন্দু দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকগণ আবির্ভূত হয়ে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু ধর্মাচার্যরা যেমন—উদ্যোতকর, কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য, উদয়নাচার্য, রামানুজাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দিকপালরা বৌদ্ধধর্মবিরোধী দার্শনিক ধর্মমত প্রচার করে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে পুনরায় দৃঢ়ভূমিতে স্থাপন করেন। ফলস্বরূপ, সাধারণ মানুষ বৌদ্ধধর্মের ওপর ক্রমশঃ আস্থা হারাতে থাকে।[১৬৫]

অবৌদ্ধ শাসকদিগের প্রতিকূলতা সম্পর্কে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথের রচনা, কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিনী', হিউয়েন সাঙের 'ভ্রমণবৃত্তান্ত', মহাযান ধর্মগ্রন্থ 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্পলতা', গৌররাজ শশাঙ্কের সময়কালে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলো থেকে জানা যায় যে শুঙ্গরাজা পুষ্যমিত্র, দুর্ধর্ষ হুননেতা মিহিরকুল বা মিহিরগুল ও শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। যদিও উপরোক্ত রাজাগণ বৌদ্ধধর্মের ঘোরবিদ্বেষী ছিলেন কিনা এই নিয়ে পণ্ডিত বর্গের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত আছে।[১৬৬] এর সঙ্গে এসে যায় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাসের বিষয়। মগধরাজ বিম্বিসার,

অজাতশত্রু, কুষাণরাজ কণিষ্ক, কনৌজের রাজা হর্ষবর্দ্ধন এবং বাংলার পালরাজাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতার অবসান ঘটে এবং বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিপর্যয় নেমে আসে। সুতরাং রাজরাজাদের আনুকূল্যের অভাব বৌদ্ধধর্মের তিরোধানের একটি অন্যতম কারণরূপেই বিবেচ্য।[১৬৭]

পরিশেষে হিন্দুধর্মের সঙ্গে একাত্মতার প্রসঙ্গ আসে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে কিভাবে গ্রাস করে নিয়েছিল তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে হিন্দুধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৬৮] বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম বৌদ্ধদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল। অন্যদিকে গুপ্তযুগ থেকে দেখা যায় যে গুপ্তরাজারা যারা 'পরমভাগবত' বলে খ্যাত ছিলেন তাঁরাও বৌদ্ধ পণ্ডিত ও বৌদ্ধবিহারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। পুনরায়, অন্যান্য কয়েকজন রাজার নামোল্লেখ করা যায় যাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী না হয়েও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যেমন—কাথিয়াওয়ারের মৈত্রক রাজাগণ, কামরূপের রাজা কুমার, ওড়িশার ভৌমকারগণ। তাছাড়া কনৌজরাজ হর্ষবর্দ্ধনের নাম করা যায় যিনি মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে খ্যাত হলেও বুদ্ধ ব্যতীত শিব এবং সূর্যেরও উপাসক ছিলেন। পালরাজাদের সম্পর্কেও একই উক্তি করা যায় যে তারা বৌদ্ধধর্মের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না, কারণ তাদের রাজত্বকাল ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক বলে ইতিহাসে চিহ্নিত।[১৬৯] পালরাজারা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের জন্য কেবলমাত্র বিহারই নির্মাণ করেননি, তাঁরা বিভিন্ন হিন্দুমন্দিরও নির্মাণ করান। ঐতিহাসিক তারনাথ উল্লেখ করেছেন যে পালরাজাদের মন্ত্রীরা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁরা বৌদ্ধ চৈত্যগুলোতে কিছু কিছু হিন্দুদেবতাদের মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭০] কাশ্মীরের ইতিহাসেও একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে বুদ্ধ ভারতীয় জনসাধারণের মনে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছিল এবং তাঁর ধ্যানধারণা কয়েক শতাব্দী ধরে উচ্চপ্রশংসিত ছিল। বুদ্ধ সর্বশেষে হিন্দুদের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত। শংকরের ক্ষুদ্রকায় 'দশাবতারস্তোত্র'তে বুদ্ধ শ্রদ্ধাসহকারে যোগী বলে উল্লিখিত, ষষ্ঠ শতাব্দীর 'মৎস্যপুরাণের' গাথাগুলোতে বুদ্ধ বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার রূপে চিহ্নিত। তাছাড়া বিভিন্ন পুরাণে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে', যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির অর্থকথায়, ক্ষেমেন্দ্রর 'দশাবতারচরিতে', মাঘের 'শিশুপালবধে', বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'তেও বুদ্ধ উল্লিখিত। এভাবেই বুদ্ধ একজন প্রসিদ্ধ হিন্দু দেবতায় পর্যবসিত হয়েছেন।[১৭১]

পরিশেষে, বৌদ্ধতন্ত্র সম্পর্কে বলা যায় যে তন্ত্রের ক্ষেত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনা এমনভাবে একীভূত হয়ে গিয়েছিল যে দুটি ধর্মকে পৃথকভাবে নির্দেশ করা সম্ভবপর হত না। এক্ষেত্রে Dr. Joshi'র উদ্ধৃতির উল্লেখ করা যায়—'Lastly, the Tantra practices harmonised the two systems so completely that Buddhism's independent existence might have appeared needless or even impossible''.[১৭২] পণ্ডিতবর্গ যথা—Smith সাহেব, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ রমেশ চন্দ্র মিত্র, Sylvain Levi ও অন্যান্য কয়েকজন মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটে অজ্ঞাতসারেই, প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এক হয়ে যাবার জন্য এবং বুদ্ধ ধীরে ধীরে হয়েছেন 'a maker of modern Hinduism'।[১৭৩] এ প্রসঙ্গে শ্রীশরৎকুমার রায়ের মন্তব্য উল্লেখ্য—"বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক সাধনামূলক ধর্ম ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয় নাই, উহা নিখিল ভারতের চিরন্তর উদারধর্ম মধ্যে স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তায় মিশাইয়া দিয়াছিল।"[১৭৪] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহাশয় এ বিষয়ে বাংলাদেশের কথা উপস্থাপন করেছেন যে যখন আফগানেরা বাংলা দখল করেন তখন পূর্বভারতের অধিকাংশ লোক ছিল বৌদ্ধ। এর আগের পাঁচ শতাব্দী ধরে বৌদ্ধরাই বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করেছিলেন। সেনেরা বাংলাদেশের একাংশে এক শতাব্দী কাল ধরে রাজত্ব করেছিলেন। তার আগে পালরাও বৌদ্ধ ছিলেন। বল্লাল সেনের[১৭৫] সময় জনগণনা (census) করার কথা জানা যায়, তারমধ্যে বাংলায় ব্রাহ্মণ বলতে তখন ৩৫০ ঘর রাঢ়ী ও ৪৫০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন। তার ওপর আরও ৭০০ ঘর সাতশতী আর ৫০০ ঘর বিদেশীয় ব্রাহ্মণ ধরে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তাতে দেখা যায় যে ২০০০ ঘরের বেশি ব্রাহ্মণ এদেশে ছিলেন না[১৭৬]। শাস্ত্রীমশাই মন্তব্য করেছেন যে "২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে বাংলায় ২৫টা জেলা হিন্দু করা যায় না, উহার দশ ভাগের এক ভাগও হিন্দু করা যায় না। ....কেমন করিয়া এই ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে এই বিশাল দেশকে ৭০০ বছরের মধ্যেও হিন্দু করিয়া তুলিয়াছেন, বৌদ্ধের নাম পর্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা একটা মহা-সমস্যা, একটা বিরাট ব্যাপার, একটা রহস্যময় ঘটনা।"[১৭৭] তিনি একাধারে বৌদ্ধদের অমিত শক্তি অনুভব করে বিস্মিত অন্যদিকে বাঙ্গলী ব্রাহ্মণের অমিত শক্তি, অমিত ধৈর্য ও অমিত পরাক্রম স্মরণ করে আশ্চর্য হয়েছেন।

বস্তুতঃ মহাযান ধর্ম হিন্দুধর্মের অনেকাংশই গ্রহণ করেছিল ও হিন্দুধর্মের বহু মৌলিক উপাদান ঢুকিয়ে নিয়েছিল। ঠিক সেরকমই হিন্দুধর্মও বৌদ্ধধর্মের মূলাংশগুলো সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নিয়েছিল। যেমন—বুদ্ধকেই ধরা হয়েছিল বিষ্ণুর অংশরূপে, বিষ্ণুর দশম অবতারের মধ্যে বুদ্ধ নবম অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত হলে বৌদ্ধধর্মের স্বাতন্ত্র্যের উচ্ছেদ ঘটেছিল আবার, বৌদ্ধধর্মে কখনও হিন্দুধর্মের ন্যায় গৃহস্থদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট কোন প্রাচীন নিয়ম নির্ধারণ করা হয়নি।[১৭৮] সমাজকে পরিচালনা করার বা উপাসক (গৃহী বৌদ্ধ)দের জন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়মকানুন ছিল না। তার ফলে বৌদ্ধ উপাসকগণ হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার সামাজিক নিয়মই মেনে চলতো।[১৭৯] আচার্য উদয়ন দাবী করেছেন যে বৌদ্ধগণ হিন্দুদেরই আচারআচরণ, রীতিনীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তারমতে এমন কোন ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচারআচরণ, রীতিনীতি, শাস্ত্র বা দর্শন নেই যা বেদবর্হিভূত।[১৮০] এ বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও বলেছেন "Buddhism never cut itself asunded from the parent stalk of Brahmanism."[১৮১]

যাই হোক্, পরিশেষে এটি উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষে কোন কোন অংশে যখন বৌদ্ধধর্মের পতনের সূচনা হয় তখন কিন্তু সবস্থানে তা সমভাবে ঘটেনি। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের স্থানে স্থানে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম স্বমহিমাতেই বিরাজিত ছিল।[১৮২]

উপসংহার

পরিশেষে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভারতবর্ষে স্থিতিশীল বৌদ্ধধর্মের কথা বলেছেন। তিনি স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে পূর্বভারতে বিশেষতঃ ওড়িশা ও বাংলাদেশে 'টিকে থাকা বৌদ্ধধর্মের' প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন তাঁর রচনাসংগ্রহে।[১৮৩] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ওড়িশাতে বৌদ্ধধর্ম ষোড়শ বা সতেরোশ শতাব্দী পর্যন্ত নিঃসন্দেহে প্রচারিত ছিল। তিনি আরও বলেছেন যে ওড়িশার গরজাত মহলের 'বোধ' (বুদ্ধ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন)-তে বর্তমানেও কিছু কিছু বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।[১৮৪] বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার জঙ্গলে কিছুদিন ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষক (Archaeological Surveyor) হয়েছিলেন তখন তিনি সেখানে স্থিতিশীল বৌদ্ধধর্মের সন্ধান পান। ময়ূরভঞ্জে থাকাকালীন তিনি 'পান' গোষ্ঠীর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে 'ধর্মগীতা' (মহাদেব দাস বিরচিত) নামে একখানি গ্রন্থের সন্ধান

CENTRAL LIBRARY

পান যেখানি 'মহাযান' বৌদ্ধধর্মের মতবাদ সম্বলিত। এরপর বসুমহাশয় সেখানকার কিছু কিছু বয়স্কব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যারা বাংলাদেশের পালরাজাদের আমলের (অর্থাৎ দশম-একাদশ শতাব্দীর) 'গীত' শোনান। বাবু নগেন্দ্রনাথ বসুও বলেছেন যে পালযুগের বৌদ্ধধর্মের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[১৮৫] শাস্ত্রী মহাশয় আবার 'শরাকি' তাঁতি নামে একটি গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন যাদের পুরী এবং কটক জেলার স্থানে স্থানে দেখতে পাওয়া যেত। তাদের বিবাহাদি ইত্যাদি শুভকাজে ব্রাহ্মণদেবতাদের পাশাপাশি বুদ্ধদেবের পুজো করা হত।[১৮৬] পশ্চিমবঙ্গে ছোটনাগপুর ও মানভূমেও শরাক বা শরাকিদের দেখা যায়। কিন্তু তারা একেবারেই হিন্দু। এ বিষয়ে H.H. Risley মন্তব্য করেছেন যে এদের পূর্বপুরুষরা জৈনধর্মাবলম্বী ছিল পরে হিন্দুসমাজভুক্ত হয়েছেন। বীরভূমেও এদের সন্ধান পাওয়া যায় যারা কৃষি এবং তাঁতের কাজ করেন, এরা হল জৈন।[১৮৭] 'শরক' কথাটির উৎপত্তি 'শ্রাবক' থেকে এবং শব্দটি 'শ্রাবকের অপভ্রংশ'। Sir Charles Eliot বলেছেন যে এরা প্রাচীন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল।[১৮৮] এদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে কোন সুস্পষ্টবোধ নেই কিন্তু এরা বছরে একবার ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরির গুহামন্দিরে বুদ্ধদেব বা চতুর্ভুজের আরাধনা করার জন্য মিলিত হত।[১৮৯] এদের 'অহিংসা পরম ধর্ম'—শীলটির দ্বারা সর্বপ্রকার ধর্মানুষ্ঠানের সূচনা হত।[১৯০] এরা পুরীর মন্দিরের প্রতিও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।[১৯১] কটক জেলার বরম্বা, তিগরিয়া ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলের 'শরক'রা নিজেদের বৌদ্ধ বলেই পরিচয় দিত।[১৯২] বিংশশতাব্দীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিহার, ওড়িশা ও অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী নিয়ে শরকরা ছিল ১৮৭০৭ জন। এদের মধ্যে ১৬৬৫৯ জন হিন্দু, ২১৫ জন জৈন ও ১,৮৩৩ জন বৌদ্ধ।[১৯৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মুসলমানদের হাতে বাংলার বৌদ্ধধর্ম প্রায় ধ্বংশ হলেও ওড়িশায় সেসময় মুসলমানদের পদার্পন ঘটেনি। যার ফলে ওড়িশা আরও প্রায় চারশো বছর পর্যন্ত স্বাধীন ছিল।[১৯৪] পুরীর জগন্নাথদেব বা দারুব্রহ্ম বুদ্ধেরই একটি রূপ বলে স্বীকৃত। কারণ ওড়িয়া সরলদাসের 'মহাভারতে' বলা আছে—

নবমে বন্দহ শ্রীবুদ্ধ অবতার।
বুদ্ধরূপে বিজে কলে শ্রীনীলকন্দর।।[১৯৫]

তাছাড়া Sir Charles Eliot,[১৯৬] শ্রীশরৎ রায় মহাশয়,[১৯৭] শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত,[১৯৮] শ্রীমনমোহন গাঙ্গুলী[১৯৯] বলেছেন যে পুরোনো বৌদ্ধমন্দিরের ভিটেতেই পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এ বিষয়ে ডঃ নলিনীনাথ দাশগুপ্তের উল্লিখিত প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি পদের কথা বলা যায়—

"পুন তা তাজিয়া বৌদ্ধ অবতার হইল মূরতি তিন।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর সুভদ্র তাহাতে চিন্ (চিহ্ন)।।[২০০]

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের অর্থাৎ বৌদ্ধ ত্রিরত্নের রূপান্তর—এই ধারণা দ্বিজ চণ্ডীদাসের আগেও ছিল এমনকি বাংলার বাইরেও ছিল।[২০১] মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'[২০২] কাব্যে বুদ্ধাবতারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে—

"ধরিয়া পাষাণ্ড মত, নিন্দা করি বেদপথ,
বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ"।[২০৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিষ্ণুর দশাবতারের পরিকল্পনায় নবম অবতারের স্থান অধিকার করে আছেন কখনও বুদ্ধ কখনও জগন্নাথদেব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে

CENTRAL LIBRARY

পুরীধামে বারো বছর অন্তর অন্তর নিমকাঠে তৈরী জগন্নাথ মূর্তি যখন নতুন করে গড়া হয় তখন একজন অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চোখ বাঁধা অবস্থায় পুরনো মূর্তির থেকে রেশমের কাপড়ে মোড়া কোন বস্তু নতুন মূর্তিতে স্থানান্তর করেন। অনেকের ধারণা এই বস্তু বুদ্ধের কোন প্রাচীন স্মারক। মূর্তি তিনটি প্রকৃতপক্ষে তিনখণ্ড কাঠ, কোন রূপায়িত প্রতিমা নয়। ওড়িয়া ধর্মীয় সাহিত্যে প্রায়ই জগন্নাথ মূর্তিকে 'শূন্য' এবং 'অলেখ' (অর্থাৎ অরূপ) বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২০৪] স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডের একটি কাহিনীর বিবরণে পুরুষোত্তমদেব জগন্নাথকে আদিম শবরজাতীয় মানুষের দেবতা বলা আছে।[২০৫] কথিত আছে, ওড়িশার পূর্ব উপকূলে এক নিবিড় অরণ্যে শবর বিশ্ববসুর দেবতা 'নীলমাধব' বিগ্রহের সন্ধানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিকে পাঠিয়েছিলেন। শবর বিশ্ববসু তখন ব্রাহ্মণ সন্তান সুদর্শন বিদ্যাপতির সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দেন। অতঃপর কিছুদিন পর দৈববাণী অনুযায়ী ইন্দ্রদ্যুম্ন নিকটেই একটি নদীর মুখে গাছের গুঁড়ি বিগ্রহরূপে দেখা দেবে জেনে সৈন্যসামন্তদের নদীর মুখে পাঠায়। কিন্তু সবাই তুলতে ব্যর্থ হলে দৈববাণী অনুযায়ী সেই গুঁড়ি তুলে আনেন শবর বিশ্ববসু এবং ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি। অতঃপর কাঠ থেকে মূর্তি গড়ার জন্য এক বৃদ্ধ ছুতোর নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ছুতোরের শর্তানুযায়ী মূর্তিগড়া শেষ না হতেই দরজা খুলে ফেললে অসমাপ্ত মূর্তি রেখে ছুতোর অন্তর্হিত হলে সেই মূর্তিই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। অবশ্য মূর্তি ছিল তিনটি—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার। তখনই জগন্নাথদেবের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা হয় যে শবর বিশ্ববসুর বংশধররাই মন্দিরের প্রধান পূজারী হবেন, বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সন্তানের বংশধরেরা মন্দিরের পুরোহিত হবেন আর বিদ্যাপতির শবর স্ত্রীর সন্তানের বংশধরেরা হবে মন্দিরের পাচক।[২০৬] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের তিনস্তরের সেবকেরা এই তিন বংশধারার মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দেন।[২০৭] শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত মতামত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে হিন্দু-বৌদ্ধভাবনার সামঞ্জস্য হল 'অনার্য ঐতিহ্যের জগন্নাথ, আর্য ঐতিহ্যের বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এবং বুদ্ধ জগন্নাথদেবে সম্মিলিত', যার ফলে সমস্ত জনস্তরে জগন্নাথ সাধারণ দেবতার মর্যাদা পায়।[২০৮] এই দিক থেকে বলা যায় যে জগন্নাথদেব ওড়িশার সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রতিভূবিশেষ। মূল শবর দেবতাকে হিন্দু অথবা বৌদ্ধ কারা প্রথম গ্রহণ করেছিলন নিশ্চিতভাবে তা বলা হয়তো সম্ভব নয়। প্রচলিত কাহিনীগুলিতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দেবতাকে নিজের করে নেবার প্রতিযোগিতায় এবং শেষ পর্যন্ত আপসে পৌঁছবার আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের জনপ্রিয় ওড়িয়া কবি বিপ্র নীলাম্বর রচিত 'দেউল তোলা-সুয়াঙ্গ' কাব্যের গল্পে এই সমন্বয়ের কথাই বলা আছে।[২০৯] গঙ্গ-সম্রাট অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের প্রপৌত্র ৩য় অনঙ্গভীমই (আ ১২১১-৩৯ খৃ.) জগন্নাথকে সর্বভারতীয় হিন্দু দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।[২১০] পুনরায় মহামহোপাধ্যায় ওড়িশায় স্থিতিশীল বৌদ্ধধর্মের কথা বলতে গিয়ে ওড়িশার গড়জাত মহলের 'মহিমাধর্ম' নামে এক নতুন ধর্মের কথা বলেছেন।[২১১] বাবু নগেন্দ্রনাথ ব[illegible] মহিমা-ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বলে বর্ণনা করেছেন। পুরীর রাজা দিব্যসিংহের (১৮৭৫ অব্দ) সময়কালে 'মহিমাধর্ম' প্রচলিত ছিল।[২১২] এ ধর্মে ভিক্ষায় জীবিকা, জাতিভেদ নেই, সন্ন্যাসীর ধর্ম এবং এ ধর্মেও অলেখ পুরুষ বা 'শূন্যপুরুষে'র পূজা আছে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অনেকাংশে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। Eliot সাহেব এটিকে ময়ূরভঞ্জ জেলার গজাৎ নামক স্থানের 'বাথুরি' বা 'বাউরি' উপজাতির ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন যারা 'গুপ্ত বৌদ্ধ' ছিল বলা যায়।[২১৩] এ ধর্মের প্রধান গুরু ছিলেন ভীমভোই।[২১৪] ভীমভোই তার অনুগামীদের নিয়ে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পুরীর মন্দিরে লুক্কায়িত বুদ্ধমূর্তি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজার বাধাদানে সেটা সম্ভবপর হয়নি। তারপর থেকে তারা গভীর জঙ্গলে বসবাস করতে থাকে।[২১৫] শতাব্দীকাল আগের আদমসুমারি অনুযায়ী

তাদের সংখ্যা ছিল ২৫,০০০ এর কাছাকাছি।[২১৬] তারা 'কুম্ভিপটিয়া' নামেও পরিচিত ছিল।[২১৭] এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে 'যশোমতীমালিকা' নামে একটি গ্রন্থে এই মহিমাধর্মের ইতিহাস বর্ণিত আছে।[২১৮] সেখানে দেখা যায় যে 'বিনয়পিটকে' বর্ণিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়মকানুনের সঙ্গে এদের নিয়মকানুনের বহুলাংশে সাদৃশ রয়েছে।[২১৯] আবার শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে পাঁচজন বৈষ্ণব দার্শনিক কবির নাম পাওয়া যায়,[২২০] তাদের মধ্যে অচ্যুতানন্দ দাসের রচনায় 'শূন্য ও অলেখের' উপাসনার কথাই বলা আছে। অচ্যুতানন্দের মতাদর্শে বৌদ্ধ প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, বস্তুতঃ দুশতাব্দী পরে ওড়িশায় মহিমাধর্মের যে অভ্যুদয় হয়েছিল তার সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে আধুনিক গবেষকরা এই মহিমাধর্মের পূর্বসূত্র নির্দেশ করেন অচ্যুতানন্দের রচনায়।[২২১] লামা তারনাথ যখন ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের অবস্থার কথা জানার জন্য প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন তখন উড়িষ্যার শেষ বৌদ্ধরাজা ছিলেন মুকুন্দদেব।[২২২] সুতরাং অনুমেয় যে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ওড়িশায় বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান ছিল।[২২৩]

এই হল ওড়িশার স্থিতিশীল বৌদ্ধধর্মের কথা। দক্ষিণাত্যের বিভিন্ন গ্রন্থেও বৌদ্ধদের কথা বলা আছে। যদিও সেখানে বৌদ্ধরা 'পাষণ্ডিণঃ' বলে উল্লিখিত।[২২৪] যেমন—কবিকর্ণপূর তাঁর 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকে দাক্ষিণাত্যে 'প্রচুরতমাঃ পাষণ্ডিণঃ' বলেছেন বৌদ্ধদের উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ প্রসঙ্গে চেন্নাই-এর উত্তর-পশ্চিমে তিরূপতি পর্বতে এবং ভেঙ্কটগিরিতেও বৌদ্ধদের অবস্থানের কথা বলা আছে 'পাষণ্ডীগণ' বলে উল্লেখ করে।[২২৫] এছাড়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের বৌদ্ধধর্মের স্থিতির প্রসঙ্গে বলেছেন যে নেপালের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অন্য কোন দেশের বৌদ্ধধর্মের মিল নেই।[২২৬] তিনি বহুবার নেপালে গিয়ে প্রচুর তালপাতার ও কাগজের পুঁথি পরীক্ষা করবার পরেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।[২২৭] সেখানে সংস্কৃত হল বৌদ্ধধর্মের মূলভাষা। উল্লেখ্য যে বৌদ্ধধর্ম নানা দেশে নানারূপ ধারণ করেছে, কোথাও বা এটি পূর্বপুরুষের উপাসনার সঙ্গে মিশে গেছে, কোথাও বা ভূতপ্রেত, কোথাও বা দেহতত্ত্ব উপাসনার সঙ্গে মিশে গেছে। আবার কোথাও কোথাও খাঁটি বুদ্ধের মতানুসারে চলছে।

এবারের প্রসঙ্গ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের কথা। এটি বলতে গিয়ে শাস্ত্রীমহাশয় 'ধর্মঠাকুরের' পূজার উল্লেখ করেছেন। তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে 'ধর্মঠাকুরের' কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা 'শ্রীধর্মমঙ্গল'[২২৮] পড়ে মনে হয়েছিল যে ধর্মপূজাই হয়তো বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থা।[২২৯] ধর্মঠাকুর হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ওপরে, তার পুরোহিত হল ডোম-পোদ-বাগ্দীজাতীয় মানুষ। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের বিশেষ সম্বন্ধ নেই। ধর্মঠাকুরের অনুসন্ধানে শ্রীশাস্ত্রী বিভিন্ন ধর্মঠাকুরের মন্দির পরিদর্শন করেছিলেন যেমন—পাটুলির কাছে সুঁয়াগাছি গ্রামে, মুক্সিপাড়ার কাছে জামালপুরে, কোলকাতার জানবাজারে, উত্তর কোলকাতার বলরাম দে স্ট্রীটে।[২৩০] বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত 'শলপ' নামক স্থানে গিয়ে দেখা যায় যে ধর্মের মন্দিরে ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে। এ বিষয়ে শাস্ত্রীমহাশয় ব্যাখ্যা করেছেন যে মুসলমান ও ব্রাহ্মণদের সমবেত নির্যাতনে বৌদ্ধরা ক্রমশঃ কোনঠাসা হয়ে শীল, বিনয়, দর্শন ইত্যাদি ভুলতে থাকেন। তখন শুধু জনাকয়েক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুনামধারী বিবাহিত পুরোহিত থেকে যায়। তারা তখন নিজের মত করে বৌদ্ধধর্ম গড়ে তুলে কূর্মরূপী এক ধর্মঠাকুর বার করে। কূর্মরূপ হল স্তূপের আকার। কূর্মের যেমন চারটি পা ও গলা—এই পাঁচটি অঙ্গ থাকে, স্তূপেরও তেমনি পাঁচটি অঙ্গ থাকতো। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম চারদিকেই চারজন ধ্যানীবুদ্ধ ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর একজন ধ্যানীবুদ্ধ থাকতো—এইভাবে স্তূপটি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের আবাসস্থল হয়ে সাক্ষাৎ ধর্মের মূর্তি বলে পরিগণিত হত। সুতরাং কূর্মরূপী ও স্তূপরূপী

ধর্ম একই। ধর্মঠাকুরের কাছে লোকেরা ফললাভের আশায় মানত করত। ধর্মঠাকুর প্রধানতঃ পেটের রোগের ওষুধ দিতেন। ধর্মঠাকুরের প্রবর্তন পালরাজা ধর্মপালদেবের সময়ে একদশ শতাব্দীতেই।[২৩১] রমাই বা রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রথম প্রবর্তক ও ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিতরূপে স্বীকৃত,[২৩২] যদিও তিনি সত্যি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। রামাই পণ্ডিত 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছিলেন যার মূলতত্ত্ব হল 'শূন্যতা' এবং 'শূন্যবাদ' যা বৌদ্ধ মহাযান মাধ্যমিক দর্শনের প্রধান বিষয়বস্তু। এবিষয়ে শূন্যপুরাণের একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যায়—

শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্ননাশনম্
সর্ব্বপরঃ পরো দেব তস্মাত্ত্বং বরদা ভব।।[২৩৩]

অনুবাদ—

'যার রূপ নেই, আকার নেই, যিনি সহস্রবিঘ্ন নাশ করেন
যিনি সর্বোপরি, যিনি দেবতার দেবতা, তিনি আমাদের বর দান করুন।'

ধর্মঠাকুরের নাম আদ্য, তিনি শূন্য থেকে সৃষ্টি করেন। রামাই পণ্ডিতের পাশাপাশি ময়নাগড়ের রাজা লাউসেনের নামও পাওয়া যায়। ইনিও ধর্মঠাকুরের উপাসক ছিলেন। সংস্কৃতে রচিত বিভিন্ন ধর্মঠাকুরের পূজার ধ্যান আছে, যেমন—

যস্যান্তো নাদিম ধ্যোন চ করচরণৌ নাস্তি কায়োনির্নাদং
নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মনি যস্য
যোগীন্দ্রৈর্জ্ঞানগম্যং সকলদল গতং সর্ব্বলোকৈকনাথং।।
ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরন্দং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিম্।।[২৩৪]

অনুবাদ —

যাঁর অন্ত, নেই, আদি নেই, মধ্য নেই, হাত পা নেই, দেহ নেই, শব্দ নেই, আকৃতি নেই, রূপ নেই, ভয় নেই, মরণ নেই, যাঁর জন্ম নেই, যোগীন্দ্রদের ধ্যানে যিনি জ্ঞাত হন, সকল মানুষের মধ্যে যিনি আছেন, সকল লোকের যিনি একমাত্র প্রভু, ভক্তদের কামপূরক, মানুষকে এবং দেবতাকে যিনি বর দিয়ে থাকেন—সেই শূন্যমূর্ত্তিকে চিন্তা করবে। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে' দেখা যায় যে ধর্মঠাকুর সিংহলেও সসম্মানে পূজিত হতেন। যথা—

'শ্রীধর্ম্মদেবতাসিংহলে বহুত সম্মান'।[২৩৫]

শাস্ত্রী মহাশয় একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে সম্ভবতঃ পালরাজত্বের সময় আদিম কোন পূজাপদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণের ফলে ধর্মপূজার উদ্ভব হয়েছিল এবং এটি লৌকিক প্রবণতার অনুকূল হবার জন্য এখনোও এটি টিকে আছে।[২৩৬]

যাই হোক্, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপরোক্ত মতবাদ নিয়ে কিন্তু পক্ষে এবং বিপক্ষে বিদ্বৎজনেরা নানান মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রী ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সকলেই শাস্ত্রী মহাশয়ের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[২৩৭] Sir Charles Eliotও ধর্মঠাকুরের পূজা প্রসঙ্গে বলেছেন যে বৌদ্ধধর্ম ধর্মরাজা বা ধর্মঠাকুরের আরাধনার মধ্যে অস্তিত্বশীল ছিল এবং এটা পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলাতেও বিদ্যমান ছিল, যদিও অধঃপতিত ও মর্যাদাচ্যুত হয়ে।[২৩৮] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন যে ধর্মঠাকুরের উপাসকের সংখ্যা কয়েক কোটি[২৩৯] এবং শ্রীলংকাতেও ধর্মঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় এবং সেখানে ধর্মঠাকুর 'শূন্যমূর্তি' বলে পরিচিত।[২৪০]

ডঃ সুকুমার সেন কিন্তু ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ প্রভাবজাত বলে মনে করেন না।[২৪১] পণ্ডিত নলিনীনাথ দাসগুপ্তও ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গে শূন্যপুরাণ ও বাংলা ধর্মমঙ্গল সাহিত্য দেখে পশ্চিমবাংলার

এবং ওড়িশার কোন কোন স্থানে ধর্মঠাকুরের পূজা যে বৌদ্ধধর্মের বিকৃত রূপান্তরমাত্র—এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[২৪২] তাঁর মতে, কূর্মমাহাত্ম্যের কূর্মদেব শুধু ব্রাহ্মণ্য উপনিষদের ও পুরাণগুলোর সঙ্গেই নয়, প্রাচীন অনেক জাতিরই ধর্মতত্ত্বের আদিম কল্পনার সঙ্গে তিনি জড়িত আছেন। তিনি বলেছেন যে ধর্মঠাকুরের উৎপত্তির তত্ত্বে বৌদ্ধধর্ম থেকে না দেখে একেবারে উপনিষদ থেকে দেখা দরকার।[২৪৩] যাইহোক, বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলেও অনেক বৌদ্ধ আছেন। দার্জিলিং শিলিগুড়ি, নেপাল, চিটাগাং ও ত্রিপুরা পাহাড়েও বৌদ্ধদের বসতি দেখা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে একমাত্র নেপালের বৌদ্ধরাই সেকালের ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারী। সিকিম ও দার্জিলিং-এ বৌদ্ধদের ওপর তিব্বতীদের প্রভাব বিস্তার হয়েছিল বলা যায়। অন্যদিকে, চিটাগাং-এর বৌদ্ধধর্ম আরাকান হয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) ও সিংহল (শ্রীলংকা) থেকে এসেছে। যদিও সেখানকার বৌদ্ধধর্মে কিছু কিছু ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদের আচার ব্যবহারের ছায়া রয়েছে।[২৪৪] এ সম্পর্কে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে গত ২৬শে জানুয়ারী, ২০০৪ এর 'Statesman'এ একটি সংবাদ আছে যে কলকাতার দক্ষিণে বাঘাযতীন ও রাণীকুঠীর মধ্যবর্তী জায়গায় 'বারো ভূতের মেলা' হয়। সেখানে বিষ্ণুর দশমাবতারের সঙ্গে বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবেরও অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে পূজা হয়। পূজোটি বাংলাদেশের ঢাকার রোহিতপুরজেলার পূজো এবং এটি নাকি দুশো বছরেরও বেশি সময় আগেকার। এটি একটি রূপক অনুষ্ঠান।

পরিশেষে বলা যায় যে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় বৌদ্ধধর্মের উদয়-বিকাশ ও বিলয়ের ইতিহাস গঠনের উপাদানসংগ্রহে অমানুষিক শ্রম ও মেধাশক্তি ব্যয় করে তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি আরও মনে করতেন যে বাংলাদেশ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। হিন্দুসমাজে যারা ঠাঁই পেলেন তাদের বেশির ভাগ হিন্দুসমাজে মর্যাদায় হীন এবং নিম্নবর্গের মানুষ হয়ে রইলেন। এদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের জের রয়ে গেল।[২৪৫] তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে "আমরা বাঙালী ব্রাহ্মণেরা এখন অর্ধ-হিন্দু, অর্ধ-বৌদ্ধ। যখন আমরা সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন গুরু আমাদের কানে ফুঁ দিয়া যান, আর আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ।"[২৪৬]

যাই হোক, বলা যায় যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সারাজীবন ধরে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অনুশীলন করে গেছেন বৌদ্ধবিদ্যার। তিনি বৌদ্ধবিদ্যার গুরুত্ব বুঝে আদি ও মূল বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী বিকাশ ও বিবর্তনের স্তরগুলি নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করেছেন। শুধু তাই নয়, সবশেষে বিলয়ের পাশাপাশি যে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব থেকে গেছে সে সম্পর্কেও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। শাস্ত্রীমহাশয় বৌদ্ধ উপাদানগুলি নিয়ে এত বেশী চর্চা করতেন বলে তাকে বিদ্বৎসমাজের কাছে 'বৌদ্ধবাতিকগ্রস্ত' বলে বিদ্রূপ শুনতে হতো। তাঁর দেওয়া বৌদ্ধধর্মের পতন সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে পণ্ডিতমহলে কোন দ্বিমত নেই বলা যায়। দেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের জন্য তাঁর গোঁড়ামিমুক্ত ঐতিহাসিক তথ্যগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান এবং সেগুলি উত্তরসূরীদের কাছে একটি প্রেরণাবিশেষ।

সূত্র :

১। হালদার (দে) মণিকুন্তলা, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, (কলকাতা, ১৯৯৫) পৃ. ২৯৮-৯৯।

২। মিত্র রমেশচন্দ্র, Decline of Buddhism in India (Shantiniketan, 1949) p. 1.

৩। Watters, Thomas—'On Yuan Chwang : travels in India'; Vol. I, (London, 1905) p. 225ff.

৪। Takakusu J.A. (tr.) A Record of the Buddhist Religion as practised in India and the Malay Archipelago (A.D. 671-695) by Itsing (London 1904) p. 67.

৫। Stein M.A. —Chronicles of the king of Kashmir Vols I & II (Westminister. 1900, Rep. 1961).

৬। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ—(tr) ed. Taranatha's History of Buddhism in India. (Simla. 1970)

৭। Obermiller E-(tr) Bu-ston's History of Buddhism. Vol. II (Heidelberg. 1931-32) p. 11.

৮। ৭ম শতাব্দী, অত্যাচারী 'তুরস্ক' বলে খ্যাত—রাজতরঙ্গিণী, ১ম, পৃ. ৮২৫।

৯। তদেব, ১ম পৃ. ৮২৫, Decline of Buddhism p.120.

১০। Decline of Buddhism p.120.

১১। Chavannes A 'Memoire-sur les Religieux Eminents' (Paris, 1894) p. 46.

১২। তদেব।

১৩। দ্রঃ রাজতরঙ্গিণী, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭১-১৭৩।

১৪। Decline op. cit p. 22.

১৫। তদেব।

১৬। তদেব।

১৭। তদেব পৃ. ২৬।

১৮। দ্রঃ আকবরের সভাকবি আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১২ তুলঃ Decline পৃ. ২৬; বৌ-ই পৃ. ৩০৩।

১৯। Decline p. 26।

২০। বৌ-ই পৃ. ৩০৩।

২১। দ্রঃ ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, 'Gilgit Manuscript' Vol. I p. 12; অধ্যাপক H. Kern, Manual of Indian Buddhism (Varanasi, Delhi, 1968) p. 117; Decline p. 28।

২২। হীনযান বা স্থবিরবাদী (থেরবাদী) ও মহাযানের তফাৎ জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ বৌ-ই পৃ. ২৪২ ইত্যাদি।

২৩। Decline p. 28; বৌ-ই পৃ. ৩০৪।

২৪। তদেব।

২৫। Takakusu p. 9.

২৬। গ্রন্থটি ১২১৬ খৃষ্টাব্দে পালীভাষায় অনূদিত হয়।

২৭। বৌ-ই পৃ. ৩০৬; Decline p. 35

২৮। দ্রঃ Decline p. 35

২৯। H.C. Roy, 'Dynastic History of Northern India Vol. I p. 24।

৩০। তদেব।

৩১। Nizamuddin কৃত (Bibliotheca Indica Series) p. 150.

৩২। বৌ-ই পৃঃ ৩০৮

৩৩। তদেব পৃঃ ৩০৭

৩৪। দাস, শরৎচন্দ্র 'Indian Pandits in the Land of Snow' (Calcutta, 1965).

৩৫। বৌ-ই পৃ. ৩০৮; Epigraphia Indica XIX p. 295.

৩৬। তদেব; তদেব XX p. 128.

৩৭। Decline p. 40.

৩৮। Encyclopaedia of Religion p. 380.

৩৯। তদেব।

৪০। Decline p. 46.

৪১। তদেব p. 48 ইনি Pag-Sam-Jon Zang এর উল্লেখ করে বলেছেন যে বহু বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার নির্মিত হয়েছিল মুসলমান আক্রমণের পরেও। Mediaeval School of Indian Logic p. 14.

৪২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (কলকাতা, ১৯৮৪), ৩য় খণ্ড পৃ. ২৬০।

৪৩। Watters II pp. 184, 189.

৪৪। Takakusu XXX.

৪৫। বৌ-ই পৃ. ৩১০

৪৬। তদেব।

৪৭। Beals (tr) Si-yu-ki Buddhist Records of the Western World Vol. II (London, 1883) p. 195.

৪৮। Indian Historical Quarterly Vol III p. 750 তুল : Decline পৃ. ৯০।

৪৯। History of Assam p. 26.

৫০। তুল : Decline p. 90.

৫১। দ্রঃ বৌ-ই পৃ. ৩১৭ : Journal of the Behar and Orissa Research Society XV p. 87-99.

৫২। তদেব।

৫৩। দ্রঃ পাগ-সাম-জোন-জাং (সং অভিনিষ্ক্রমণ সূত্র) ed. শরৎ চন্দ্র দাস (Calcutta, 1980).

৫৪। Decline p. 98.

৫৫। বৌ-ই পৃ. ৩১০।

৫৬। Decline p. 98.

৫৭। The Modern Buddhism—its Followers in Orissa (Calcutta 1911) p. 131.

৫৮। Hinduism and Buddhism Vol II (London, Rep. 1971). p. 114.

৫৯। Modern Buddhism p. 131.

৬০। Hinduism & Buddhism Vol. II. p. 114.

৬১। ......it contains a gigantic statue of the Buddha before which a wall has been built and also that the image of Jagannatha which is little more than a log of wood, is really a case enclosing a Buddhist relic—H&B II pp. 114-15; প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে সূর্যমন্দিরের গর্ভগৃহে একটা খণ্ডিত হস্ত কষ্টি পাথরের পর্যাঙ্কাসনে বসা বুদ্ধমূর্তি লেখিকা স্বয়ং দর্শন করেছেন যার অঙ্কের ওপর সূর্যমূর্তি বসানো আছে।

৬২। অচ্যুতানন্দ দাসের গ্রন্থের নাম হল 'শূন্যসংহিতা' ও চৈতন্যদাসের গ্রন্থ হল 'নির্গুণমাহাত্ম্য'।

৬৩। H&B II p. 115.

৬৪। তদেব।

৬৫। দ্রঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধ 'An account of Buddhism in Orissa'—'The Archaeological Survey of Mayurbhanj (1911) Vol. I. pp. clxxvi ff., ccxix-ccxxiii তুল: H&B II p. 115.

৬৬। রচনাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৭

৬৭। তদেব।

৬৮। Decline p. 99.

৬৯। রচনাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড পৃ. ৪১৭।

৭০। Decline p. 99; বৌ-ই পৃ. ৩১৮।

৭১। দ্র Imperial Gazetter of India Vol. xx p. 410.

৭২। H&B II p. 115.

৭৩। 'ধর্মগীতা' নামে একটা কাব্যের জন্য দ্রঃ H&B II p. 115, n.3.

৭৪। H&B II p. 115.

CENTRAL LIBRARY

৭৫। Religieux Eminents p. 46.

৭৬। Decline p. 103; বৌ-ই পৃ. ৩১৯।

৭৭। বৌ-ই পৃ. ৩১৯।

৭৮। Religienu Eminents p. 44.

৭৯। তদেব।

৮০। তদেব।

৮১। তুল : Decline p. 104.

৮২। বৌ-ই পৃ. ৩১৯-২০।

৮৩। দ্রঃ Journal Asiatique, 1934 p. 212.

৮৪। দ্রঃ Decline p. 104.

৮৫। Obermiller Vol. II p. 184.

৮৬। তুল : বৌ-ই পৃ. ৩২২; H&B II p. 207.

৮৭। মাধবের 'শঙ্করদিগ্বিজয়' তুল : Journal of the Royal Asiatic Society 1898 p. 208, H&B II p. 207; Decline p. 128.

৮৮। 'History of Kerala' Menon KP Padmanabha Vol I (New Delhi, 1983) p. 453, f.n. 1.

৮৯। Obermiller II p. 152;

৯০। Joshi Lalmoni 'Studies in the Buddhist Culture in India' (Dellhi, 1977 Rev. Ed.) p. 313.

৯১। এটি গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত রচনা। 'মীমাংসাদর্শনের' ভাষ্যকার শবরস্বামীর ভাষ্য অনুসরণ করে কুমারিল 'শ্লোকবার্তিক', 'তন্ত্রবার্তিক' ও 'টুপটীকা' গ্রন্থ তিনটি রচনা করেন। এটি পূর্বমীমাংসার টীকা গ্রন্থ।

৯২। History of Kerala Vol. II p. 72.

৯৩। তারনাথ পৃ. ২২৬।

৯৪। Levi Sylvain 'Le Nepal' Vol II (Paris, 1905-06) p. 96.

৯৫। শংকর, ১ম, পৃ. ৯৩।

৯৬। ব্রহ্মসূত্র-শংকরভাষ্য, ২য়, ২, ৩২।

৯৭। H&B II p. 211; 'বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম' ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত, কলকাতা, ১৯৭২। পৃ. ১৭৪; Buddhist Culture p. 313.

৯৮। 'নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্' গৌড়পাদ, ৪র্থ কারিকা, ৯৯; তুল : Radhakrishnan, Indian Philosophy II (Bombay, 10th impression, 1977) p. 423.

৯৯। Radhakrishnan pp. 423-24.

১০০। দ্রঃ Memoirs of Archaeological Survey of India Vol. XXVI p. 5.

১০১। Journal of the Mythic Society, 1918 p. 151.

১০২। তদেব।

১০৩। H&B II p. 211.

১০৪। উত্তর খণ্ড, ২৩৬ অধ্যায়।

১০৫। তদেব।

১০৬। Decline p. 130; বৌ-ই পৃ. ৩২৪।

১০৭। তদেব; তদেব।

১০৮। বৌদ্ধভারত পৃ. ২১৫ (কলিকাতা)।

১০৯। Decline p. 94.

১১০। রচনা সংগ্রহ পৃ. ৩৪২।

১১১। তদেব পৃ. ৩৭৪, বৌ-ই, পৃ. ৩৩৫।

১১২। তদেব।

১১৩। তদেব।

১১৪। রচনা সংগ্রহ পৃ. ৩৭৩।

১১৫। বৌদ্ধভারত পৃ. ২০৭।

১১৬। রচনা সংগ্রহ পৃ. ৩৭৩।

১১৭। তদেব পৃ. ৩৭৩।

১১৮। তদেব। চন্দেলরাজ কীর্তিবর্মার (রাজত্বকাল ১০৫০-১১১৬ খৃঃ) জন্য রচিত হয় এই রূপক নাটকটি।

১১৯। Buddhist Culture p. 309; বৌ-ই পৃ. ৩৩৬।

১২০। দ্রঃ বৌ-ই, পৃ. ৩৩৬।

১২১। তদেব।

১২২। Buddhist Culture p. 309.

১২৩। রচনা সংগ্রহ পৃ. ৩৭৬

১২৪। তদেব।

১২৫। ভট্টাচার্য বিনয়তোষ, ed. (Gaekawd Oriental Series, Baroda, 1968) pp. 26, 41.

১২৬। রচনাসংগ্রহ পৃ. ৩৭৬।

১২৭। তদেব।

১২৮। বৌদ্ধতন্ত্রের অন্যতম আদি শাস্ত্র। চীনাভাষায় অনূদিত হয়ে দশম শতকে ত্রিপিটকের তিব্বতী কাঞ্জুরের অন্তর্গত হয়। G.O.S. no. liii; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক রচনার অন্তর্গত Indian Historical Qarterly, March, 1933 তে M.Winternitz-এর প্রবন্ধ 'Notes on the Gūhyasamāja-Tantra and the Age of the Tantras, দ্রষ্টব্য।

১২৯। "অন্নং বা অথ বা পানং যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষয়েৎ ব্রতী।
বিন্মূত্রমাংসযোগেন বিধিবৎ পরিকল্পয়েৎ।।"
অর্থ—খাদ্যই হোক বা পেয়ই হোক অল্প মাত্রায় আহার করা উচিত ব্রতধারীর। বিষ্ঠা, মূত্র ও মাংস সহযোগে নিয়মমতো তা প্রস্তুত করবে। —তথাগতগুহ্যক।

১৩০। "দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ।
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ"।। —তদেব

১৩১। রচনা সংগ্রহ পৃ. ৩৭৮।

১৩২। তদেব।

১৩৩। বৌ-ই পৃ. ৩৩৬।

১৩৪। রচনা সংগ্রহ পৃ. ৩৭৯-৮০; বৌদ্ধভারত পৃঃ ২০৯।

১৩৫। তদেব পৃ. ৩৭৯-৮০; বৌ-ই পৃ. ৩৩৮।

১৩৬। তদেব পৃ. ৩৮০; বৌদ্ধভারত পৃ. ২০৯।

১৩৭। Decline p. 140.

১৩৮। Face of Lotus Sūtra, Bulletin de e'Ecole Francaise d' Extreme Orient Vol. V pp. 296-99; Catalogue of Nanjio p. 465 তুলা : Decline p. 140.

১৩৯। Winternitz M 'A History of Indian Literature' Vol II (New Delhi, Rep. 1977) p. 330ff, Decline p. 331; দ্রঃ Rāstrapālpariprcchā Sūtra du Mahāyāna, publié par L. Finot (Bibliotheca Buddhica II) St. Petersbeurg, 1901.

১৪০। দ্রঃ Obermiller Vol II p. 17ff.

১৪১। Decline p. 140.

১৪২। তদেব।

১৪৩। Takakusu-Itsing p. 195.

১৪৪। ৩য় অধ্যায়, ১২।

১৪৫। দ্রঃ Bulletin of the School of Oriental Studies (London) Vol V. pp. 697-717, তুলঃ Decline p. 14.

১৪৬। দ্রঃ Decline pp. 141-142.

১৪৭। তদেব পৃ. ১৪২।

১৪৮। তদেব পৃ. ১৪২।

১৪৯। তদেব।

১৫০। তুল ঃ তদেব।

১৫১। De. S.K. 'History of Sanskrit Literature Vol-I. pp. 409. 496-97.

১৫২। তদেব।

১৫৩। Das S.C. 'Life of Atisa' in Journal of the Asiatic Society of Bengal. 189, p. 51ff তুলঃ Decline p. 143.

১৫৪। রচনাসংগ্রহ পৃ. ৩৮০; বৌদ্ধভারত পৃ. ২০৯।

১৫৫। তদেব, পৃ. ৩৮১; তদেব পৃ. ২১১।

১৫৬। তুলঃ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম পৃ. ১৭২; বৌ-ই পৃ. ৩২৯।

১৫৭। রচনাসংগ্রহ পৃ. ৩৮১।

১৫৮। মৌলনা মিন্‌হাজুদ্দিন আবু উমর-ই-উস্‌মান্ রচিত ইতিহাস গ্রন্থ 'তবকৎ-ই-নাসিরি'তে ওদন্তপুরী মহাবিহারটির ধ্বংসের বিবরণ পাওয়া যায়। ওদন্তপুরী মহাবিহার তৎকালীন বিহারশরীফে অবস্থিত ছিল। মহাবিহারটি সুবিখ্যাত পালরাজা ধর্মপালের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। আনুমানিক ১১৯৩ অব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজি এই বিহারের সমস্ত ভিক্ষুদের হত্যা করেন এবং মূর্তিগুলি ধ্বংস করে বিহারটি তাঁর সৈন্য শিবিরে পরিণত করেন। দ্রঃ রচনা সংগ্রহ পৃ. ২৫৩-৫৪।

১৫৯। বিক্রমশীলা মহাবিহারটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন পালরাজা ধর্মপালদেব (আঃ ৭৭০/৭৭৫-৮১০ অব্দ)। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও বর্হিভারত থেকে বহু ছাত্র এখানে পড়তে আসতো। (Mitra Debela, 'Buddhist Monuments', Calcutta, 1971 p. 57) Majumdar, R.C. (ed.) 'The History of Bengal' Vol. I (Dacca, 1963) pp. 116-25. বিহাররাজ্যের রাজগীর থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে বরগাঁওয়ে নালন্দা মহাবিহারটি অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চমশতকে গুপ্তরাজাদের সময়ে নালন্দার সমৃদ্ধির সূচনা হয়। কথিত আছে এখানে দশ হাজার ছাত্র বসবাস করতো। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ স্বয়ং নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে পড়াশুনা করতেন। তাঁর মতে ভারতে তখন হাজার হাজার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল কিন্তু শিক্ষনীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য, শিক্ষাপদ্ধতির উৎকর্ষে এবং বিরাটত্বে নালন্দার স্থান ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। (R.C. Majumdar 'Ancient India', Delhi, 1974 pp. 452-54, Buddhist Monuments pp. 85-89). পালরাজা রামপালের রাজত্বকালে (আঃ দ্বাদশ শতাব্দী) বরেন্দ্রভূমিতে জগদ্দল বিহার স্থাপিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে গঙ্গা-করতোয়া নদীর সঙ্গমস্থলে রামপালের রাজধানী রামাবতীতেই জগদ্দল বিহারের অবস্থান ছিল। History of Bengal I p. 418.

১৬০। রচনাসংগ্রহ পৃ. ৩৮১।

১৬১। তদেব।

১৬২। তদেব পৃঃ ৩৮২।

১৬৩। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম পৃ. ১৭৩; বর্তমান যুগের এক অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধদেবের 'দুঃখবাদ' তত্ত্বটির সমালোচনা করে বলেছেন যে এই মতাদর্শটি সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কোলকাতা দূরদর্শন, জানুয়ারী, ২০০৪-এ 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে প্রচারিত।

১৬৪। তদেব।

১৬৫। বৌ-ই পৃ. ৩৪১।

১৬৬। তদেব পৃঃ ৩২৫।

১৬৭। তদেব পৃ. ৫৪০।

১৬৮। Radhakrishnan, II p. 464; Buddhist Culture p. 316; বৌ-ই পৃ. ৩৪১।

১৬৯। Buddhist Culture p. 316.

১৭০। তারনাথ পৃ. ২৬১ ইত্যাদি।

১৭১। দ্রঃ বৌ-ই পৃ. ৩৪৪।

১৭২। Buddhist Culture p. 318.

১৭৩। তদেব পৃ. ২১৫।

১৭৪। বৌদ্ধভারত পৃ. ২১৫।

১৭৫। রচনা সংগ্রহ পৃ. ৩৮১; রাজত্বকাল আঃ ১১৫৯-৭৯ অব্দ।

১৭৬। তদেব।

১৭৭। তদেব।

১৭৮। Buddhist Culture p. 323; বৌ-ই পৃ. ৩৪৫।

১৭৯। তদেব; তদেব।

১৮০। তদেব; তদেব।

১৮১। Decline p. 143.

১৮২। রচনা সংগ্রহ; প্রবন্ধ—'বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল?' (পৃ. ৩৯১-৩৯৭), 'এখনো একটু আছে' (পৃ. ৪০৩-৪১৩), 'উড়িষ্যার জঙ্গলে' (পৃ. ৪১৭-৪২৬) ও 'বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম' (পৃ. ৪৮০-৪৯৪)।

১৮৩। তদেব পৃ. ৪১৭।

১৮৪। Vasu Nagendra Nath 'The Modern Buddhism with its followers in Orissa' (Calcutta, 1911) p. 27.

১৮৫। তদেব।

১৮৬। তদেব।

১৮৭। Risley H.H.'র প্রবন্ধ 'The Tribes and Castes of Bengal' Ethnographic Glossary Vol. II, Calcutta, 1891.

উল্লেখ্য যে শ্রীশরৎ কুমার রায় উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশের বীরভূম জেলার রামপুরহাটের নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে যথা—খরবোনা, বলেরপুর গ্রাম, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সাদিপুর, শিলাগুড়ি, জয়তারা, বাঁশফুলি, বিলকান্দি ও হাড়জুড়িতে হন্দ, রক্ষিত, দত্ত, প্রামাণিক, সিংহ, দাস ইত্যাদি উপাধিযুক্ত শরাকজাতীয় রসবাসকারীরা আগে বৌদ্ধ ছিল। এরা মাছ মাংস খায় না, সুরাপানও করে না। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে—"ইহারা পূর্বে বৌদ্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।" বৌদ্ধভারত পৃ. ২১৮।

১৮৮। H&B II পৃ. ১১৪-১৫.

১৮৯। তদেব।

১৯০। তদেব।

১৯১। তদেব; বৌদ্ধভারত পৃ. ২১৫।

১৯২। Census of India 1901, Vol VI Bengal pp. 427-430.

১৯৩। Gait, E A Census of India, 1911 Vol. I Part II Tables p. 222.

১৯৪। রচনা সংগ্রহ পৃ. ৩৯৭

১৯৫। "আমি শ্রদ্ধাসহ নবম অবতার শ্রী বুদ্ধকে বন্দনা জানাই যিনি বুদ্ধরূপে নীলচলে (অর্থাৎ পুরীতে) বিরাজ করছেন।" দ্রঃ Modern Buddhism p. 131.

১৯৬। H&B Vol II p. 114ff.

১৯৭। বৌদ্ধভারত পৃ. ২১৮।

১৯৮। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম পৃ. ১০৬-(কলিকাতা)।

১৯৯। দ্রঃ 'Orissa and Her Remains', pp. 400-406.

২০০। তুলঃ বাংলায় বৌদ্ধধর্ম পৃ. ১০৬।

২০১। তদেব পৃ. ১০৬।

২০২। তদেব পৃ. ১০৬-১০৭; রচনাসংগ্রহ পৃ. ৪২০।

২০৩। রচনা সংগ্রহ পৃ. ৪৩২।

২০৪। তদেব পৃ. ৪৩৩।

২০৫। তদেব।

২০৬। তদেব পৃ. ৪৩২।

২০৭। তদেব।

২০৮। তদেব পৃ. ৪৩২-৩৩।

২০৯। তদেব পৃ. ৪৩৩।

২১০। রচনাসংগ্রহ পৃ. ৪৩২।

২১১। তদেব।

২১২। Modern Buddhism p. 161.

২১৩। H&B II pp. 115-16.

২১৪। তদেব p. 116; রচনাসংগ্রহ পৃ. ৪৩৬-৩৭, ভীমভোই-এর জন্ম ১৮৫২ অব্দে ঢেঙ্কানলের জুরন্দা গ্রামে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত 'কুই' ভাষাভাষী কন্ধ উপজাতির কোন পরিবারে। মহিমা গোঁসাইএর সংস্পর্শে এসে ভীমভোই-এর অধ্যাত্মিক জীবন ও কবিজীবনের সূচনা হয়। জাতপাতবিরোধী, মূর্ত্তিপূজা বিরোধী ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি জীবনে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন। ভীমভোই-এর অনেক ভজন ও পদাবলী আছে। ক্রমে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ভীমভোই-এর গানের 'অলেখ ধর্ম' যে মূলতঃ মহাযান বৌদ্ধধর্মেরই সারবস্তু এবিষয়ে খুব একটা মতভেদ নেই।

২১৫। তদেব।

২১৬। The 'Archaeological Survey of Mayurbhanj', 1911 Vol. I pp. ccxxxivff তুলঃ H&B II pp. 115-16.

২১৭। এরা 'কুম্ভ' নামক গাছের বাকল পড়ত বলে 'কুম্ভপটিয়া' দ্রঃ রচনাসংগ্রহ পৃ. ৪২২।

২১৮। তুলঃ রচনাসংগ্রহ পৃ. ৪২৪।

২১৯। তদেব

২২০। যথা—অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্তদাস ও যশোবন্ত দাস দ্রঃ তদেব পৃ. ৪৩৩, Modern Buddhism p. 35.

২২১। রচনাসংগ্রহ পৃ. ৪৩৬।

২২২। মুকুন্দদেব দক্ষিণভারত থেকে এসে ওড়িশা দখল করেন সেইজন্য তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব বলে বর্ণিত।

২২৩। মুখবন্ধ—Modern Buddhism.

২২৪। তুলঃ বাংলায় বৌদ্ধধর্ম পৃ. ১০৬-১০৭।

২২৫। তদেব।

২২৬। রচনাসংগ্রহ ভূমিকা, পৃ ৩০।

২২৭। দ্রঃ Notes on Palm-leaf Manuscripts in the Library of H.E. The Maharaja of Nepal. (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 189, LXV-I); Catalogue of Palm-leaf Mss., belonging to the Durbar Library, Nepal, Vol-I, 1905 এবং Vol-II, 1915.

২২৮। যোগেশচন্দ্র বসু প্রকাশিত, বঙ্গবাসী প্রেস, কোলকাতা, ১৭১০।

২২৯। রচনাসংগ্রহ পৃ. ৪০৪।

২৩০। তদেব।

২৩১। Modern Buddhism p. 100.

২৩২। রচনাসংগ্রহ পৃ. ২৩১ টীকা নং ৯; দ্রঃ বাবু নগেন্দ্র নাথ বসুর সম্পাদনায় 'শূন্যপুরাণ' (কলকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ); ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ধর্মপূজাবিধান' (কলকাতা ১৩২৩ বঙ্গাব্দ); Modern Buddhism p. 10.

২৩৩। দ্র Modern Buddhism p. 12.

২৩৪। তদেব।

২৩৫। তদেব।

২৩৬। রচনাসংগ্রহ পৃ. ২৩১ পাদটীকা ৭।

২৩৭। তদেব পৃ. ২২২-২৪।

২৩৮। H&B II.

২৩৯। রচনাসংগ্রহ পৃ. ২১৪।

২৪০। তদেব।

২৪১। তদেব ২২২-২৪, দ্রঃ B.C. Law Commemoration Volume, Part I, Calcutta on 'Is the cult of Dharma a living relic of Buddhism?'; সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল, সুনন্দা সেন সম্পাদিত 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল', ১ম খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

২৪২। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম পৃ. ১০৩-১০৪।

২৪৩। তদেব পৃ. ১০৪; 'ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ না অবৌদ্ধ' এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal VIII, 1942 শশীভূষণ দাশগুপ্তর প্রবন্ধ পৃ. ২৯৭ ইত্যাদি; K.P. Chattopadhyay-র প্রবন্ধ পৃ. ৯৯ ইত্যাদি।

২৪৪। রচনাসংগ্রহ পৃ. ৬০৩।

২৪৫। তদেব।

২৪৬। তদেব।

हरप्रसादशास्त्री : कुमारसम्भवव्याख्यानम्

श्रीसीतानाथ आचार्य शास्त्री

कवयितृगणमध्ये भारतीस्नेहधन्ये
जयति स कविराजः कालिदासो वरिष्ठः।
विमलधवलकीर्त्या प्राच्यपाश्चात्यभूमौ
सहृदयहृदयान्ते यश्चिरं दीप्यमानः॥

काले काले नवनवतमां द्योतनां द्योतयन्ती
रम्या वाणी सरसमधुरा कालिदासस्य हृद्या।
काव्यज्ञानां हृदयकमलं काममुद्भासयन्ती
मर्तेऽमर्त्यां श्रियमतितरां राजते संसृजन्ती॥

कालिदासीयकाव्यानां मर्मज्ज्ञेषु महत्तमः।
हरप्रसादशास्त्रीति नाम्ना कालेऽधुनातने॥
व्याख्यतवान् प्रबन्धैः स्वैः विविधैः पेशलं बुधः।
उत्तमं काव्यसौन्दर्यमलौकिकसुखास्पदम्॥

तदीयां दृष्टिमाश्रित्य कुमारसम्भवाश्रयाम्।
समीक्षां किञ्चिदाधातुं यत्नोऽस्माभिर्विधीयते॥
शास्त्रिहरप्रसादस्य समीक्षोक्ते विचारणैः।
सपर्यां संविधातुञ्च तस्योद्युक्ता वयं मुदा॥
धार्मिकैः शास्त्रतत्त्वज्ञै गङ्गादेव्याः प्रपूजनम्।
गाङ्गैरेव जलैस्तावत् क्रियत इति दृश्यते॥

ऊनविंशशताब्द्यां वङ्गसांस्कृतिकगगने समुद्यत्सु ज्योतिष्केष्वन्यतमस्तत्रभावान् हरप्रसादशास्त्रिमहाभागः। वैदुष्यप्रज्ञया सह साहित्यिकप्रतिभायाः सुसमञ्जसं सम्मेलनं तस्मिन् अभवत। भारतीयपुरातत्त्वविषये तस्यानुसन्धित्सापि सुतरामेव समुल्लेखार्हा। शास्त्रिमहोदयस्यास्य प्रतिभाया विकाशे परिपुष्टौ च राजेन्द्रलालमित्रस्य वङ्किमचन्द्रचट्टोपाध्यायस्य महदवदानमनस्वीकार्यम्। शास्त्रिमहोदयस्यास्य विविधमार्गावगाहिष्ववदानेषु द्योतमानेष्वपि अस्माभिरत्र निबन्धे साहित्यसमीक्षात्मिकायाः प्रतिभाया विशेषतः कालिदासकृतस्य कुमारसम्भवकाव्यस्य समीक्षाविधौ तदीयं दृष्टिवैशिष्ट्यमधिकृत्य किञ्चिदालोचयितुं यत्यते। शास्त्रिमहाभागेनानेन कालिदासस्य कविकर्मणां समीक्षणविषये त्रिंशदधिकसंख्यका महार्घाः प्रबन्धा विरचिताः। ते च प्रबन्धा यद्यपि प्राधान्येन कालिदासस्य

काव्यसौन्दर्यविश्लेषणं विषयीकुर्वन्ति तथापि कवेरस्य निवासस्थानाविर्भावकाल-रचनापौर्वापर्यादिकमपि न क्रोड़ीकुर्वन्तीति न।

पुरा कदा हन्त समान्तिमाप्तः
श्रीकालिदासस्य च कालसीमा।
तथापि तत्कालविनिर्णयार्थ-
मद्यापि कुर्वन्ति बुधा विवादम्॥[१]

अनया काव्यपंक्त्या कविसार्वभौमेन रवीन्द्रनाथेन भारतात्मनो महाकवेः कालिदासस्य आविर्भावसमयमधिकृत्य प्रवर्तमानाया विवादपरम्पराया वास्तवोचिता सूचना प्रदत्ता। खृष्टजन्मनः प्रथमशताब्दीतः खृष्टीयषष्ठशताब्दीं यावत् विस्तृतस्य सप्तशतसमयसीम्नो विविधे पर्याये कालिदासस्य स्थितिकालं सिद्धान्तयितुं विदुषां विविधा वाचोयुक्तयः प्रचरद्रूपाः परिलक्ष्यन्ते। अस्यां सूक्ष्मातिसूक्ष्मवैदुष्यविमण्डितायां विचारपरम्परायां हरप्रसादशास्त्रिमहाभागस्यावदानमपि विशेषतोऽवधानयोग्यम्। कालिदासस्य सम्भाव्यसमयसीमा ४०४-५३३ संख्याङ्कितखृष्टवर्षान्तःपातीति तस्याभिमतम्।[२] कालिदासस्य निवासस्थानमधिकृत्यापि नास्ति विश्रान्तिः विप्रतिपत्तिधारायाः। केचन विद्वांसस्तं कविवरं काश्मीरदेशसम्भवम् अन्ये तं वङ्गभूमिनिवासिनम् अपरे तं विदर्भदेशप्रभवं प्रतिपादयितुं यतन्ते। अस्यां विचारपरम्परायामपि शास्त्रिमहाभागस्य परिशीलिता विचारणा सुतरामेवावधारणीया। शास्त्रिमहाभागस्य समये कालिदासं वङ्गीयत्वेन प्रमाणयितुं महती प्रचेष्टा विदुषां मध्ये प्रबलासीत्। शास्त्रिणा तेन सङ्कीर्णं स्वाजात्याभिमानं तृणीकृत्य कालिदासकृतीनाम् आन्तरसाक्ष्यं भित्तीकृत्य कालिदासकृतिषु समाधिकपक्षपातस्य निदर्शनभूतानि स्थानानि स्वयमेव प्रत्यक्षीकृत्य एवं विनिर्णयो विहितो यत् कविरयं दशपुरनगर्य्याः तत्समीपवर्तिनि कस्मिंश्चित् स्थाने वा समजायत[३]यद्यपि बहवो दृश्यश्रव्यकाव्यनिबन्धाः कालिदासनाम्ना प्रचलन्ति तथापि रघुवंशं कुमारसम्भवमिति द्वे महाकाव्ये मेघदूतम् ऋतुसंहारमिति द्वे गीतिकाव्ये मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशकुन्तलमिति त्रीणि दृश्यकाव्यानि इति समुदायेन सप्त काव्यानि कालिदासेन रचितानीति विद्वद्भिरङ्गीक्रियते। परन्तु एतेषां रचनापारम्पर्य्यमधिकृत्य विपश्चितामैकमत्यं न सुकरम्।

अस्यामपि वितर्कितायां विचारधारायां शास्त्रिमहाभागस्यास्य विचारणायाः स्वातन्त्र्यं लक्षणीयम्। ऋतुसंहारं मालविकाग्निमित्रं मेघदूतं विक्रमोर्वशीयम् इति काव्यचतुष्टयस्य रचनायाः परं तेन कुमारसम्भवं नाम महाकाव्यं विनिर्मितम्। तदनन्तरं तेन अभिज्ञानशकुन्तलमिति नाटकं रघुवंशमिति महाकाव्यञ्च विरचिते। कविकृतीनां वर्णन-वाग्भङ्गी-चिन्तादिवैचित्र्यात्मकमान्तरं साक्ष्यं द्वारीकृत्य शास्त्रिमहाभागेन तासां पौर्वापर्यनिर्णये प्रयतितम्। तस्यायं प्रयत्नो न केवलं

CENTRAL LIBRARY

तस्यैतिहासिकप्रतिभां प्रमाणीकरोति परन्तु कालिदासीयकविमानसोपलब्धेः गभीरतां तथा विशुद्धां साहित्यसमीक्षात्मिकां भावयित्रीं प्रतिभामपि स्फुटं व्यनक्ति। शास्त्रिमहाभागस्य मते 'ऋतुसंहार'मेव कालिदासस्य प्रथमा कृतिः। अतोऽत्र तदीया रचनाशैली यथा पुनरुक्तिदोषदुष्टा तथा समभिव्यक्ता कवेरभिज्ञतापि सीमिता। शास्त्रिमहोदयस्य मते अत्रत्या वर्णना तदीयजन्मभूमेः दशपुरनगर्य्या ऋतुवैचित्र्यं वृक्षलतापुष्पादीनां सौन्दर्यमेव विषयीकरोति तस्या वहिः देशनगरीपर्वतादीनां सौन्दर्यसमाकलने कवे दृष्टिः प्राप्तप्रसरा न प्रतिभाति। श्रव्यकाव्यस्यास्य रचनायाः परं कविरयं दृश्यकाव्यरचनायाः कठिनतमे क्षेत्रे ससङ्कोचं प्राविशदिति तावदनुमातुं शक्यते मालविकाग्निमित्रस्य प्रस्तावनांशविमर्शनात्।[८] अत्रापि स्वदेशस्य मालवराज्यस्य गौरवमयेतिहासस्याध्यायविशेषो नाट्यरूपतां गतः। नायिकाया मालविकेति नामकरणमपि अत्रार्थे प्रमाणम्। इदमेकं देशानुरागमूलकं दृश्यकाव्यम् (patriotic drama)। इतः परं कालिदासस्य कविमानसं सहस्रपक्षो विहङ्गम इव कल्पनायाः समुच्चगगने समुड्डीय तृतीयं मेघदूतं नाम निरवद्यं काव्यं व्यरचयत। प्रसङ्गेऽस्मिन् शास्त्रिमहाभागस्य समीक्षावचनं किञ्चित् समुद्ध्रियते The horizon of his travels expands and he goes beyond the boundary of Malawa in the *Meghadūta*. He commences from a point beyond the eastern boundaries of Malawa, goes round it, entering it in the east touching various places of interest and goes far beyond in the north. किन्तु बाह्यप्रकृतेः सौन्दर्य्यमैश्वर्यञ्च वर्णयता तृप्तिमनधिगच्छता कविचेतसा मानवमनसः अन्तर्गूढ़ं भावराशिं विशेषतः प्रेमवैचित्र्यं चित्रयितुमभिलषता विरचितं विक्रमोर्वशीयं नाम दृश्यकाव्यम्। अपिच इयतापि कालेन मानव-हृदयस्य अन्तर्गूढ़ं प्रेमरहस्यं तस्य मानसदृष्टौ सम्यक् परिस्फुटं नाभवदिति कृत्वा कविना दिव्यादिव्ययोः उर्वशीपुरुरवसोः प्रेमरहस्यमवलम्ब्य नवीने सृष्टिक्षेत्रे पदं कृतम्। किञ्च न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते इत्यनुभूतिस्तदानीं कविप्रतिभामस्पृशदिति तेन सम्भोगपर्यवसायि विप्रलम्भचित्रम् अत्रोपस्थापयितुं प्रयतितम्। तथात्वेऽपि तावत्कालपर्यन्तं समङ्कितेप्रेमरहस्ये देहाश्रयिता आवेगमयता च प्राधान्यं लभेते। समीक्षितं शास्त्रिमहाभागेन–But his love is still a passion and his admiration of nature no less ardent.[९] विक्रमोर्वशीयरचनायाः परं कालिदासस्य चित्तभूमौ काप्यन्या परिवृत्तिः पदं कृता। वयोवृद्ध्या समं धर्मभावस्य प्रबलता तेनानुभूता। धर्मेण सह प्रेम्नः प्रेम्ना सह भक्तेः भक्त्या सह त्यागस्य सम्मेलनेन प्रेम्नः शुचिशुभ्रं परमैश्वर्यं कीदृशं विकशितं भवेदित्यस्याभिव्यक्तिं विधातुं तेन कुमारसम्भवकाव्यग्रथने मतिरास्थिता। शास्त्रिमहाभागेनैवं समीक्षितम्–He atones for devoting long years of youth in the description of ardent and passionate love for the female sex by reducing 'Kāma', the embodiment of passions into ashes. Henceforth his love is an absolutely divine sentiment and no passion.[१०]

तथाहि पूर्वपूर्वकाव्येषु आवेगमयं देहाश्रयि प्रेमात्र स्वर्णायितं दिव्यां भूमिमारूढञ्च। अस्यैव देवदेवीसंश्रयस्य दिव्यस्य प्रेम्नः मर्त्यरूपतां प्रतिपादयितुमनन्तरं कविनाभिज्ञानशकुन्तलमिति नाटकं रघुवंशमिति महाकाव्यञ्च परिणते वयसि विरचिते। शास्त्रिमहोदयस्य मते इदमेव पौर्वापर्यं कालिदासकृतिसप्तकस्य। वाह्यप्रकृतितः मानवप्रकृतिं प्रति मानवेतरप्रकृतितो मानवप्रकृतिं प्रति वाह्यप्रकृतितः आन्तरप्रकृतिं प्रति, प्रेम्नः चञ्चलतात आवेगमयतातस्तथा देहाश्रयितातश्च स्थिरतां दिव्यताम् आत्माश्रयितां प्रति स्वर्गतो मर्तं प्रति देवतातो मानवं प्रति कविदृष्टेः क्रमविवर्तनं रचनापारम्पर्येऽस्मिन् विधृतमस्तीति तस्याभिमतम्। कालिदासीयकृतीनां रचनाक्रमविषयकोऽयं सिद्धान्तो यद्यपि सर्वजनग्राह्यतां न गाहते तथापि विषयेऽस्मिन् तदीयं कृतित्वमनपह्नवनीयमेव। आजीवनं कालिदासकाव्यरसिकस्य सहृदयधौरेयस्य शास्त्रिणः हरप्रसादस्य समुल्लसत्यत्र आन्तरिकी निष्ठा अविज्ञातवृत्तस्य कालिदासजीवनस्य गाढ़ां तमिस्रां किञ्चिदपसारयितुम्।

सप्तदशसर्गात्मकं कुमारसम्भवमद्यत्वे प्राप्यमाणमस्ति। किन्तु तत्र कति सर्गाः कालिदासेन स्वयमेव रचिता इत्यस्मिन् विषये विदुषामस्ति विप्रतिपत्तिः। चिरं प्रचलितायामस्यां विप्रतिपत्तिधारायां शास्त्रिमहाभागस्यैतदभिमतं यत् प्राथमिकाः सप्त सर्गाः कालिदासलेखनीसम्भवाः शेषा दश सर्गा अन्येन केनचित् कविना विरचिताः। विद्यासागरेणापि तदीये 'संस्कृत भाषा साहित्य विषयक प्रस्ताव' इत्याख्ये प्रबन्धे एवमभिप्रयति यत् प्रथमादिसप्तमसर्गान्तस्य कुमारसम्भवस्य सर्वत्र विद्यतेऽनुशीलनम्। शिष्टा दश सर्गा एकान्ततोऽप्रचलिताः विलुप्तप्रायाश्च। एते दश सर्गाः कालिदासस्य अलौकिककवित्वशक्तेः लक्षणैः पूर्णतो समन्विता अपि यदप्रचलिता विलुप्तप्रायाश्च तत्र कारणं हरगौर्य्योः सम्भोगवर्णनम्। अत्रेदमपि अवधारणीयं यत प्रथितेन टीकाकृता भरतमल्लिकेन काव्यस्यास्य सप्तमसर्गं यावत् टीकाप्रणयनं विहितम्। टीकाकर्तुरस्य मते षोड़शसर्गात्मकमिदं काव्यम्। तथाचोक्तं तेन—

तस्य शेषाष्टसर्गस्य सञ्चारोऽभून् न दैवतः।
पाठोऽष्टमस्य सर्गस्य देवीशापान्न विद्यते।

रवीन्द्रनाथस्यापि सप्तमसर्गान्तं कुमारसम्भवमभिमतं प्रतिभाति। यतस्तेनैवमुक्तं सप्तमे सर्गे स एव विश्वव्यापी उतसवः। अस्मिन् विवाहोत्सवे एव कुमार-सम्भवस्योपसंहारः।[८]

परन्तु शास्त्रिमहोदयस्य तथान्येषां सममतावलम्बिनां विद्वद्वरेण्यानां सिद्धान्तेऽस्मिन् पुनर्विवेचनाया अवकाशो विद्यते इति मन्दमतिभिरस्माभिर्मन्यते। टीकाकृतारुणगिरिणा मल्लिनाथेन च अष्टमसर्गं यावत् टीका विरचिता। किञ्च आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोकस्य वृत्तौ जगतो मातापित्रोः पार्वतीपरमेश्वरयोः साधारणस्त्रीपुरुषयोरिव यत् सम्भोगवर्णनं समाचरितं तत् प्रतिकूलविधया

समीक्षितम् । तथाचोक्तं तेन – अधमप्रकृत्यौचित्येन उत्तमप्रकृतेः शृङ्गारोपनिबन्धने का भवेन्नोपहास्यता । त्रिविधं प्रकृत्यौचित्यं भारतवर्षेऽस्ति शृङ्गारविषयकम् । ..... तस्मादभिनेयार्थेऽनभिनेयार्थे वा काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तमप्रकृतिभिर्नायिकाभिः सह ग्राम्यसम्भोगवर्णनं तत्पित्रोः सम्भोगवर्णनमिव सुतरामसभ्यम् । तथैवोत्तमदेवतादि विषयम् । (ध्वन्यालोकः, विद्याभवनसंस्कृतग्रन्थमाला - ९७, तृतीयोद्योतः कारिका १०-१४, वृत्तिः, पृष्ठा ३६३-३६५) अत्रानन्दवर्धनेन हरपार्वत्योरधमपात्रवत् सम्भोगवर्णनमेव कटाक्षितमिति सुस्पष्टं प्रतीयते । अतः अष्टमसर्गावधिकं कुमारसम्भवं कालिदासेन अवश्यमेव विरचितमिति अनुमानस्यास्त्यवकाशः । शेषाणां सर्गाणां कालिदासकर्तृत्वे अस्त्यर्थकम् नञर्थकञ्चेति मतद्वयमद्यत्वेऽपि प्रबलायमानमस्ति । पार्वतीर प्रणय इत्याख्ये प्रबन्धान्तरे शास्त्रिमहाभागेन पार्वत्यास्तपचर्यायां यादृशो महिमा प्रकाशितः तत्र तस्य मननशीलता प्रतिपंक्ति सुव्यक्ता प्रतिभाति । स्त्रीपुरुषयोः प्रणयविधौ कालिदासस्य भावना कियदुच्चकोटिकासीदिति प्रतिपादनमेव प्रबन्धस्यास्य लक्ष्यम् । अतः प्रबन्धस्योपक्रमे तेन समुदीरितम्–'वयमद्य कालिदासीयप्रणयस्यैकमद्भुतं चित्रं प्रदर्शयिष्यामः । अस्माकं कवयः प्रणयवर्णनायां कियदुच्चभूमितां गन्तुं शक्नुवन्ति तत्प्रदर्शनमेव प्रस्तावस्यास्योद्देश्यम् । ..... वयमद्य यां प्रेमकथां प्रस्तुमः, मन्ये, तदपेक्षयोच्चकोटिकः प्रणय ऋषिभिरपि कल्पयितुं न शक्यते । का कथा अन्येषां कवीनाम् । स प्रणयः पार्वत्याः प्रणयः, शिवं प्रति प्रणयः ।'

हिमालयस्य गौरीशृङ्गे सुदुःसहे तपसि प्रवर्तमानां पार्वतीं परीक्षितुकामो महादेवः जटिलब्राह्मणवेशेन तत्र समागतः । कुशलप्रश्नादिकं प्रथमतो विधाय तस्यास्तादृश्यास्तपश्चर्यायाः कारणं ज्ञातुमियेष । शालीनतया सा स्वकीयं मनोगतं वक्तुमशक्नुवाना प्रत्युत्तरदानाय सखीं प्रति ईङ्गितं चकार । तत इयं मे सखी पिनाकपाणिं पतिमाप्तुमिच्छतीति सख्या आवेद्यमानस्य अर्थस्य याथार्थ्यविज्ञानाय पुनरेव ब्रह्मचारिवेशवता महादेवेन पृष्टा पार्वती तस्मै एवमभिहितवती ।

यथाश्रुतं वेदविदां वर त्वया
जानोऽयमुच्चैःपदलङ्घनोत्सुकः ।
तपः किलेदं तदवाप्तिसाधनं
मनोरथानामगतिर्न विद्यते ॥५/६४

अनयोक्त्या समभिव्यज्यमानं पार्वत्या प्रेममाधुर्य्यं विश्लेषयता शास्त्रि महाभागेनोक्तम्– 'पार्वत्या वदनतो येयमनुरागवार्ता श्रूयते अन्यत्र कुत्रापि एतादृशी अनुरागवार्ता केनापि श्रुता किम् ? अत्र नास्ति चाञ्चल्यम्, नास्ति इन्द्रियविक्षोभः, नास्ति ऐहिकसुखसम्भोगस्य वार्ता । स्थिरः धीरोऽटलोऽचलश्चायं प्रेमा । अकिञ्चनाहं; ममेयमाकाङ्क्षा दुराकाङ्क्षेव । मम तु नास्ति अन्य उपायः । अतोऽहं कठोरां तपस्यां करोमि । उक्त्यानया कियदात्मनो दैन्यं कियदात्मविसर्जनम्, प्रियतमं देवदेवं महादेवं

प्रति कियती भक्तिः, कियती श्रद्धा कियान् प्रेमा च समभिव्यज्यन्ते।' ब्रह्मचारिणो मुखोच्चारितेन निन्दावाक्यसहस्रेणापि पार्वत्याः सङ्कल्पः शिथिलतां न गतः। सविनयं तया विनिवेदितम्–

अलं विवादेन यथा श्रुतस्त्वया
तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः।
ममात्र भावैवकरसं मनः स्थितं
न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते ॥५/८२

महादेवं प्रति प्रेमविषये कियान् सुदृढ़ः सङ्कल्पोऽत्र प्रकाशितः पार्वत्या। महादेवं पुनर्विवक्षुं विलोक्य विक्षुब्धचित्ता सा सखीमेवं निर्दिदेश–

निवार्यतामालि किमप्ययं वटुः
पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः।
न केवलं यो महतोऽपभासते
शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक् ॥५/८३

ब्रह्मचारिणः निषेधकरणादात्मन एव स्थानत्यागो वरं मन्यमाना सा गन्तुं प्रवृत्ता। अस्मिन्नवसरे ब्रह्मचारी स्वं महादेवस्वरूपं प्रकाश्य पार्वतीं करे धृत्वैवमुवाच–

अद्य प्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः
क्रीतस्तपोभिः –। ५/८६

स्थितिमिमां समीक्षमाणेन शास्त्रिमहाभागेनोक्तम्–योऽयं प्रणयः (कालिदासेनात्रोपस्थापितः) तस्मिन् नास्ति कामगन्धस्य लेशोऽपि। तस्मात् प्रारम्भ एव कामो भस्मतां गतः। कामशव्देन स्पर्शविशेषो बोध्यते, अत्र तु कामशब्दस्यार्थ इन्द्रियमात्रमेव। अहं मम वाञ्छितं द्रष्टुमपि नेच्छामि, स्प्रष्टुमपि नेच्छामि, तस्य स्वरं श्रोतुमपि नेच्छामि, तस्य देहगन्धमपि समाघ्रातुं नेच्छामि। इच्छामि केवलं मदीयं सर्वं मनःप्राणादिकं समर्प्य तस्य पूजां विधातुं, वाञ्छामि स मां पदप्रान्ते स्थापयतु इति ज्ञात्वेवाहं कृतार्था। योऽयमपूर्वः प्रणयः, स एका महती तपस्या। एतादृशस्य निःस्वार्थस्य प्रणयस्य लाभोऽपि महतः तपसः फलम्। तस्मात् पार्वत्या कठोरं तपः समाचरितम्। तस्या मनोरथोऽपि सिद्धो जातः। महादेवः स्वयमेव तां परीक्षितुं समागतः। परीक्षया तेन ज्ञातम्–यथार्थतः स्वर्णस्वरूपेयम्। अतो महादेवः तस्याः क्रीतदासत्वं स्वीचकार। स्वयमेव याचकोभूत्वा योटकमन्विष्य तां परिणीतवान्। विवाहात् परं पुनरुज्जीवितो मदनः। ततो द्वौ मिलितौ एकरूपतां गतौ। पार्वती शिवस्य अर्धाङ्गभागिनी जाता। कस्या अपि अन्यस्या भाग्ये तादृशं नाभवत्; नापि कस्या अपि देवतायाः।" अत्रेदमवधेयम् साहित्यसम्राजा वङ्किमचन्द्रेणापि कुमारसम्भवस्य काव्यसौन्दर्य्यमवलम्ब्य महत्तममादर्शमाधारीकृत्य च विविधा विचारणा विहिता। परन्तु इयानेवा नयो र्मतभेदो यत् वङ्किमचन्द्रेण मन्यते

कुमारसम्भवं कवेः परिणतप्रज्ञायाः वाणी शास्त्रिमहाभागस्य मते तु रघुवंशमेव तेन परिणते वयसि विरचितं न कुमारसम्भवम्। द्वयोरनयोः काव्ययोः पौर्वापर्यमधिकृत्य मनीषिद्वितयस्य महान् मतभेदः प्रबलतया प्रकाशं गतः।

कुमारसम्भवे समभिव्यक्तं कालिदासीयं प्रेमगौरवं भिन्नया भङ्ग्या रवीन्द्रनाथेनापि प्रदर्शितम्। तथाच समीक्षितं तेन—धर्मो यत्र द्वे हृदये एकत्रीकरोति, तत्र मदनेन सह कस्यापि कोऽपि विरोधो नास्ति। स यदा धर्मेण सह विरोधं कर्तुमिच्छति तदैव विप्लव उपस्थितो भवति, तदैव प्रेमणि ध्रुवत्वं, सौन्दर्ये शान्तिश्च न तिष्ठतः। किन्तु धर्मस्य अधीनतया तस्य यन्निर्दिष्टं स्थानमस्ति तत्र सोऽपि परिपूर्णताया एकमङ्गम्, तत्र स्थितः स सुषमाभङ्गं न करोति। ..... प्रेम्नः मन्त्रबलेन मनो यत् सौन्दर्यं सृजति तत् बाह्यसौन्दर्यनियमेन न विचारणीयम्। गौर्य्या इव, किशोर्य्या सह शिव इव तपस्वी बाह्यसौन्दर्यनियमेन यथार्थतयैव सङ्गतिं न भजति। शिवः स्वयमेव छद्मवेशेन तां वार्ता तपस्यारतायै उमायै ज्ञापितवान्। उमा तत्रोत्तरं दत्तवती—'ममात्र भावैकरसं मनः स्थितम्'; मम मनस्तत्रैव भावैकरसं सदवस्थितिं करोति। मनोऽत्र ..... स्वमानन्दं स्वयमेव सृजति। शम्भुरपि एकदा बाह्यसौन्दर्यं प्रत्याख्यातवान्; किन्तु प्रेम्नो दृष्ट्या मङ्गलस्य दृष्ट्या धर्मस्य दृष्ट्या यत् सौन्दर्यं स दृष्टवान् तपस्याकृशेनापि आभरणहीनेनापि तेन सौन्दर्येण तस्य पराजयः सञ्जातः।

धर्मो यदा तापसतपस्विन्यो र्मेलनसाधनमकरोत् तदा स्वर्गमर्त्यौ अस्य प्रेम्नः साक्षिरूपेण सहायरूपेण च अवतीर्णौ भवतः, अस्य प्रेम्न आह्वानं सप्तर्षिवृन्दमपि स्पृशति; अस्य प्रेम्न उत्सवो लोकलोकान्तरेषु व्याप्तो भवति। ..... अस्य या अम्लान-मङ्गलश्रीः सा समस्तस्य संसारस्य आनन्दसामग्री। समग्रो विश्वोऽस्य शुभमिलनस्य निमन्त्रणे प्रसन्नचेतसा योगदानं कृत्वा इदं सुसम्पन्नं करोति।[१०]

शास्त्रिमहाभागेनानेन कालिदासस्य विविधानां कृतीनां विशेषतः कुमारसम्भव-मेघदूताभिज्ञानशकुन्तलरघुवंशानां पृथक्पृथग्भावेन समीक्षणं यथा विहितं तथा कालिदासप्रतिभायाः सामग्रिकमूल्यायनविधावपि प्रयतितम्। कालिदासीयरचनाया भाषाप्रयोगपाटवम् निरवद्यं शिल्पचातुर्यं छन्दोग्रथनदाक्ष्यं ब्राह्मण्यादर्शं प्रति परमा निष्ठा एवमादिकानि वैशिष्ट्यान्यपि कालिदासकाव्यगतानि शास्त्रिमहाभागस्यास्य विचार्यमाणतां गतानि। विषयेषु एवमादिषु तदीया विचारधारा विदुषां श्रद्धासमन्वितां दृष्टिं समाकर्षति। ब्राह्मण्यधर्मानुमोदिता समाजव्यवस्था चतुराश्रमप्रथा मानवधर्मशास्त्रानुमोदिताया राज्यशासनपद्धतेः समुन्नतादर्शधारा तपोवनजीवनस्य महनीयता—एवमादिका कालिदासीया विशिष्टा चिन्तापरम्परा शास्त्रिणोऽस्य रचनासु यथायथभावेन प्रतिबिम्बिता।

'Vālmīki, Vyāsa and Kālidāsa are the essence of the history of ancient India; if all were lost, they would still be its sole and sufficient cultural history.[११] ऋषेररविन्दस्येयमुक्तिः प्रत्यक्षरं यथार्था। शास्त्रिमहाभागस्य

CENTRAL LIBRARY

सहृदयताप्रतिभालोकेन महाकवेः कालिदासस्य कृतिषु प्रतिविम्बितेयं भारतीयता पाठकानां चेतःसु सम्यग् भवति स्फुरिता। विश्वसाहित्यसंसदि कालिदासकृतयो यावद् राराज्येरन् तावत् हरप्रसादशास्त्रिणो व्याख्यानपि तासां मार्मिकं रहस्यं समुद्घाटयद् देदीप्येत इत्यत्र नास्ति सन्देहलेशस्याप्यवसरः।

प्रबन्धस्यास्य निर्माणेऽस्माकं गुरो र्विपश्चितः।
भट्टाचार्योपनाम्नो हि श्रीविष्णुपदशर्मणः॥
उपयोगं गतस्तावत् प्रबन्ध इति भक्तितः।
कृतज्ञचेतसा तस्मै नमोवाकं प्रशास्महे॥

सूत्र :

१) हायरे कवे केटे गेछे कालिदासेर काल।
पण्डितेरा विवादकरे लये तारिख साल। –रवीन्द्रनाथ।

२) द्रष्टव्य : प्रवन्ध : Kalidasa – His Age (JBORS, 1966, pp 31-44)

३) द्रष्टव्य : प्रवन्ध : Kalidas – His Home (JBORS, 1915, pp. 197-212)

४) सूत्रधारः : अभिहितोऽस्मि विद्वत्परिषदा कालिदासग्रथितवस्तु मालविकाग्निमित्रं नाम नाटकमस्मिन् वसन्तोत्सवे प्रयोक्तव्यमिति। तदारभ्यतां सङ्गीतम्।
पारिपार्शिकः – मा तावत् प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं पविषदो बहुमानः।
सूत्रधार : अयि विवेकविश्रान्तमभिहितम्। पश्य –
पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयवुद्धिः।

५) The chronology of Kalidasa's works.

६) Ibid.

७) Ibid.

८) प्राचीनसाहित्य, कुमारसम्भव ओ शकुन्तला, पृष्ठा ७२० रवीन्द्ररचनावली, सुलभसंस्करण, ३य खण्ड।

१०) प्राचीन साहित्य, कुमारसम्भव ओ शकुन्तला पृष्ठा ७२०, रवीन्द्ररचनावली, सुलभसंस्करण, ३य खण्ड।

११) Sri Aurobindo : Kalidasa (First Series) p. 1.

CENTRAL LIBRARY

BUDDHISM IN BENGAL SINCE THE MUHAMMADAN CONQUEST

Haraprasad Shastri

Whatever might have been the fate of Buddhism in other parts of India, in the Provinces of Eastern India, it had to suffer serious persecution, nay, it may be said, that Buddhism was expelled from Eastern India by fire and sword. In making excavations at Kuśīnagara ashes were discovered after a certain depth, plainly indicating that fire was one of the agencies employed in the excavations of Buddhism.[1] At Sārnāth in Benares, the excavations laid open cook-rooms containing half-boiled rice rotting there for centuries. The catastrophe was so sudden that the poor Bhiksus could not even complete their meals. Sir A. Cunningham quotes two passages, one from Tibetan and another from Muhammadan sources that in the last Buddhist capital of Bihar, Bakhtiyar Khilji puta largr number of shaven Brāhmaṇs, *i.e.*, Buddhist Bhikṣus assembled at a monastery, to the sword.

All there facts plainly shew that fire and sword were employed in the destruction of Buddhism in Eastern India. But who employed them? In the case of Odantapuri, the last capital of Bihār, it was certainly the Muhammadans, and presumably in other cases also, they were the destroyers. The Hindu mode of persecuting Buddhists, was quite different. It was persecution and annoyance, and not destruction, Śaśṅka cut down the Bo tree.[4] Udayana held a disputation with the life of his Buddhist antagonist at stake.[5] Gaṇgeśopadhyaya wrote his great work on Logic with the express object of प्रचण्ड पाषण्ड तमस्ति तीर्षया *i.e.*, for dispelling the darkness created by powerful heretics; and Udayana wrote a work entitled Bauddha-dhikkāra, or, 'Fie on the Buddhist!' Another Hindu revivalist prohibited the sounding of the bell at Buddhist Vihāras, till he was worsted in disputation.[6] This is the Hindu way of persecution. The Sena rājās of Bengal used to grant lands to Bṛāhmaṇs bordering on Buddhist Vihāras, thus setting up a perpetual source of annoyance to the inmates of the monastery.[7] Ridicule was one of the powerful weapons used by the Hindus in annoying the Buddhists, who were held up in dramas like the *Probodha, Candrodaya,* as great libertines, fond of wine and women. In later Tantras too, Buddha and his followers are regarded as men of pleasure. Their method of obtaining spiritual success, was by means of wine and women. In the Cīnācāra-tantra Tantra, Vaśiṣtha is sent to China for obtaining success by means of the Tārā-mantra from Buddha, who lived surrounded by women in China. This is annoyance and teasing, but not destruction.

Assuming, therefore, that the Muhammadan conquest dealt a death blow to the expiring efforts of Buddhism in Eastern India, it may be asked, was the destruction of Buddhism caused by Muhammadan conquest complete? People think it to be so, but this is phisically impossible. The Muhammadan conquest itself was not a complete conquest, the Pāṭhāns held the country

CENTRAL LIBRARY

simply in military occupation. They held some of the big cities and left the rest of the country to govern itself the best it could. It was not possible for them to destory Buddhism all over the country. Then again, it is difficult to say that the conquerors could distinguish between Hinduism and Buddhism. They were iconoclasts. They destroyed idols, no matter whether they were Hindu or Buddhist. In fact, the pressure of the conquest was felt by both Hindus and Buddhists alike. The Brāhmaṇs from Rāṛh and Varèndra flocked to Vikramapura,[8] The last stronghold of the Sèna rājās, and up to this date there are more Rāṛhī Brāhmaṇs at that remote corner of Bengal than in Rāṛha itself, especially the higher class *Kulīns*. To drive away Brāhmaṇs and to destroy a few families is one thing, but quite another thing is the wholesale massacre of Buddhist monks, assembled in central Vihāras during the vassā. If one single monastery is destroyd with all is monks, a whole district, nay even a larger area, will be without religious leaders and religious teachers altogether. A few cases of massacre like that at Odantapuri, would leave the entire Buddhist population of Bengal and Bihār without leaders. One would be disposed to account for the existence of a vast Muhammadan population in the districts of Bengal, amounting to 2.5 millions of people, by the easy conversion of the Buddhist population after the destruction of their monasteries.

The helpless Buddhists would naturally be inclined more to Muhammadanism, which has no restriction of food, &., than to Hinduism, which imposes thousands of restrictions on every action of life.

But was Buddhism actually effaced from the soil of Bengal and Bihār? People think so, but there were traces of Buddhism till very lately. A Kāyastha belonging to Magadha copied a Buddhist Ms. in 1446. The Ms. is now at Cambridge. That shows signs of lingering Buddhism. Dr. Hoey has discovered an inscription at Sèt., dated in the thirteenth century, dedicating a temple to the Buddha.[10] Buddhist monks were at Bodh Gayā so late as 1331. The Bodh Gayā temple was repaired by a King of Arakan in 1305. A biographer of Caitanya, named Cuḍāmaṇī Dāsa, makes Buddhists rejoice at the birth of Caitanya. One of the great millionaires of Sātgāõ in Caitanya's time, belonging to the Sonārbānia caste, refuses to accept Vaisnavism on the ground that he would not like to be saved, when the whole world round him is plunged in misery.[11] This is pure Buddhistic sentiment absolutely unknown to the Hindus. Śūlapāṇi, writing after the Muhmmadan conquest, makes the very sight of a Buddhist an occasion for performing expiatory ceremonies. The word of the text he quotes is *Nagna*, or naked, which he explains as Bauddhādayaḥ. How could he explain that word that way if there were no Buddhists in his country?

These facts will lead to one conclusion that traces of Buddhism were to be found so late as Caitanya's time. In speaking of Buddhism I do not take into consideration the fact of the Buddha's being regarded as the ninth incarnation of Viṣṇu, for in that case all Hindus would be in one sense, Buddhists. No trace of Buddhism has been found after Caitanya's time.

It seems, however, surprising that a religion which existed in Eastern India in such splendour from 600 B.C. to 1200 A.D., should be so utterly destroyed that no vestige of its existenec could be found any where in Bengal at this day only 700 years after its final overthrow. But fortunately it is not so. A sort of corrupt Buddhism mixed up with a variety of Aryan and non-Aryan forms of worship, still obtains in Bengal amongst a very large number of lower class people. Of the various castes inhabiting Bengal, Dōms never acknowledge the superiority of Brāhmaṇs. They get all the religious ceremonies of the caste, performed by paṇḍits of the Dōm tribe, and these Dōms are the constituted Purohitas of Dharma, a deity whom I ventured to identify with Buddha-deva. One of the names of Buddha is Dharma-rāja, and this is precisely the name by which the deity Dharma is spoken of by his worshippers. The ancient Bengali literature consists of works describing the way in which different deities manifested themselves in this world and the way their worship become prevalence of the worship of Manasā, or Goddess of serpents. There are works also describing how the deity Dharmarāja manifested himself, and how his worship became prevalent.

According to Ghana-rāma who wrote in 1710 his magnificent work the *Śrī-dharma-maṅgala*, on this subject, his work is based on two previous works, one by Rūparāma and another by Maūra-bhaṭṭa. All these again are said to be based on the Hākanda-purāṇa. My enquirics have led to the fact that works of Rūpa-rāma and Maūra-bhaṭṭa are still extant, but I have not yet succeeded in getting copies of these works.

The story as given by Ghana-rāma, is this. The son of the great King of Gauḍa, Dharmapāla, had appointed his brother-in-law Mahāmada, as his miniser. Mahāmada had another sister named Rañjā, for whom he had a dislike, but she was a special favourite of Dharma-rāja. Mahāmada tries in various ways to destroy his sister's son, Lāu-Sèn, but Dharma always protects him. Lāu-Sèn, is persecuted in various ways, but all these persecutions fail. Lāu-Sèn is then sent to lead arduous expeditions against distant countries, such as Kāma-rūpa and Orissa. In all of these Dharma makes him successful. Mahāmada at last comes to his senses and takes his nephew into favour. Kālu Dom, Laū-sèn's favourite general, becomes the constituted Purohita of Dharma and obtains the privilege of being allowed to drink wine and eat hog's flesh. Dharma is described as superior to Brahmā, Visṇu and Mahèśvara, and has having Hanumat as his great general. Ghana-rāma's work is a lengthy one, it repays perusal both as a work poetic art and as embodying curious information about ancient Bengal.

The great Buddhist monarch Dharma-pāla, is very well known. He was the first great monarch of the Pāla dynasty, who were Buddhist. It is also known that he conquered Gauḍa and led expeditions to Kāma-rūpa, where also a branch of this dyanasty ruled for a long time. It is probable that Buddhism mixed up with some aboriginal form of worship, gave rise to a new form of worship, namely, that of Dharma during the ascendency of the Pāla dynasty in Bengal, and that it being suited to the genius of the people,

obtained a currency which still lasts. That Buddhism has a wonderful aptitude in assimilating various forms of Demon and other worships, is well known from the history of Buddhism in Nèpāl and Tibet. The Dharma worship appears to be a similar assimilation of some oldworld superstition with Buddhism.

My recent investigations into the mode of Dharma worship, during the Durgā Pūjā holidays in the subdivision of Cuṭwa, has added another link to the arguments for proving the identification of Dharma-rāja with the Buddha. There is a Dharma temple at Śuōngāchl near Pāṭuli, the priest of which belongs to the Mayarā caste. He was questioned about the method of worship, and his answers let to important results. He said cooked food is never offered to Dharma ; this is precisely the case with Buddhist and Jaina idols. They are regarded as emancipated men and not deities. Any cooked food when eaten by men becomes impure, and so no cooked food is offered to them. Any caste may worship Dharma. The Doms do worship him and often offer hog's flesh to him, but the Mantra by which Dharma is meditated upon, is very curious. It leaves no doubt that he is the Buddha.

यस्यान्तो नादिमध्यो न च करचरणं नास्ति कायनिदानम्
नाकारं नादिरूपं नास्ति जन्मक्ष यस्य [च] (ह्य अस्य?)
योगीन्द्रो ज्ञानगम्ये सकलजनहितं सर्वलाकैकनाथम्
तत्वं तं च निरञ्जनं मरवरद पातु वः थुन्यमुर्ति:॥

He who has no end, no beginning and no middle; he who has neither hands nor legs, he who has no germ of body; he who has no form, no primordial form; he who has no birth; that Yogīndra, approachable by knowledge friendly to all men, one protector of all creaures, the truth, the spotless, the giver of boons to mortal men; whose form is Śūnya or void; may he protect you!

The word Yogīndra applies to the Buddha, as he is called Munīndra in the *Amarkoṣa.* He is approachable by knowledge, while Hindu deities are approachable by devotion.

Most of this adjectives may, though by some stretch of imagination, apply to Śiva or Viṣṇu. But there is one which can never be applied to a Hindū deity and which is a peculiar attribute of the Buddha. This is *Śūnya-mūrti,* identifying him with void; this is what the Prajña Paramitā teaches, and is what constitutes the peculiarity of Buddhist teaching that everything resolves itself into *Śūnya* or void. The Sanskrit of the Mantra as obtained from the Mayarā perfectly ungrammatical, and so I tried to get another version of it from a different part of the county, and if possible from a higher class man. This I succeeded in getting from a small village near the Rājbandh station in Bānkurā.

Though this version is nearer to grammatical Sanskrit, yet it contains one serious grammatical blunder, and though the form in which it is put,

looks like the Dhyāna or Mantra for meditating on a Hindu deity by saying चिन्तयेन् शून्यमुर्त्ता I fail to understand how the mind can be fixed on a void without beginning and without end, without legs, without arms, without head, and so on. This is in fact an attempt to give to a high Buddhist spiritual concepion, a Hindu personified form, and the attempt is a miserable failure. The Mantra too, appears to have been written by an ignorant man in some form of ancient Prākrit, which many have tried to put in a sanskritised form.

Many would not like to believe that this low worship, accompanied with the sacrifice of pigs, and with Dhyāna and other Hindu forms of worship, can bave anything to do with Buddhism, whose first vow was to refrain from killing animals, and which in its earliest forms at least, did away with worship altogether. But that it is so, will appear from translations from the history of Buddhism by Lama Tāranātha of Tibet, kindly made for me by Babu Śarat Chandra Dās, C.I.E. and appended to this article.

I beg to draw attention to one passage of this translation. "He (the Domācārya) preached the Tāntrik doctrine of Buddhism, called Dharma, to the people if Tippera, and obtained numerous followers. Many among then became *Siddhas* too. He was then invited to the country of Rāḍha, called Rārā in the common language of the people. The Rājā of that country was a bigoted follower of Brahmaṇs, but seeing the supernatural powers of Dōmācārya, and his goodness and learning, he became changed in his views, and henceforth the ' Dharma' Buddhism, in its Tāntrik phase became greatly honored and followed by the people of Bengal, Rāḍha and Tippera. By the worship of Dharma, is meant, that of the Buddhist deities, such as Vajra-yoginī; Vajra-vārāhī; Vajra-bhairava (ksètra-pāla); Vajra-dākinī; the Nātha, and so on. In fact, in the latter days of Buddhism, the Dik-pālas, Dharmapālas and other spirit protectors of Buddhism, became the object of worship to the exclusion of the Buddhas and Bodhisattvas;"

That Vajra-Yoginī, Vajra-bhairavas and other Buddhist Tāntrik deities used to be worshipped in Bengal, there is no doubt. Many of them are still worshipped in a Hinduized form. But Kṣetra-pāla is still worshipped under his proper name in a non-brahmanic form by low caste priests. Kṣetra-pāla is represented by some tree. The earth on which it grows has the miraculous power of removing barrenness, and producing male children in one who gives birth to daughters only. There is a Kṣètra-pāla tree at Khaḍ-daha, eight miles from Calcutta, and another at Śingi, in Burdwan.

From very ancient times Buddhist monks used to dispense medicines; that was one of the sources of their influence, nay, of their income. The Dharma priests to this day do dispense medicine. They generally pretend to have received certain specifics for certain diseases from their deity, and if the patient with a devout mind uses the medicine and pays the votive offering after cure, he is sure to get rid of the disease. The Śuōngāchi Dharma has

a specific for diarrhoea. The Jāmālpur Dharma cures not only diseases but grants whatever is desired of him. The Acalāyatana Dharma has a specific for bilious eruptions, and so on.

References

1. Rep. Arch., Ind., Vol. xviii, pp. 62-63
2. The same, Vol. I, pp. 126-30
3. The same, Vol. xi, p. 185.
4. The same, Vol. III, pp. 80-81
5. GaurÔ Brâhmap, pp. 102-05
6. *Travels in the Western Werld*, (ranslated from Chinese by Beal, Vol. II).
7. *GaurŠ Bràhman*, p. 281, line xii.
8. See the article Kulāna in the Vā÷va Koya
9. See Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. in the University Library, Cambridge, Preface, p. 4 and Book, pp. 69-70
10. See pp. 70-71 of the Sharqā Arcilecture of Jaunpur, Vol. I
11. Rep. Arch., III, pp. 104-05

Journal of the Asiatic Society of Bengal 1895.

IN MEMORIAM

Biswanath Banerjee

Mahamahopadhyay Haraprasad Shastri was an outstanding scholar of Indian Studies in the 19th-20th century (1853-1931). A versatile genius he was never to tread on a beaten track and had an urge to find out new lines of research with scientific methodology and dig out fresh matter and materials broadening the horizon of Indological researches. His original and pioneering contributions have enriched our knowledge to a great extent. Primarily a student of Sanskrit trained in the traditional set up he did never allow himself to be influenced or bound by any type of orthodoxy. He was not only much ahead of his time himself in his ideas but his researches put the subject of Indology in a more advanced state of maturity. He could wield his pen with equal ease and competence on any topic of social, cultural or literary interests. He was a Sanskritist and his mastery over the language helped him to see and study Sanskrit texts with a different approach, particularly the unpublished ones fascinated him most.

We may say that Haraprasad started his research career in an age when informative source-materials were not available. He had to cut out his own way by undertaking a project with imagination and hunting for materials to give shape to it. His efforts and investigations did not always succeed but a true researcher was to pass through such failures and oppositions in those days and Haraprasad had to struggle hard to reach his goal and achieve success in his projects and ideas. His ceaseless and untiring efforts to study the unpublished manuscript-materials did bring out many new ideas, principles, accounts etc. to give a new look to the knowledge of Indology and widen the scope of the subject. With the help of these hithero unknown manuscript-materials he could solve many knotty problems of Bengal's history, culture and social affairs. He was not a historian nor did he write any history of Bengal but his Bengali writings in different journals and elsewhere do convince us of his history-conscious mental make-up. He has enlightened us on many indistinct and dark chapters of Bengal's literary and cultural history particularly his contribution to the study of Bengali scripts is remarkable. The prevalent idea of the time that the origin of Bengali literature was due to the efforts of the followers of Shricaltarya of the 16th century was not acceptable to him and that he was right in his ideas was proved beyond doubt when the manuscripts on different *Mangalakaryas, Shrikrishna-vijaya, Adbhuta-ramayana* etc. were unearthed one after the other. His study on the evolution of Bengali scripts is result of an intensive enquiry on the problem and this has been our path-finder and chief guidance to the study of relevant materials. We did not have till then any knowledge of the Bengali scripts older than the Islamic period, and the *Pandit* trained in the *catuspathi* rightly guessed about the existence of older scripts. His theory about evolution of

CENTRAL LIBRARY

. Bengali scripts, and firm conviction of the existence of older Bengali scripts prior to the Muslim period, was firmly established when valuable texts like the *Vimalaprabha*, a voluminous commentary on the *Kalacakratantra* written during the reign of king Harivarmadeva, Abhayakaragupta's *Kalacakravatara*, *Kuttanimatam* of Damodargupta, Ratnakirti's, *Apohasiddhi* etc. were discovered. With the discovery of the manuscript of *Ramacarita*, a *Dvashaya-karya* by Sandhyakara Nandi in 1897 Haraprasad could establish an authentic tradition of an analytical history of Bengal before the Muslim rule. In 1907 he made a sensational discovery of the manuscripts of *Caryagiti* which provided to the academic world a marvellous specimen of the old Bengali language. With his characteristic critical approach and intensive editorial acumen he edited these songs of the *siddhas* and published them along with the *Dohakosa* and *Dakarnava* under the title of *hazar bacharer purana Bangla Bauddha gana O doha* (one thousand year old Bengali Buddhist songs and dohas). The discovery and critical editions of these unpublished Sanskrit and old Bengali texts added a new dimension to our Indological studies particularly to our Buddhist studies. Haraprasada's contributions to this branch of Indian studies which showed and explained to the academic world the existence of the very important Tantric phase of Buddhism are remarkable and in this regard Shastriji's position has been that of a *Pioneer*. Post Mahayana Buddhist studies owe a great deal to this scholar of Bengal. The Sanskrit epic poem *Saundarananda-Kavya* of Asvaghosa was known only by its name of that time, and it was again our Shastri who discovered in Nepal fragments of the poem along with its commentary by one Sarvananda of Bengal (*Vandyaghatiya*) and his edition of the fragments vindicated to the world that Bengal was acquainted with this poem while the rest of the world did not have any glimpse of it. His edition of Vidyapati's *Kirtilata* informed us of many unknown links and relations between Bengali and Maithili languages and their cultural history. The manuscript of the text like *Varnaratnakara* was also found by him in Nepal and, later published by the Asiatic Society, it gave us the first specimen of the eastern regional prose. It is no exaggeration to say that we do not have in anybody else such a scientific approach to Sanskritic studies with such a wide range of subjects and depth as we find in the writings of Mahamahopadhyay Shastri. His modernity, his treatment of varied subjects with scientific methodology and competent grasp over the subjectmatter as evident from the books, articles, lectures or edited texts should indicate the right path to future generations.

No account on Mahamahopadhyay Haraprasad can be even partially true or complete if his relation with Raja Rajendralala Mitra is not considered. The talent or genious in Shastri grew to its full bloom after his association with the Asiatic Society of Calcutta. He joined the society in 1885 and was subsequently made its Vice-President for life. He was elected President of the Society for 1919-21. It was Rajendralala who brought the young Haraprasad to the Society as his associate in researches. He was initiated into the study of Indology by Rajendralala and under his guidance and inspiration

CENTRAL LIBRARY

gradually became trained in the technique and methodology of scientific studies. The rest field of study and work in the society and the inspiring leadership of Rajendralala helped the young scholar to develop in himself a correct understanding of the intricacies and problems of Indology. It was clear to him that ancient Indian wisdom and learning lay largely enshrined in the unpublished manuscript texts and Rajendralala's guidance and inspiration motivated him to take to the study of these unknown texts. Society's treasure of such texts became his first love and he engaged himself whole-heartedly in the collection of valuable manuscript texts which formed the nucleus of Indological researches in the society. In this area also he was a true associate and real successor of Rajendralala. After the demise of his mentor in 1891 Haraprasad was appointed the society's Director of the operations in search of Sanskrit manuscripts. By his inquisitiveness, sincere devotion and sharp intellect he did realise that only the discovery of the unknown texts was not sufficient, the responsibility of a true researcher was not to cease only with the finding out of the texts, more necessary and important it was to know, publish and utilise the materials for greater benefit and knowledge. With the one idea of attracting active interest and attention of scholars covered to the invaluable treasures of manuscripts he started preparing Descriptive Catalogues of Sanskrit manuscripts following the footsteps of Cecil Bendal and Mitra. It was a unique endeavour and interested Indologists all over the world were benefited by the Catalogues. It was from Rajendralala that he got the training of proper utilisation and publication of such manuscripts with new matter and materials. The *tenth* volume of Notices of Sanskrit Manuscripts started by Rajendralala was completed after his death under the supervision of Haraprasad. We may get some idea about the wide range and depth of his knowledge if we look into his introductions to these volumes of Catalogues. A glance over these volumes will make it clear to understand the stupendous problem and the success achieved by him in describing the texts on various subjects within in various scripts. Scholars all over the world have drawn unhesitatingly on the source materials provided by Shastri in these descriptions. Such work initiated by Mitra and Shastri is continuing in the society even now, and manuscript libraries at many places have emulated them in the matter. The association of Haraprasad with Rajendralala has not only proved to be very important but has been of great consequences in the history of Indological researches. Haraprasad's deep knowledge of Sanskrit, Pali, different Prakrits including *Avahatta* helped him evolving a new type of Bengali prose with elegant Bengali mixed with colloquial idioms. His Bengali writings on varied topics including novels and fictions bear testimony to it. To some extent his Bengali prose style resemble the prose style of Bankim Chandra whom he assisted by collecting materials for the history of Bengal. Sanskrit Buddhist Literature of Nepal of Rajendralala has served as a source book for many of our poets and writers including Rabindranath. He also assisted Ramesh Chandra Dutta in translating the Rgveda while he himself contributed some very significant essays in Bengali

like Calcutta two hundred years ago. Division of castes, Kuchinagara, Santideva, Vidyapati, two periods of our glorious times etc. All these activities of assistance and independent compositions were accomplished at the same time, and one may be struck with wonder to know that within thirty five years of age he could exhibit such a rare intellectual capacity and original thinking in so many academic spheres. Just as engaged himself under the guidance of Rajendralala in exploring the different phases of Indology, the same manner he selected some areas of his liking to probe into and scarify his ideas and line of thinking. Investigations into the problems of Bengali language and literature including the scripts formed some such theme of the research of his own liking. He made a sincere effort to write a comprehensive history of Bengali language and literature. Genius is a faculty that enlivens anything it touches, and that has been proved by the life and academic pursuits of the great savant.

Pandit Haraprasad Shastri's close and intimate association with another great Research Institute of Bengal, the Bangiya Sahitya Parishad, cannot be overlooked while discussing his contributions and activities. The Parishad was founded in 1894 and Shastri joined it in 1897. Perhaps his deep attachment to Bengali literature and language now got a favourable atmosphere in developing towards a successful accomplishment. Earnest scholars who gathered around him in the Parishad have given us an authoritative account of the traditional culture of Bengal and the Bengalees. We may reasonably maintain that no history of these two great Institutes of Bengal, The Asiatic Society and the Bangiya Sahitya Perishad, can be complete or authentic without a grateful remembrance of the service rendered by the illustrious *Pandit*.

It is now more than seven decades that Shastri has left this mortal world but has left behind academic treasures and inspring examples of his dedicated pursuits which can sustain sincere scholars for more than a century. It is our common experience in universities and Research Institutes that themes of research for higher degrees are generally selected from all sorts of hackneyed topic repeated several times with different titles mostly not caring for untrodden areas. Both the supervisor and the researcher ignore the manuscript materials which would give them a chance to bring to light new and fresh matters for the scholarly world. It is a pity that senior teachers of the time are perhaps not encouraging their scholars to emulate the example set by Shastriji.

I do not find it worthwhile to remember the savant on occasions only and remain with closed eyes to his life and activities. The best tribute to the memory of the great 'Pandit' will be offered only when youngsters and their seniors will come forward to emulate the Mahamahopadhyay and enrich our knowledge.

'Let him bless us with beneficial intellect'!

CENTRAL LIBRARY

ADVAYAVAJRA-SAMGRAHA— EDITED BY MM. HARAPRASAD BHATTACHARYA SHASTRI

Suniti Kumar Pathak

Advayavajra-samgraha is a collection of twenty one hand-outs aseribed to Advayavajra, a *siddhācārya* who belongod to the eleventh century of the Christian era[1]. Mm. Shastri prefaced the text by introducing the contents of twenty one treateses on the Tantra briefly. Above that he surveyed Buddhism within thirty pages in a separte Introduction. His edited texts were published from Oriental Instilute, Baroda, 1927. in a compendium. The titles belonging to the *saṁgraha* have been given in Appendex with their respective Tibetan versions.

Mm. Shastri had collected varions manuscripts from Nepal in course of his trips in 1907 and 1922. Among his important contributions his Discovery of Living Buddhism in Bengal, 1897 claimed a new horizon of Buddhist Studeis in the nineteenth century. As an erudite Sankrit scholar he belonged to, the Brahmin Nyayaratna family of Naihati. His academic interst in Buddhism and the Buddhishs was somewhat exemplery in those days. In fact, Mm. Haraprasad Shastri had a unique inquisitiveness of knowing multiple branches of human learning, like archaeolagy, history, philosophy, linguistics and literature. His study on *Saundarānanda* of Ashvaghosa claimed his originiality in Sanskrit literary critieism. He was also conversant with Pali, Prakrit and local languages *bhāṣā*. He explored the earliest specimen of the old Bengali language from the *Caryāpada āshcarya-caryā-vinishcaya* collected from Nepal in the Buddhist Apabhramsha dialect. In that respect he was an epoch-making scholar in the renaissance of Bengal education.

As regards the *Advayavajra-saṁgraha* the present paper deals with the author and his compendium *saṁgraha* as Mm. Shastri facused. His Indroduction pointed out three phases of Buddhism; namely, 1. the primitive Buddhism prior to 'a split in the Buddhist camp in the sceond century after Buddha's *Nirvāṇa*' or demise, 2. the Buddhist sangha in bifurcation of *Hīnayāna* and *Mahāyāna*; 3. again, the latter subdivided in *paramitā-naya* equivālent to Mahāyāna and Mantra-naya i.e. *Mantrayāna*, popularly named Tantra of the Buddhists. The *Advayavajra-samgraha* belonged Mantra-yāna.

In fact, Mr. Shastri followed the analysis as that was elarified by Advayavajra in his *Tattvaratuāvalī*. The text mentions thus; three *yānas* are *Shrāvaka-yāna, Pratyakabuddha-yāna* and *Mahāyāna.* They again hold four viewpoints *Vaibhaṣika, Sautrānika, Yogācāra* and *Madhyamavka* separately. *Vaibhaṣika* view stands with *Shrāvakayāna* and *Pratyekabuddha-yāna* Whereas, *Mahāyāna* is of two viewpoints, having *pāramitā* measure and *mantra* measure. The former *Pāramitā-naya* elucidates *Sautrāntika, Yogācāra* and *Madhyamaka* standpoints. On the otherhand, *mamtranaya* adheres to *Yogācāra* and *Madhyamāka* standpoints, together. Also the *Yogācāra* is divided

in two perspectives. 1. *sākārayoga* meditation discerning forms and 2. *nirākāra yogācāra* meditation discerning no form. Similary, *Madhyamaka* standpoint is seperated in two angles; one is, monistic view as a phenomenon is illusary; and the other is all phenomena hold no existence.

The *shrāvaka's* views are distributed in three categories, benign, mediocre, and excelling. The first two, *mṛdu* benign and *madhya* mediocre are regarded as those of the western Vaibhāṣika-views and the last, is the excelling one, is *Kāshmira vaibhāṣika* view.

Advayavajra elaborately discussed the doctrinal variations to justify his excelling status by interpreting *duḥkha;* suffering, *pañca-skandha* five aggregates, four *mārga-phala* paths and respective fruits in the perspective of the essencelemness *shūnyatā* meditation discerning no form. Despite such critical catechism in perspectives relating to various meditation in-depth *vipashyanā;* Advayavajra cites a saying from the *Saddharmapuṇḍarīka-sūtra* that the Buddha holds one *yāna*, one measure *naya*, one kind of teaching *ekā ceyam deshanā*. The plurality is thus apparent due to the expediences of verse : the Buddha. *Tattvaratnavati cites Sadeharmapundarika sūtra verse :*

> *eka hi yāna nayashca ekaḥ ekā ceyaṁ deshana nāyakānām* |
> *upāya-kaushalya mamaivarūpaṁ yattāni yānānyupdarshayami* ||

Mm. Shastri distributed his Introduction in five sections dealing with a general account of Buddhist thought since its inception. Those are, 1. Doctrines of the differint *yānas*. 2. The three *kāyas*, 3. The Theory of *karunā* 4. The Prinuple of *yuganaddha* and 5. *Mahāsukha*. In brief, the learned editor precisely narrated what the compendium had. As a Tibetan-knowing scholar he located the Tibetan *lo-tsa-ba* transtators and the Indian Sanskrit-knowing *pandita* collaborater in respect to the works of Advayavajra, where available. That suggests that Advayavajra was familiar with the Tibetan *lo-tsa-ba* engaged in Tibetan translations of the Indian literature.

Mm. Shastri has laid emphasis in elaborating three groups of the *shrāvaka*. Those who devote to the question whether the *pudgala* is eterual or non-eterual belonging to the first group with mild efficiency engaged benign service for the individual. The second category among them may think 'a bit for others' by holding that a *pudgala* 'is neither eternal nor non-eternal. By means of the restraint of the respiration during meditations, 'the inpurity of the *Samādhi* consists in becoming comatic by means of *Kumbhako* and thus becoming stupid' (Introduction p. XXXi). And, the third gronp of *shrāvaka* endeavours to realize *shunyatā* the essencelessness of the *pudgala* or the indinidual.

Mm. Shastri further referred to the concept of three embodiments *tri-kāya* of the Buddha in the constitned form, *nirmāṇa kāya* the *sambhoga-kaya* embodiment in graceful manifestion. These two belong to the embodiment in forms *rūpakāya* 'referring to the bliss of Mahāyāna'. Above them, the embodiment of the Buddha *dharmakaya* free from 'illusion, pure, infinite like

CENTRAL LIBRARY

the sky' Mahamahopadhya Haraprasad differentiated three kayas as cited below:

"in the Madhyamika school, the *Nirmāṇa kaya* is without a break *(aparicchinna)* from the time of birth, by which Buddha performs varities of benovolent deeds for the benefit of the world, on all equally. The second or the *Sambhogakāya* of Buddha contains the thirtytwo princiepal and eighty minor physical signs, and it is in this kāya that Buddha enjoys the bliss of Maha-yana. The *Dharma-kāya* is the real kāya of Buddha." (Introduction XXXV).

Mr. H.P. Shastri raised a pertinent question "what is *mahāsukha*?" Apparently the problem of the *mahasukha* great pleasure is opposite to *duḥkha* the suffering in which a phenomenon is involved under the sequence of being constituted by cause, condition and fruits *hetu-pratyaya-phala*. Advayavajra focused on the above question in his *Mahāsukha-prakāshaḥ*. Advayavajra stated the character of Mahāsukha. Mm. Shastri confirmed that Mahaukha *mahasukhādvayam vaksye vastutattvam samasalaḥ Mahāsukha* is not the product of causes and conditions It is not produced but absolute (Introduction Xii).

Advayavajra, being a *siddhācarya* was accomplished in the principle of *yāganaddha* union of *shūnyalā* and *karuṇā* united together naturally. An irradiation of *shūnyatā* by the natnre of spreading out becomes the union, not by an intentional volition, The *Yuganaddha prakāshaḥ* reads:

shūnyatā-kṛpayoraikyaṁ vidheyaṁ na svakalpataḥ |
shūnyatāyāḥ prakāshasya prakṛtyā yuganaddhatā ||

(verse 8)

Mahamapadhyaya Haraprasad precisely remarked, "with externol and internal purity, the truth in which *prajñā* and *upāya* merge. The Yogi enjoys pleasure" (Introduction XXXViii)

In Mantranaya, otherwise Tantra, the five Ms. namely *mantra, mudrā, mūrti or devatā* in specific spheres *maṇḍala* and *mahāsukha* or *mahāmudrā* are relevant. Advayavajra pointed out that the irradiating effulgence of the pure mind in the manifestation will be glowing form *mūrti* or *devatā*. It has no self-nature. The text *Mahāsukha prakāsha* reads

sphūrtishca devatākārā niḥsvobhāvā svabhāvataḥ |
yathā yathā bhavet sphūrtiḥ sā tathā shūnyātatmikā ||

But, the fruition of volition accords when the mind drivles between duality and non-duality *dvaitādvaita-mano yacca tatra tad-vāsanā phalam* (verses 14-15)

In the language of Haraprasad Shastri, "If it is only produced by causes and conditions, it is neither existence nor *shūnyatā*. The manufestation of *shūnyatā* is in the form of *Devatā* which is naturally non-existent. Whenever there is manifestation it is a mamfestation of *shūnya*. When the mind rocks between duality and non-duality, Vāsanā is produced. The Yogi considering

himsllf as *Heruka* and standing as a worshipper for *Heruka* roams the world like a lion with *bhāva-s* for his Guru." (Intro. *XXXVIII*).

The true nature of siddḥa Advaya-vajra had been explicit in the edition prepared by Mm. Haraprasad Shastri. His achievement in this field is yet unsurpassable. We pay hamage to the celebrity.

APPENDIX

Contenls of the *Advayavajra-samgraha* ed. Mm. Haraprasad Shastri. Baroda, 1927.

1. *Kudṛsti-nirghātanam* (refutation of wrong theory with *mantra* and *gāthā*).
2. *Mūlāpattayaḥ Sthūlāpattayaḥ* (the root and the gross transgression of disciplinery rules. The text refers to the avowed discipline *sambara* for a Tantra practitioner.
3. *Tattva-ratnāvalī* (a row of gems regarding the Truth of dharma) available in Tibetan version, Tohoku Catatague no. 2240.
4. *Pañca-tathāgatā-mudrā-vivarama* (a description of gesticulations in respect to five Tathāgatas. Akṣobhya, Amoghasiddhi, Ratnasambhava, Amitābha and Vairocana manifested in graceful embodiment) available in Tibetan version, Toh. Cata. 2242.
5. *Seka-nirṇaya* or *Seka-nirdesha* (the nature of sacred bath for impregnation) available in Tibetan under the title *Saṁkṣepa seka- prakriyā.*
6. *Caturmudrā* (four gesticulations *mudrā*-s) the text was fourd along wirh other works ascribed to Advayavajra, with no caption. Mahamahopadhyaya Shastri named the text according to the content of the said work dealing with *Karma-mudrā* 1. The *mudrā* relating to karma actions done by body, speech and mind; 2. *Dharma mudrā* referring to *dharma* conventional reality of phenomena 3. *Mahāmudrā* caused by *dharmamudrā*. 4. *Samayamudrā* resulted by *Mahamudrā*.
7. *Sekatānvaya-saṁgraha* (a collection of modality and theme of the saered bath for impregnation) available in Tibetan version Toh. Cata. 2243.
8. *Pañcākārāḥ* (five Tathagatas along with five Yoginis to manifest in forms). *Hevajra Tantra* elaborates 2.4.46-47 fivefold forms of *abhisambodhi* referring to the Tathāgata.
9. *Māyānirukti* (explanation of illusion from the Tantra stanidpoint as a Yogin avails). Toh. Cata. 22.43.
10. *Svapna-nirukti* (explanation of dreams as an important instrument in spiritual progress). Mm. Shastri mentions that the colophon is silent of it author's name, thongh the internal evidence and style of composition support.
11. *Tattva-prakāshaḥ* (the light focused on the Truth *dharma*) as enunciated by the Yogācāra and the Madhyamaka regarding phenomena. Sanskrit manuscript omits author's name thongh Tibetan version records Advayavajra *gnyis med (pa'i) rod rje.* (Toh. Cata. 2241)
12. *Apratiṣṭhāna-prakāshaḥ* (a focus on the self-nature-lesness of *shūnyatā*.) as the knowledge with no thonght-constrnction for the Truth.
13. *Yuganaddha-prakāshaḥ* (a focus on the union of the *shunyatā* and *karuṇā*).

14. *Mahā-sukha prakāshah* (a focus on the great pleasure) by unification of *Shunytā* and *Karuṇa* Bodhi state.

15. *Tattva-vimshikā* (twenty verses on the Truth.).

16. *Mahāyāna-Vimshikā* (twenty verses on Mahāyāna). Its Tibetan version is available but different from Nāgārjuna's work of the same title.

17. *Nirbedha-pañcaka* (five verses on the self-nature of the Truth) Tibetan version Toh. Cata. 2238.

18. *Madhyamaka Ṣaṭka* (six verses regarding the Madhyamaka for negation of fourfold nature the phenomenal existence. Edited by the present author *Brahmavidya*. Adyar Library. Madras, 1964.

19. *Prema-pañcakaḥ* (five verses on inherent corelation of love) between *shūnyatā* the bride and its manifestation of phenomenal existenec the bridegroom *upāya* as conducted by the priest guru like the breath wind, having no Tibetan version.

20. *Tattva-dashaka* (ten verses on the Truth which is non-dual). Toh. Cata. 2336.

21. *A-manasikārādhārah* (meditation discerning the object-like *a*). This text is edited by the present author with Tibetan version. *Proc of All India Oriental Conference*. 1959, Pune pp. 93-107.

CENTRAL LIBRARY

THE CARYĀPADAS : A SAGA OF DISCOVERIES FROM HARAPARASAD SASTRI TO SASIBHUSHAN DASGUPTA

Dipak Kumar Barua

I

The discoveries of the *Caryāpadas/Caryāgitis*, 'Buddhist Mystic Songs', in two phases by Mm. Haraprasad Sastri and Professor Sasibhushan Dasgupta, the two great scholars of India, become sensational adding new chapters to the history of Bengali literature. If these *Caryāpadas* and scanned, it will be evident that they represent the two forms of Later Buddhism, two linguistic characteristics, and two methods of ritualism. But the underlying feature which finds these two sets of Buddhist mystic songs is that they belong to the same tradition and same legacy.

II

Mm. Haraprasad Sastri published in 1916 a small collection of Buddhist songs called the *Caryāpadas*, 'Songs of the Mystic Path', which he himself discovered in 1907 from the Library of the King of Nepal with the title *Hājār Bacharer Purāṇa Bāṅgālā Bhāṣāy Bauddha Gān O Dohā*, 'Buddhist Songs and Couplets in One thousand years Old Bengali Language', with the sub-title *Caryācaryaviniścaya, Sarojavajrer Dohākoṣa, Kāṇhapāder Dohākoṣa O Ḍākārṇava.*[1] This publication contains 50 songs. The original palm-leaf manuscript on which these songs are preserved has been, in fact, a commentary written by slob-dpon Thub-pas shyin or Ācārya Munidatta in which he himself quoted even some commented songs. Probably the original manuscript must have been longer as the commentary to the *Caryāpada* 50 is incomplete and the colophon found in the Tibetan rendering is not traced. Further, the version of the *Caryāpadas* originally commented by Munidatta is not identical with that of the available in the manuscript of Haraprasad Sastri. However, at the present stage, it is difficult to remark whether the commentary as originally written also included the text of the songs, which may have been emended later on by an unknown editor or whether the actual songs have been inserted after Munidatta has composed his commentary. So far the two manuscripts — one utilized by H.P. Sastri and the other one prepared for the Asiatic Society of Bengal — have been found and on the basis of these two manuscripts some editions of the *Caryapadas* have already been published.

It may be noted that the text of the *Caryāpadas* and its commentary made by Munidatta have been collected in the Tibetan *Bs-Tan-gyur (Tanjur, I)*. Only the text of the *Caryāpadas* as available in the *sNar-thaṅ* (Narthang) edition which is full of errors, has already been published by P.C. Bagchi. Other versions of its Tibetan text are found in the *sDe-dge* (Derge), Peking

and Chone editions. The colophon of the Tibetan rendering notes as follows: "Requesting instruction from the Mahāpaṇḍita Kīrticandra and depending on the kind care of the glorious Dharmasvāmins, the 'uncle-and-nephew' of Sa-skya it was translated by the Tibetan translator (*lo-cā-ba*), the monk Grags-pa rgyal-mchan in the town of Yam-bu (Kathmandu) in the land of Nepal". Although the exact year of the translation is not known yet, considering the approximate year of birth of Grags-pa rgyal-machan it may be presumed that the year of this Tibetan rendering should be between circa A.C. 1310 and 1334. Its Mongolian translation which is collected in the Mongolian *Tanjur* (Vol. 49, folio 292b-345a) under the title *Yabudal-un daryulal-un sang-un tailbouri* is preserved in the State Public Library in Ulan Bator, the metropolis of the Mongolian People's Republic.

It is important to note that H.P. Sastri's manuscript bears no title and so he refers to it as the *Caryācaryaviniścayaḥ*, 'The Determining of what is and what is not to be practised', which is neither found in the text itself nor seems to be appropriate to its subject-matter. But the title in the Tibetan translation is *sPyod-pa'i glu'i mjod-kyi'grel-be*, i.e. *Caryāgīti Koṣa-vṛtti*.

H.P. Sastri characterizes the language of these Buddhist mystic songs as 'Old Bengali'. He has indicated its language as *Sandhyābhāṣā*[2], 'Twilight Language'/'Twilight Speech', a language of light and darkness, signifying that the contents may be explained either by the light of day or by the darkness of night or the language expressed in an ambiguous and unclear manner in Old Bengali.

It is to be noted that of the total 50 songs, 30 contain a *bhaṇitā*, i.e. on end line in which the author mentions his own name, e.g. 'Kāṇha says...'. In fact, each song may be ascribed to a particular Siddha. But among these two songs are in reality anonymous — *Caryāpada* 17 may be ascribed to Vīṇāpāda and 14 may be ascribed to Ḍombipāda, actually Kaṇha. However, the names of authors of these songs are Luipā, Kukkurīpā, Biruā, Guṇḍurī, Cāṭila, Bhusuku, Kāṇhu, Ḍombi, Śāntipāda, Mahittā, Saraha[3], Ḍheṇḍhanapā, Bhāde, Jālandharipā, Tāḍaka, Kāṇhila, Kaṅkana, Jaanandi[4]. As to the date of these Buddhist mystic songs it is found that in these songs there is neither any reference to the Muslim invasion in Bengal nor any use of Persion or Arabic words. Hence it is reasonable to conclude that the songs have been composed before the Muslim conquest in this part of India, i.e. Circa A.C. 1200.

The fifty spiritual songs collected and commented on by Munidatta present only a small selection of what originally have been a considerable body of texts known as *Caryāpada* reveal a vivid imagery which is, in fact, the sugar coating of a bitter pill — the bitter pill being the inner significance of the songs. While it is really better to know the real meaning of these songs known as the *Caryāpada* display an extraordinarily rich imagery, faithfully portraying everyday life of the common people. Below is supplied.

as for example, the third *Caryā*-song of the first set of discovery by H.P. Sastri :

eka se Śuṇḍini, dui ghare sāndhaa,
cīaṇa na bākalaa, bāruṇī bāndhaa.
sahaje thira karī, bāruṇī bāndhaa,
je ajarāmara hoi diṛha, kāndha.
daśami duārata cihna dekhiā,
āila garāhaka apaṇe bahiā
caūśaṭhi ghaṛiye deta, pasārā,
paiṭhela garāhaka nāhi nisārā.
eka gharuli sarui nāla,
bhaṇanti, Biirua thira kari cāla.

'One is a liquor-maid, (yet) she enters two houses; (she has) neither yeast nor (powdered) bark, (yet) she produces liquor.

Making (it) naturally firm, produce liquor, so that having become free from old age and death, the body (becomes) incorruptible.

Having seen the sign at the Tenth Door, the buyer has come, (yet) he himself has brought. In the sixty-four pots the display is arranged; the buyer has entered, (but there is) no egress. One is the pitcher, its nozzle thin. Birua says : making it steady, pour it'.[5]

III

The *Caryāpada* with their commentarial expositions of the first attempt of discovery by Mm. Haraprasad Sastri belong to the Sahjayāna Sect of Buddhism. But the discovery of the second set by Professor Sasibhushan Dasgupta in 1963 reveals a major breakthrough in the discipline of the *Caryā*-songs which have convincingly proved that the followers of the Buddhist Vajra-yāna Sect have also composed some such mystic songs in the Bengali language. Thus this set of Vajrayāna songs have also become the most significant prelude to the Bengali literature. These one hundred *caryā*-songs (actually published ninety-eight) have been discovered by S.B. Dasgupta who has classified them into three groups, namely, the first one consists of nineteen songs which belong to the same genre as those compiled by H.P. Sastri; the second includes forty-five songs which have been composed in a period ranging between A.C. 12th and 16th; and the remaining thirty-six songs composed in Nepal are of later origin. These Buddhist songs have originally intended to be sung as is evident not only from the term *Caryāgiti* itself, but also from the fact that a *rāga* is indicated for each song which contains a *dhruvapada*, 'refrain', revealing that a chorus alternated with a soloist. S.B. Dasgupta who has collected and compiled this second set of the *Caryāpada* are still being sung by the Vajrācāryas of Nepal to the accompaniment of dance and instrumental music and to a special melody. These newly discovered songs are generally known in Nepal as *cacā/cācā* (*caryā*) - songs. But till

CENTRAL LIBRARY

date these newly discovered Buddhist mystic songs have little been discussed mainly because the scholars of the Bengali literature in general and those of Buddhist literature in particular, have not yet shown much interest on them and also these new *caryāpadas* are available only in one single volume titled *Nava Caryāpada* in the Bengali language and script not earily accessible to those who are not conversant with them.[6] Hence the present author has prepared, having maintained the same sequence and dates of composition of these songs as proposed by S.B. Dasgupta in his typscript before his sad untimely demise in 1964, an anthology of this new set of Buddhist mystic songs in the Roman Characters with their English rendering and annotation with the title *New Vajrayāna Mystic Songs Discovered From Nepal : A Study on the Nava Caryāpada with Text and Translation* for publication, during his stay in the Department of Pali and Buddhist Studies of the Banaras Hindu University Varanasi, as the Visiting Professor in 2002-2003 with the hope that in future serious scholars would take up this set of the Vajrayana songs also for their study and research and try to trace out its commentary and Tibetan version, if any, for the proper interpretation of the same. These ninety-eight Vajrayāna mystic songs appear to the very significant from the following historical reasons :

(i) The discovery of these mystic songs collected in the *Nava Caryāpada* becomes a senstional event, since it shows that the followers of the Vajrayāna Sect of Buddhism have composed mystic songs also in Bengali and *not* exclusively in Sanskrit as thought before this discovery.

(ii) These mystic songs of the *Nava Caryāpada* are so far probably the last additions to the Tantric Buddhist literature in the Bengali language.

(iii) The subject-matter of most of these songs is presented in the backdrop of the *Sammohana-Tantras* of the 14th Century A.C., although similarities between them and the Tantric Buddhist text titled *Ḍākārṇava* composed after the 12th Century A.C. are also prominent in some instances.[7]

S.B. Dasgupta is his maiden speech on this discovery delivered in the Conference Room of the Bangiya Sahitya Parishat, Kolkata, on September 07, 1963 remarked as follows :

"Ācāraya Haraprasad Sastri, Dr. Prabodh Chandra Bagchi and Paṇḍita Rāhula Sankrityāyana have discussed on the *Caryāpadas* and *Dohākoṣa*. I have obtained many evidences in favour of the information and theories advanced by them. Rahula Sankrityāyana has mentioned the *Dohās* of Sarahapāda... I have seen those verses.

The verses or *Vajragītis* compiled in the *Hevajra-Tantra* are now known as the 'Kolai Gān' in Nepal.

It appears to me that *Caryāpadas* of Haraprasad Sastri form the collection of some selected fifty verses. The verses are virtually faultless — in metres, in expressions, in sentiments. I think that they are the jewels of the *Caryā*-songs... I consider that the *Caryāpadas* have been composed even after the twelfth century. There are, of course, also many other *Caryā*-songs from those discovered and discussed by the above-mentioned three great scholars. I have the evidences in favour of my supposition. I have obtained three new *Padas* in my collection :

1. The *Pada* with Sugta-bhaṇitā

E mahimaṇḍala meru samudrā
dhana jana jauvana udavindu candrā
pekhure anudin loane gaane
phulla parihāsai Jinaguṇa raane
Skandhe dhārī indiviṣaya sabba ekā
samudra taraṅga jimu eku anekā
pavana dui bhedivā dṛḍha thire ciā
jvalai vajrānala daha diha dahiā
Sugāta bheda bhāvaiā na hoi re śodhā
Sugata bhanai acintyālaya bodhā (Song 5)

2. The *Pada* with Macchindra-bhaṇitā

Pahu maitrī bhuvi vajra ahoma śunna sahāva
tajhu via ehi niti sabba sattavahi toa. etc. (Song 7)

3. *Ḍombinī sarovara vilāsai kaise*
evaṃkāra kamale jagaṭa nibbāsie. etc. (Song 8)

These ninety-eight *Caryāpadas* of the second series would reveal some new indications in the language and metres. They would form a bridge between the old and the mediaeval Bengali literature...

Till recently we knew that the first poet of the *Caryāpada* was Luipā (10th Century A.C.), the last poet was Kāṇupā (12th Century). But now we see that the first poet was Sarahapā (middle of the 9th Century), the last poet was Kāṇupā (12th Century). It would, therefore, not be wrong to remark that the *Caryā*-songs had been composed in a period covering three hundred years.

Mithilā-Orissā-Magadha-Kāmarūpa-Rāḍha, Gauḍa, Vaṅga — in this vast tract of land due to the influence of the language of the *Caryāpada*... from the 12th to 14th-15th Century Vrajalruli (literary language) grew up."[8]

The above statement made by the discoverer, Professor Sasibhushan Dasgupta. These ninety-eight new *Caryā*-songs would undoultedly open a new horizon of Buddhistic Studies in India and abroad.

IV

In fine, it may be remarked that the sensational discovery in 1907 made by Mm. Haraprasad Sastri of the *Caryāpadas* which belong to the Sahajiyā Sect

of Buddhism[9] and the some of the Vajrayāna Sect disccovered in 1963 by Professor Sasibhushan Dasgupta is but a continued process of researching the earliest Bengali literature. Belonging to the two different Sects, they have one similarity being Buddhistic in contents. These two discoveries by two eminent scholars of India have unfolded a new chapter in the history of Bengali language and literature since these Buddhist mystic songs represent the earliest specimens of Bengali literature. Hence the journey that commences through the discovery of the first set of the *Caryāpadas* by H.P. Sastri has further been accelerated with another discovery of the same by S.B. Dasgupta.

End Notes and References

1. Sastri, Mahamahopadhyay Haraprasad. *Hājār Bacharer Purāṇa Bāṅgālā Bhāṣāy Bauddhagān O Dohā (Caryācaryaviniścaya, Sarojavajrer Dohākoṣa, Kāṇhapāder Dohākoṣa O Dākārṇava)*. Calcutta Baṅgiya Sāhitya Parishat, B.S. 1388, pp. 1-20.
2. Mukhopadhyay, Tarapada. *Caryāgīti*. Calcutta, Visvabharati, 1965, pp. 37-43.
3. Dasgupta, Sasibhushan. *An Introduction to Tāntric Buddhism*. Calcutta, University of Calcutta, 1974, p. 127.
4. Mahathera, Sri Jyotiḥpāla. *Caryāpada*. Chittagong, Bangladesh Bauddha Samiti, 1990, p. 10.
5. Kvaerne, Per. *An Anthology of Buddhist Tantric Songs : A Study of Caryāgiti*. Norway, Oslo, Universitetsforlaget, 1977, pp. 81-82.
6. Dasgupta, Sasibhushan coll. & comp. *Nava Caryāpada, ed.* by Asit Kumar Bandyopadhyay. Calcutta, University of Calcutta, 1989, pp. 1-10.
7. *Buddhist and Indian Studies : In Honour of Professor Sodo Mori*, Japan, Hamamatsu, International Buddhist Association, 2002, pp. 544-545 (Barua, Dipak Kumar. *Some Newly Discovered Mystic Songs from Nepal : A Study on the Nava Caryāpada*).
8. Dasgupta, Sasibhushan *coll. & comp. Nava Caryāpada* (1989), pp. 98-102. (*Nepāle Navāviṣkṛta Caryāpada*).
9. Hai, Muhammad Abdul and Pasha, Anwar *eds. Caryāgitikā*. Dhaka, Student Ways, 1980, pp. 1-3.

CENTRAL LIBRARY

A NOTE ON THE READING OF A CARYĀGĪTI

Satya Ranjan Banerjee

The old Bengali text, popularly known as *Caryāgīti*, was discovered and edited by Mm. Haraprasad Shastri in 1916 (= Bengali era 1323). The name of the book as given by Shastri is *Pācīna Bangālā Bhāṣāya Bauddhagāna O Dohā*. The book was subsequently edited with notes and translation by Prabodh Chandha Bāgcī (1938), Md. Sahidullah (1928), Sukumar Sen (1948), Rahul Sāmkṛtyāyana (1957), Tarapada Mukherjee (1963), Nilratan Sen (1978), Per Kvaerne (1977) and so on. Suniti Kumar Chatterji (1926) studied the language of the text. Each one gives the name of the book differently, though the main text of the book remains the same. Except in a very few cases, each scholar has tried his best to improve the reading of the text in their own way. From the translation and the interpretation of the text, we come to know that there are some cases where the reading of the text is incongruous. Here in this paper I am discussing one of such readings of the *Caryāgīti*.

In the very first song (*stavaka*) of the *Caryāgīti* the readings of the following two lines seem to be somewhat anomalous. The passage in question runs thus :

eri(e)u chāndaka bāndha karaṇa pāṭera āsa |
sunupākha bhiti lehu re pāsa ||

The meaning of this passage following the Bengali translation of H.P. Shastri would be something like this:

"Avoid (*eri(e)u*) the bondage (*bāndha*) of desire (*chāndaka*) and the hope (*āsa*) of the excellence of your senses (*karaṇa pāṭera*), accept (*lehu*) the nearness (*pāsa*) of the side (*pākha*) of your emptieness (*sunu*)".

This meaning, whatever may be its philosophical inplication, does not seem to be very happy. The reading *bhiti lehu* "come close (to you)" does not seem to be consistent and coherent. In some editions I have seem the reading *bhiti loha* which seems to me better than the earlier one. The word *bhiti* (< *bhitti* > *bhiti*) means "foundation" and *loha* (<*lobha*> Pkt. Apa. *loha*) means "desire". Therefore the meaning of *bhiti loha* is "the foundation of desire."

Another difficulty with the meaning of the reading is with *pākha* and *pāsa*, both meaning "side" in the same line. That is why, some scholars want to take the word *pākha* in the sense of "fan" on the analogy of the modern Bengali *pākhā*. I personally belive that the word *pāsa* is not used in the sense of "side". And, perhaps, that is not the intended meaning of this word in this particular context. I think that the word *pāsa* (imperative singular) could be taken in the sense of "behold, see". The evolution of the word is Skt. *paśya*> Pkt. Apa> *passa*> *pāsa* which is used in Prakrit and Apabhraṁsa every now and then. We must not forget one thing that the date

of *Caryāgīti* ranges between 700 and 1200 A. D., and that is the period of Apabhraṃśa also, and therefore, there is every possibility that the language of *Caryāgīti* could not shake off the fetters of Apabhraṃśa. To clarify some linguistic points of *Caryāgīti* it would be worth while to consult some contemporary literature, the major bulk of which is in Apabhraṃśa. Most scholars, if not all, have refused so far to recognize that some writers of the eastern school of Prakrit grammarians have recorded features of Apabhraṃśa which closely correspond to the language and vocabulary of *Caryāpadas* (e.g. *sāṇe, cikhila*. etc.).

The word *pākha* coming from Skt *pakṣa*> Pkt. *pakkha*> old Bng. *pākha* means "side". Therefore, the line means—

"behold, the foundation of desire (is) empty (*sunu*) on your side (*pākha*)."

In conclusion, I can say that there are other cases as well where some of the readings could also be adjusted in a similar way.

BUDDHISM IN BENGAL–A BRIEF HISTORICAL SKETCH AFTER MM H.P. ŚĀSTRĪ

Devaprasad Guha

The history of Bengal of hoary past is yet to be ascertained. However, without referring to the source, Mahamahopadhyay Hara Prasad Sastri opined that even before the advent of the Aryans in the Punjab Valley there used to live in Bengal somewhat advanced people whose principal occupation was to tame elephants. With the tamed, they used to move about in the region lying between the Himalayas in the north to the Bay of Bengal in the South. With deep regret, we submit that they are not to be found any longer.

The Ṛgveda is totally silent on Bengal. However, the *Aitareya Brāhmaṇa* speaks of three ethnic races, to wit, Vaṅga, Vagadha and Cera. Though some scholars are found reluctant to recoginse them, yet it is a fact that a pretty large number of erudites hold the view that the last one—Ceras—formed a sizeable section of the Dravidian people then residing in Bengal. Still now are found in Bihar some rather backward people who claim descent from them. Some anthropologists opined that in Bengal there used to reside then a Dravidian race called Bang. Incidentally, it may be said that according to the Census Report of 1901 a fairly big chunk of present day North and West Bihar belonged to Bengal at that time. The Vagadhas, so says Mahāmahopādhyāy, happened to be the ancestors of the Vagdīs of Rāṛha; further, he came to learn that when those people spoke amongst themselves, they used to speak a language which was anything but Bengali. Prof. Sukumar Sen differs. According to him, the word Vagadha can under no circumstances be reduced to Vāgdī. He is also not prepared to accept that the tongue used by the Vāgdis is not the same with Bengali. Then again there are scholars who believe that both Vagadha and Magadha happened to be one and the same race. It may also be noted that according to some Vedic texts brahmins who used to live in Magadha, no matter for how long, were reckoned as fallen ones.

Besides the aforesaid three, there used to live in North Bengal another three sects known as Kirātas, Pauṇḍras and Kaivartas. In Vedic texts they have been described as *dasyus*, a fact which suggests that they were considered inimical by the Aryans. At present the Kirātas reside at Darjeeling and also in the mountainous regions of Nepal. In the latter they are called Kirāntis. The Puḍas of Malda today happen to be the descendants of the old Pauṇḍras. Puṇḍravardana, their capital, was once one of the big cities of Bengal. The Kaivartas were once very powerful there. Ballālasena, father of Lakṣmaṇasena, divided the Kaivartas into two units, one of which was kept in North Bengal while the other was placed on the border with Orissa. The Census Reports of early years testify to the fact that the Kaivartas formed the majority of population amongst the then existing sects of Bengal.

CENTRAL LIBRARY

Well before the advent of the Buddha, so it seems, most of these sects, if not all, used to live in Bengal. This assumption is based on the fact that most of the Tīrthaṅkaras used to resīde in Bengal, particularly in Rāṛha region, practised meditation and attained salvation.

European scholars in general are of opinion that both Jainism and Buddhism owe their origin from Sāṃkhya. It is pretty well-known that Kapila, the founder of this branch of philosophy had his hermitage situated very much in Bengal. Parenthetically it may be said that names of places pretty often suggest points very much relevant to history. Incidentally, in the Khulna district of British Bengal there is a village by the name Kapilmuni. Then again, every religious minded Hindu is aware that on Makar Saṃkrānti day, i.e., the last day of Poush, devotees from very many parts of India visit the estuary of the Ganges which is popularly known as Gaṅgāsāgar, to take a holy dip for attaining salvation. There stands a hermitage called Kapil Munir Ashram.

In the earlier days of life, Gautama Buddha was said to be a follower of Kapila, a fact clearly pointed out by Aśvaghoṣa in his *Buddhacarita.*

Kapila was a dualist, while the Vedic sages were non-dualists. Śaṅkarācārya has dubbed Sāṃkhya as uncivil (aśiṣṭa). Centuries after Śaṅkara, Hemādri, a celebrated South Indian Pandit and a minister to the king of Devagiri, old name of Aurangabad, made distinction between Sāṃkhya and views of Kapila. According to him the position of experts in Sāṃkhya was higher than those versed in Kapila's thoughts. He held that the followers of Kapila should not try to sit in the same row with the brahmins, a fact that suggests that the Vedic ṛṣis and their successors were not at all well-disposed towards the Bengalees.

Now arises the important question, when did the brahmins enter Bengal for the first time? According to the Mahāmahopādhyāy, the event took place in A.D 436 when Kumāragupta was the sovereign of Bengal and donated a piece of land to a brahmin in the Rajshahi district. The fact is substantiated by the Kalaikudi-Sultanpur copper plate which says that the number of brahmins who entered first were only three. About hundred or one hundred and fifty years later, according to the Faridpur Copper-plate grants, a few brahmins were found living in Faridpur district on lands bequeathed to them. Rākhāldas Bandyopādhyāy, the celebrated archaeologist and an esteemed historian, refused to accept the grants as genuine. Many a historian found it difficult to subscribe to his contention. Assuming that the grants are not genuine, under no circumstance we are assure the presence of brahmins in Bengal during those days. It is well-known that during the days of Ādiśūra five brahmins came to Bengal from Kanauj. When did the five brahmins arrive in Bengal is still a matter of conjecture. Yet, following the records of the ancient match-makers (ghaṭakas) it may be hazarded that the brahmins came in Śaka 654, i.e., A.D. 732. During those days a great agitation was on.

CENTRAL LIBRARY

Kumārila Bhaṭṭa was trying to establish Brahmanism after composing a commentary on Śabara-bhāṣya of the Mīmāṁsā-Sutra. Bhavabhuti, the celebrated poet, was his disciple, as also the leader of the Brahmins of Kanauj. It then had a powerful King, a brahmin by faith. As such it is in no way surprising that a few brahmins from Kanauj would come to Bengal, then a non-brahmin territory and would try to proselytise people to their own faith. They met there only 700 brahmins who were brahmins only in name. They were absolutely ignorant of the Vedic rites and rituals.

It is worth noting here that with 700 incompetent and only five competent brahmins a territory cannot carry on with essential necessities. So, it becomes more or less obvious that there were in that region people of other faiths as well. It is also obvious that they had their preachers. The Chinese pilgrim Hiuen Tsang, who had been in India during the period 629-45 A.D., said that when he was staying in this country there were more or less one lakh of Buddhist monks residing in monastic establishments. For their maintenance, responsibility lay entirely with their devotees, the lay-followers.

According to the strict Vinaya rules, a Buddhist monk was to depend on alms collected through begging alone. At the most the monk could approach only three houses a day. Besides, he was not permitted to collect alms from the same family more than once in a month. Thus, to maintain a monk for a month one hundred families were needed. So, for one lakh monks as much as one crore of *dāyakas* were necessary. Indeed there were as many as that. The Buddhist monk, therefore, did not have to care for followers of other faiths.

It is of course difficult to say when Buddhism was first introduced in Bengal. But the place where it did was not very far from it.

Bengal of the day had two cities worth mentioning. They were Puṇḍravardhana and Tāmralipta. That the earlier one was a Buddhist settlement is evident from the fact that the Maurya Emperor Asoka quite successfully encouraged his brother Vītaśoka to become a Buddhist monk, and made him reside in a monastery in Puṇḍravardhana. Tāmralipta too was a pretty big settlement of Buddhist populace. Besides, it was the port from where illustrious Buddhist monks went to South and South-East Asia to propagate the teaching of the Master. Mahendra and Saṅghamitrā, son and daughter of Asoka too used Tāmralipta port to go to Laṅkā as Buddhist missionaries. Moreover, it was from this port merchants used to take to boats to travel to South-East Asia to trade.

Morality (Sila) and discipline (Vinaya) formed the core of Buddhism at the early stage. In course of time, however, Hīnayāna had to give way to Mahāyāna. At that stage icons were introduced. With the passing away of time, their numbers went on increasing. Postures too became varied which included even erotic ones. The strictness that was noticed at the initial stage became a thing of the past, and became easy. Common people became pleased,

and the religion got the appellation Sahajayāna, thereby implying that it was the easier path to salvation. Being pressed by the Sahajiyā cult, the one time valorus Bengalees became incompetent and timid. And at this time the Khiljis of Afghanistan attacked Bengal, demolished the Buddhist monasteries, broke the images, and killed the monks indiscriminately. Sahajiya cult too became lost.

With the Mohammedan conquest, Buddhism and their followers suffered the most. They lost all that they possessed. Those who survived the attack of the Muslim sword became broadly divided into two groups. Half of them adopted Islam as their faith, while most of the others became subservient to brahmins and they were turned into pariahs and untouchables. Gradually they forgot *prajñā, upāya* and Bodhisattva. They forgot Śūnyavāda, Vijñānavāda and Karuṇāvāda. They forgot philosophy as also Morality (Sila) and Discipline (Vinaya). Thus the Buddhists were left with a small number of foolish monks and some married priests who went by the name of Rāulī monks. These people conceived of a divinity which they name as Dharmaṭhākur. The appearance of this so-called divinity was like that of a tortoise which, as is well known, have four feet and a neck. The newly conceived divinity formed on a raised ground with four *dhyānī* Buddhas at four cardinal points and the fifth *dhyānī* Buddha in the south-east corner. Thus this stūpa-like object looked like the abode of *dhyānī* Buddhas and was considered to be the embodiment of Dharmaṭhākur. They are still in existence. Some credulous people are maintaining them. This so-called divinity is fond of outcastes alone. Amongst them the Ḍomes, a lowly lying community performed the pūjā of the Dharmaṭhākur. In Bengal no brahmin priest was necessary. This is precisely the end of Buddhism that was preached by the Buddha. This was precisely the contention of Mahāmahopādhyāy Haraprasād Śāstrī.

CENTRAL LIBRARY

HISTORY OF PRE-TURK BENGAL : HARAPRASD SHASTRI'S CONTRIBUTION

Bhabatosh Datta

'The people of Bengal have forgotten their own past'—so said Pandit Haraprasad Shastri. The statement has become almost proverbial among us. This statement was made at a time when Haraprasad himself was engaged in digging the past and unearthing many facts and achievements of the Bengali people. Of course, his scholarship was not limited to the history of Bengal only. He was a great authority on Buddhist history and philosophy, a thoroughly adept in different branches of Indological studies like kavya, nyaya, purana etc. But his contribution to the history of Bengal and Bengali literature will never be surpassed. His contribution covered many branches of Sanskrit and Pali Studies. We Bengalis are especially indebted to him for two unforgettable contributions viz. the discovery of the earliest specimen of Bengali language and recovery of early history of Bengal before the coming of the Turks in the thirteenth century.

We were aware of two ruling dynasties, the Palas and the Senas (8th -12th Centuries) before the Muslim invasion of Bengal. But facts about these dynasties remained less known for a long time. In 1780 Sir Charles Wilkins discovered an inscription known as Badala Inscription. In 1788 he published a translation of this inscription in the Journal of the Asiatic Society of Bengal. In 1807 Colebrook translated the Amgachi Inscription of Vigrahapaladeva III (1055AD). From these two inscription we could somehow form an idea about Pala kings of Bengal. Charles Stewart in his History of Bengal (1813) wrote:

"Although the Hindus of Bengal have an equal claim to antiquity and early civilization with the other nations of India, yet we have no authentic information respecting them during the early ages of their progress; nor is there any other positive evidence of the ancient existence of Bengal, as a separate kingdom, for any considerable period, than its distinct language and peculiar written character".

Stewart gives practically no account of the Palas in his book. In 1838 J.C. Marshman wrote a small chapter in his History of Bengal but the Pala kings hardly found serious mention in his book. Marshman referred to three important capital cities of ancient Bengal, Gauda, Sonargaon and Satgaon. Adisur and Sena kings were there but Palas were absent. Sena kings left a tradition by way of kulina system, and a genealogical literature of doubtful authenticity. Fragments of history of the Sena kings were left by Minhajuddin. Muslims were historically conscious people and thus it was comparatively easy to construct an outline of the history of the Sena kings. But as for the Palas we knew very little of them.

Rajendralal Mitra (1822-1898) was one among the antiquarians who thought seriously about it while he was engaged in deciphering the copperplate

inscription of Binayakapaladeva. He had already made serious attempt to restore the history of the Sena kings also. He had produced an article 'On the Pala and the Sena Dynasties of Bengal' which was later included in his Indo-Aryan, Vol-II (1881). But about the Pala kings not much facts were available excepting that of copperplate inscriptions. Rajendralal's archaeological research about Mahendrapala appeared not later then 1886. Mahendrapala was the son of Bhojaraja.

Sometime in about 1886 Haraprasad came in close contact with Rajendralal. He worked as his research assistant. Rajendralal Mitra's wellknown book 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' came out in 1882. He affectionately recalled his indebtedness to his young friend in the preface. Haraprasad was initiated in manuscript handling; later on it developed into a habit with Haraprasad. Rajendralal trained Haraprasad to apply modern method in historical research. Rajendralal was in charge of the manuscript collection of the Asiatic Society. Since 1870 the descriptive catalogue of the Society's collection began to be published. In 1891 after the death of Rajendralal Haraprasad was put in charge of the manuscript collection. Haraprasad travelled widely in search of the manuscripts. He visited Nepal four times. It was at one of these occasions that the invaluable Charyapadas, the earliest specimen of Bengali language and along with it Sandhyakara Nandi's account of the Pala kings, the Ramacharita-manasa was brought to light by Haraprasad Shastri.

The great importance of Sandhyakara Nandi's Ramacharit–manas* a lies in the fact that excepting Kalhana's Rajatarangini it was the only book worth the name of what we call history in the whole range of Sanskrit literature. In Sanskrit 'itivritta' was acclaimed but there was no such thing as 'itihasa' or history. Of course there was no dearth of kavyas describing the plight of kings and princes in Sanskrit like Harsha–charit, Gauda-vaho, Navasahasanka charita, Vikramankacharita, Kumarapalacharita etc. Ramacharita-manasa was written following the line but as a historian has said:

'This unique historical document enables us to give a critical account of the history of Bengal for half a century (1070-1120AD) with wealth of details such as are not available in regard to any other period.'

It is a matter of great self-complacency that Ramcharitmanasa is a storehouse of facts of incomparable importance because it was written by one who had direct knowledge of what happened at that time. It is the only manuscript-text which records the first-hand reports. Haraprasad brought the text from Nepal in 1897. A short notice of that manuscript was published in the proceeding of the Asiatic Society of Bengal vol III in 1910.

---

* The text was edited by Haraprasad Shastri and published by the Asiatic society of Bengal. It was re-edited with commentary and English translation by R.C. Majumdar, R.G. Basak and Nanigopal Banerji and was published by Varendra Research Society.

"It is a curious work. It is written throughout in double entender. Read one way, it gives the connected story of the Ramayana. Read another way, It gives the history of Ramapaladeva of the pala dynasty of Bengal. The story of Ramayana is known, but the history of Ramapaladeva is not known fortunately the Ms contained not only the text of the Ramacharita, but a commentary of the first canto and of 36 (really 35) verses of the second. The commentary portion of the manuscript then abruptly came to an end. The commentary as may be expected, gives fuller account of the reign of Ramapala than the text"

Such poetic composition with double meaning is called 'Slista Kavya'. To restore the meaning out of such composition is quite difficult. Sandhyakara Nandi describes himself as Valmiki of the Kaliyuga. Like the Uttarakanda of the Ramayana the fourth chapter of the Ramcharita is known as Ramottara charita.

Between eighth and twelfth centuries A.D. there were two remarkable periods of the Pala kings, one that of Dharmapala and another of Rampala. Besides, there was another fascinating account of how the Palas came to power. Dharmapala's reign was the period of expansion of empire, prosperity and valour. It is not described in the Ramacharita. Ramacharita is the account of Ramapala (ascending the throne in 1047 AD) who was twelfth in the line of succession after Dharmapala. Incidents during the reign of Dharmapala are known from the Khalimpur copperplate issued in the thirty-second year of his reign. This Pala dynasty was founded by one Gopala in 750 AD. At a time when Gauda or Vanga was torn with strife and disorder, the people of Bengal unitedly chose Gopala, son of Vapyata and grandson of Dayitavishnu as their king. This memorable incident is first known from Khalimpur copperplate. This remarkable episode has been later mentioned in Lama Taranath's celebrated work History of Buddhism in India. We do not know Gopal's other particulars but the fact remains that a long line of Pala kings followed until Sena dynasty came to power.

The second great incident in the ancient history of Bengal was the recovery of Varendra by Ramapala described in detail in the Ramcharita. Mahipala (1070-75AD), a decendant of Gopala was defeated by the rebels. Varendra, a part of his kingdom, was snatched away by Dibboka, a Kaivarta by caste. This is known as Kaivarta rebellion in the history of Bengal.

The sources of these facts and information are stone and copperplate inscriptions. There was a third source later historians have taken recourse to. This is the genealogical literature or Kulapanji. But Haraprasad did not take this Kulapanji into serious consideration. For, he looked for what he called 'pahture pramana'—proofs as stone. And so Ramacharita being almost a contemporary record he held it invaluable and authentic.

When Vigrahapala III (1055-1070) was reigning in Magadha and Gauda, the outside invasion had begun. He had three sons, Mahipala II, Surapala II and Rampala. Mahipala on ascending the throne sent his two brothers to prison.

because he suspected that they were involved in a conspiracy against him. The vassals of Varendrabhumi i.e. north Bengal rose in revolt. Mahipala died while fighting them. Divvya was the leader of the rebels. He assumed power. He has been referred as a 'dasyu' a or robber in the Ramacharita. In Ramacharita he is called Dibboka. After the death of Mahipala his brother Surapala II ruled for sometime. Next came Ramapala. He found his kingdom disintegrating. His actual area of control was very limited - probably the delta between the Bhagirathi and the Padma.

Ramapala, on assuming the power tried to recover his fatherland i.e. Varendra. Sandhyakara referred to Varendra as 'Janakabhu'. The story of recovering the fatherland is the central theme of the Ramacharita. The organizing power, his skill in warfare and patience have remained a matter of glory to the people of Bengal. The Kaivartas were a powerful people. Ramapala could have hardly succeeded in dealing with them. Intending to mobilize the Samanta chiefs against Kaivartas he went around Gauda and Magadha. He received special help from his maternal uncle Mathana, the chief of the Rastrakutas. His two sons were Kanaharadeva and Suvarnadeva. Mahapratihara Shivaraja, his nephew, was a great help to Ramapala. Thereupon Rampala with a large contingent of army crossed the Ganga from the south and attacked Bhima, the Kaivarta king. Bhima was the son of Rudoka, brother of Dibboka. Bhima was defeated, captivated and killed.

Ramapala got back his kingdom after a long time. Peace and order were restored. A new city, Ramavati, was founded. He conquered many lands Vanga Kamrupa on the east, Utkala and Kalinga on the South. It was during his reign that Karnataka tried to spread supremacy over Bengal. Ramapala stood on their way. Ramapala fought the Gaharabal rulers of the present Uttara Pradesh. In all probabilities Ramapala won the battle. Kumaradevi, the queen of Gaharbal king Gobinda Chandra happened to be the granddaughter of Mathana. Most probably it was due to Mathan's mediation that the two kings became friendly. Ramapala was related to Mathan but more than him nobody was a greater well became firendly wisher of Ramapala. Ramapala in his old age abdicated his throne in favour of his elder son Rajyapaladeva. He of course, continued to live in Ramavati. When he was at Madgaragiri or modern Mungher, the news of Mathana's death reached him. Ramapala on coming to know this sad news courted death by drowning himself in the Ganga. Ramapala ruled for more than fourty five years.

Sandhyakara Nandi immortalized the glorious events concerning Ramapala by putting this account on record in his book. Sandhyakara used to live close to Varendra Paundravardhana. His father Prajapati Nandi was the Sandhi-Vigrahik of the king Ramapala. And so the account left by Sandhyakara Nandi can hardly be disputed.

Haraprasad's discovery of Ramacharita has made available to us the political history of a less known period. But as a historian he was more interested in the religion society and culture. It is due to him that we now

CENTRAL LIBRARY

can form a general impression about the social condition of Bengal before the Turks came. In Nepal he discovered a mass of Buddhist Sahajia cult which included the specimen of Bengali language. It was composed at a time when the modern vernacular languages were just emerging out of the Middle Indian languages. That was his perennial contribution to the history of Bengali language and also Bengali literature. Apart from the linguistic interest, his knowledge of the then social and political life made his own novel 'Bener Meye' (The Merchant's Daughter) most lively and interesting. Details of life and society of Gauda-Vanga and Varendrabhumi, their geographical and economic condition were depicted with extraordinary skill and insight. We get vivid picture of the Bengali social life of tenth - eleventh century.

Coming back from Nepal Haraprasad published a very significant paper 'Discovery of Living Buddhism in Bengal' wherein he pointed out the Buddhist elements still now lingering in our popular customs, cults and practices. He traced these in hoary past when Buddhism was undergoing changes in the seventh, eighth and nineth centuries, and a new form of Mahayana Buddhism was taking shape. The classical Buddhism mixed with the Sahajiya cults resulted in the Sahajiya Buddhism. This type of Buddhism was prevalent during the Pala rule. Songs and Dohas began to be composed in the vernacular languages.

Shastri thought that both Dohas and Charyas were in Bengali. But Dr. Suniti Kumar Chatterji after making critical studies arrived at the positive conclusion that only the language of the Charyas is Bengali and that of the Dohas is Apabhramsa Prakrit. As regards Charyapadas their total number should have been fifty. But three songs, 24,25 and 48, having been lost, the total number of Charyas stand 47. The missing songs, however, had been traced in Tibetan translation. The composers of these songs were Lui, Kukkuri, Dumbi, Santi, Sabara, Darika, Bina, Birua, Gundari, Chatila, Kamali, Mahidhara, Aajadeva, Dhendhana, Tanti, Bhade, Tadaka, Kamkana, Jayananda, Dhama, Saraha, Bhusuku and Kanhu. The identity of these composers cannot be fixed with certainty. Admittedly Lui is the oldest being a contemporary of Dipankar Srijnana.

These Dohas and Charyas remind us of the later day Baul songs of Bengal. Bauls do not believe in caste and creed. They abhor all religious practices and rituals. "that characterise the Buddhist and Jaina songs and dohas. It is a very noteworthy phenomenon in the history of vernacular literature of India. For here we find the inception of the new type of literature which grew abundantly in many parts of India during the medeaval period and the type is not extinct even in modern time. This type of literature is generally known as Sahajia Maramia school of literature. The Vaisnava Sahajiyas of Bengal and the host of village poets roughy known under the general name of Baul belong directly to the same school of thought.*

* Dr. S.B. Dasgupta, Obscure Religious Cults, 3rd 1969, riprint 1976, P 60-61.

CENTRAL LIBRARY

Haraprasad Shastri's discovery of these Buddhist mystic songs therefore has opened up the source of such literature whose presence could not have been explained otherwise. While Shastri's discovery of Ramachritmanasa has helped us build up the political history of pre-Turk Bengal, the discovery of other manuscripts also have helped us trace the origin of a very important and significant branch of our culture. There was another important cult. The Natha cult also had its origin in these Buddhist Sahajiya mysticism. It goes to his great credit that Shastri could restore the identities of many Siddhacharyas who composed these songs and made it possible for later researchers to add further facts and information. It has been possible now to get glimpses of life and society of Bengal before the Moslem rule.

Bibliography

1. The History of Bengal vol I, Dacca University
2. Hajar Bachhrer Purana Bangla Bhashae Bauddha Gan O Doha, Bangiya Sahitya Parishad, Kolkata, 1951.
3. Obscure Religious Cults by Shashi Bhusan Das Gupta Firma K.L.Mukherje, Kolkata 1976.
4. Kirtiryasya by Bhabatosh Datta, De's Publishing, Kolkata 1995.
5. Banglar Itihas-Sadhana by Prabodh Chandra Sen, Paschim Banga Bangla Akademi, Kolkata 1997
6. A Man Without Mask-Professor Khageshwar Mahapatra Felicitation volume, Bhubaneshewar, 1998. Dohas and Charyas : Literature of Protest in the Tenth Century Bengal'- article by Bhabatosh Datta.
7. Bangalir Itihas by Nihar Ranjan Roy, Book Emporium, Kolkata 1356 B.S.(=1949).

CENTRAL LIBRARY

HARAPRASAD SHASTRI : AN INDOLOGIST

Narendra Kumar Dash

Haraprasad Shastri was an eminent Sanskrit scholar and he was well versed with traditional and modern systems of education being educated both at Sanskrit Collegiate School and Sanskrit College at Calcutta. He was a versatile scholar and he has done considerable works in varied fields of studies like literature, history, archaeology, epigraphy, Buddhist studies, philosophy and biography. His name is popular among the academicians and for his contribution in the field of collection of Sanskrit, Bengali and Hindi manuscripts from India and Nepal. He not only collected the old rare and important manuscripts but he edited and published some of the important ancient works for the first time and catalogued them for the benefit of the future generations.

It is needles to mention that Rajendralala Mitra showed the path of modern scientific research on various aspects of Buddhist Studies in Bengal and Haraprasad, a true follower of Rajendralala Mitra, followed his path and collected many old and important manuscripts of various fields of the branches of human knowledge. He was proud of his traditional background of Sanskrit Language and Literature. When he was giving the presidential address of the all India oriental conference at Lahore in 1928 he declared that "I am a Sanskritist by heredity, training and profession and I feel an instinctive love, including Indology" This comment of the scholar indicates his love and attachment towards the Sanskrit Language. He had not only acquired deep knowledge of Sanskrit he was also equally well versed with Buddhist Literature including Pali. This suggests that Haraprasad was not a traditional Sanskrit Pandit, but he possessed wide and vast outlook and therefore he did not hesitate to learn Buddhist scriptures like other contemporary Pandits.

In his lecture entitled "Sanskrit culture in modern India", he categorically mentioned that the learning of Sanskrit has loosed its waitage due to modern system of education. He preferred to learn Sanskrit in traditional way. At the end of his lecture he has warned the modern scholars, particularly the orientalists, against the modern method of Sanskrit studies. He said "But at the end of address I think it to be my duty to give you a warning. At the present moment there is a large body of men who go as Sanskrit scholars without knowing a letter of Sanskrit. There are others again who tax the brains of poor Sastris and make big name as Oriental scholar. At the conference of orientalists held under the Presidency of Sir Harcourt Butler in 1911 a very great man told the august assembly that without two Sastris at their elbows they cannot be Oriental scholars. Such Oriental scholarship should be discouraged. The Sastris should be trained for Oriental scholarship. A historical sense should be awakened in their minds".

Once an erudite Indian remarked that "Sanskrit education closes the eyes

CENTRAL LIBRARY

and English education opens them". Haraprasad reacted promptly against the remark and in the University extension lecture of the foundation of University building of the Benaras Hindu University on 7th February 1916 he said that "A very distinguished Indian gentleman during the middle of the last century gave pithily the effect of English and Sanskrit education in the following words: Sanskrit education closes the eyes and English education opens them. As the gentleman who uttered this is revered all over India as an educationist, as a scholar, as a philanthropist and as a reformer, my object would be to examine his dictum with care, to see how far he was correct". My revered old friend would have retracted his caustic remark seeing that Sanskrit education also can open the eyes as fully as English education. Thanks to his labour in devising means for teaching Sanskrit through the medium of vernaculars it is now easier to acquire Sanskrit culture than it was in his days".

Pandit Haraprasad had great respect for the Vedas. Though he has not written many criticisms on Vedas still his depth in Vedas is known to us from two of his articles, one in Bengali (Veda O Veda Vyakhya; Bangadarshana: 1284 Bangabda, Pousa) and the second one is in English (The Rgveda in the making: Journal of the Asiatic Society, April, 1930). The Bengali writing Veda O Veda Vyakhya was nothing but a criticism on the 'Veda Prakashika' of Ramanath Saraswati and the English one is "An introduction to the various branches of the Vedas".

Haraprasad was keenly interested to learn Sanskrit Buddhist Literature. He was a regular reader of the journal of the Asiatic Society where many articles of Rajendralala Mitra and other scholars were being published. The work of Burnouf on Sanskrit Buddhist Literature which was basically written in French Language was also consulted by the young Haraprasad with great effect. He learned many new things on Mahayana Buddhism and Sanskrit Buddhist Works from this valuable work of Burnouf. The Manuscripts of some important Sanskrit Buddhist Works, eighty six in number were collected by Hodgson from Nepal which were given over to the Asiatic Society for preservation. The President of the Society, Mr. Arthur Grote, requested Rajendralala Mitra to write the synopsis of the works with the help of Harinath Vidyaratna, Ramanarayana Tarkaratna and Kamakhyanath Tarkavagisha. Due to illness Rajendralala took the help of Haraprasad to complete the project. The result of the project was published under title of "The Sanskrit Buddhist literature of Nepal" where we find short criticism on 85 works and out of those 85 works, Haraprasad had written the synopsis of at least 15 works which have been marked as H. P. S in the contents. I am giving the names of those works here for our information :

1. Avadanasataka, 2. Bhadrakalpa Avadana, 3. Bodhisattvavadana, 4. Dasabhumisvara, 5. Dvavimsa Avadana, 6. Gandavyuha, 7. Guna Karandavyuha, 8. Kapisa Avadana, 9. Kavikumara Katha, 10. Kriyasamgraha Panjika, 11. Mahavastu, 12. Ratnamala Avadana, 13. Samadhiraja,

14. Suvarna-Prabhasa and 15. Svayambhupurana. In the introduction to the work, Rajendralala accepted wholeheartedly the help of the young Haraprasad to complete the project. He has said that "I felt the want of help, and a friend of mine, Babu Haraprasad Sastri, M.A., offered me his cooperation, and translated the abstracts of 16 of the larger works. His initials have been attached to the names of those works in the table of contents. I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me, and tender him my cordial ackowledgments for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task; and he did his work to my entire satisfaction. I must add, however, that I did not deem it necessary, nor had I the opportunity, to compare all his renderings with the originals".

This remark of the great scholar Rajendralala Mitra is sufficient to suggest that Haraprasad was an erudite scholar on Sanskrit Languge of his times. He is responsible for higher research based on our valuable old and important Manuscripts in the field of oriental studies in late 19th and early 20th century. Recognizing his scholarship Pandit Ganganath Jha has rightly opined that - "he of all people has been the real father of oriental research in North India."

After Rajendralala Mitra, Haraprasad took the responsibility of collection of the Sanskrit and other Manuscripts on behalf of the India Government. He not only collected the Manuscripts but tried to write the synopsis of the subject of the rare Manuscripts which have been published in four volumes under the title "Notices of Sanskrit Manuscripts". He also visited Nepal for collection and inspection of the manuscripts preserved there. He published the list of the manuscripts preserved in Nepal Darwar with descriptions. At Kashi, Haraprasad was informed about 7000 rare and valuable Manuscripts on various subjects. The king of Nepal, Sri Chandra Samshere purchased those Manuscripts and presented those to the Bodleian library at Oxford. It is known from a letter of Lord Curzon written to Haraprasad that he played an invaluable part in arranging for the purchase, the cataloguing and the despatch to England of the wonderful collection of Manuscripts. He also prepared a descriptive catalogue of the Mss. preserved in the Bishop's College. Thus Haraprasad was responsible for collection and preparation of catalogues of rare Manuscripts in modern India. His vast experience on the subject is reflected in his introduction to the "Descriptive catalogue of Sanskrit Manuscripts" published by the Asiatic Society of Bengal.

He not only prepared the catalogues of the Mss. but he edited some of them with great care. Some of his works were published from the Asiatic Society and Bangiya Sahitya Pasisad at Calcutta. The 'Ramacarita' and the 'Bauddha Gān O Doha' are two important works edited by Haraprasad Shastri. While the first one gives as many as new and valuable informations related to the history of Bengal, the second one is a unique work of eastern Indian languages including Oriya, Bengali and Maithili.

CENTRAL LIBRARY

Bibliography :

1) Haraprasad Shastri (in Bengali). Amulyachandra sen, Sarasvata Library; 1971, Calcutta.

2) Haraprasad Jivani; Ganapati Sarkar, Bangiya Sahitya Parisad, 1443 Bangabda.

3) Sahitya Sadhaka Caritamala; Book No. 73; Brajendranath Bandyopadhyaya, 1949, Calcutta.

4) Our Ancestry; Benaytosh Bhattacharya, Baroda, 1943.

5) Indian Historical Quarterly, Vol IX, No.1, March 1933, Haraprasad memorial No. (in 4 vols).

6) Haraprasad Shastri Rachana Samgraha (in 4 vols); Ed. Satyajit Choudhury & Devprasad Bhattacharya, 1981, Calautta.

7) Haraprasad Shastri Smarakagrantha (Bengali); Ed. S. Choudhury, D. P. Bhattacharya & N. Sengupta; 1978, Calcutta.

CENTRAL LIBRARY

HARAPRASAD SASTRI AND SANSKRIT LITERATURE

Bijoya Goswami

Prof. Suniti Kumar Chattopadhyay had said once that the lifetime of Haraprasad Sastri witnessed a gradual evolution rather than a violent revolution in the total thought process of the Bengalis (see Introduction to Haraprasad Rachanavali, ed. S.K. Chattopadhyay and A.K. Kanjilal, Eastern Trading Co., 1960). Immediately prior to this period (1853-1931), the British had consolidated their power in India, and even from the early years of the 19th Century, learning of English and western education has made their way in India, putting into the shade traditional Sanskrit and medieval Persian as languages of governance. This introduction to modern western thoughts brought about a total change in social outlook. In the early days, there was a desire among the intelligentsia to master a language and a system of education that was seen to be so beneficial to the British rulers, politically, culturally and socially. As a result, the learning of English was sought to be facilitated, so that more and more of the Indian people could usurp the language and education of the British, as a mode of empowerment. The prestigious Hindu College was founded in 1817 as a direct outcome of this thought, by such bright stars of the society as Raja Rammohan Roy, Raja Radhakanto Deb, Baidyanath Mukherji and others. In this endeavour, they received the active help of David Hare, who had already made his name as a benvolent educationist. Shortly afterwards, the School Society's School (now Hare School) was established, although it was generally referred to as "Hare Saheber School". The Sanskrit College was established in 1824. Side by side with this new wave in education came legal reform as the Indian Penal Code came into being. On the social field, Derozio and others, impressed with the progressive ideas abroad, inspired young students to rebel against archaic and obscurantist social institutions. There was a tremendous effect of this in the democratisation of education, where everyone was eligible to have a seat in an educational institution. Women's right to education was recognised, and the pernicious custom of the burning of widows was prohibited by law, while the remarriage of widows received legal sanction. In this period, society witnessed the rise of a new class of intelligentsia, who were as well versed in Sanskrit and the ancient culture as in the western languages and cultures. Among them, there were stalwarts like Raja Rammohan Roy, Iswarchandra Vidyasagar, Michael Madhusudan Dutt, Kaliprasanna Sinha and others, who brought about a renaissance in the cultural as well as the social field. This period witnessed the birth of the Bengali language as a new entity, culminating in the opulent prose of Bankimchandra Chatterji. In this arena of social and political renaissance Haraprasad Sastri was born.

Haraprasad (originally named Saratnath) was born in a family of traditional puṇḍits, but mastered both English and Sanskrit at a very early

CENTRAL LIBRARY

age. Exceptionally brilliant, he had received tutelage from Vidyasagar himself, and was a younger contemporary and close acquaintance of Bankim. He saw the blossoming of the young Rabindranath before his eyes. Haraprasad had studied for his F.A. from Sanskrit College, but carried on his traditional Sanskrit studies simultaneously. In this way, he imbibed a traditional language as well as a modern outlook, and combined both in his lifetime. His lifelong ambition had been to write a comprehensive history of Sanskrit literature. While he could not achieve this, he spent his entire life studying Sanskrit texts and trying to decipher old manuscripts and inscriptions.

Although Haraprasad is chiefly remembered for the catalogue of mss. he compiled for the Asiatic Society, one must remember in this respect his second greatest achievement in bringing to the common reader the gems of Sanskrit literature. For centuries, Sanskrit scholars have maintained an elitist stance as regards this magnificent language, keeping away the common people from it, so that it has come to be regarded as something terrifying, and out of the reach of ordinary readers. Most Sanskrit scholars who wrote about Sanskrit literature, did so in classic Sanskritised style. Not so, Haraprasad. He deliberately couched his essays in simple and lucid language, the language of everyday usage, the language in which we converse every day. Our aim in this brief dissertation is to deal with his accounts of Sanskrit literature only - as his achievements are too vast to compress within this short span.

Haraprasad wrote several long and short essays on literary subjects, and his brilliant analyses are relevant even today. His favourite poet was undisputedly Kālidāsa, but he also cast light on several other literary gems. He has attempted two reviews of the *Meghadūta*, one while reviewing Rajkrishna Mookherjee's English translation of this poem, and the other as an independent essay. In this process, he has gone over the entire poem, verse by verse, bringing out fully the beauty of the poet's ideas and descriptions. He also deals with much that is not in the poem, but suggested by the wonderful poetic insight. Why is the unnamed Yakṣa exiled to Rāmagiri? It is because this is the spot where Rāma and Sītā enjoyed the happiest days of their exile, in close togetherness, in total bliss. The Yakṣa is doomed to spend his own period of exile here, where he sees the shades of the happy couple constantly, everywhere. Kubera does not send him to a large locality, lest he start trading with merchants; he does not despatch him to places of pilgrimage such as Kāśī or Kedāranātha lest he engage his mind in religion. Rāmagiri is the right place to send the exile who spent all his time with his wife—for he would be reminded of the close union between the divine couple at every stage, on seeing the trees they had planted, the waters where they had bathed. All this prompted that naughty old man, Kubera, to smile mischievously to himself (HR. Vol. II, P 511). Regarding the *genre* of poetry *Meghadūta* belongs to, he has a great deal to say: the old Ālaṁkārikas call the poem a *Khṇdakāvya* and the modern western critics call it a lyric. Haraprasad is willing to call it neither. *Khaṇḍa* literally means 'a piece'

- this would imply that the poem is incomplete. But this is not the right way to designate the *Meghadūta*. It is not incomplete in any way, although it is a short poem. Haraprasad prefers the term *Khaṇḍa* to be used in the sense of extra-sweet, as it has been used, in the names *Khaṇḍanakhaṇḍa-khādya* by Śriharṣa and *Khaṇḍakhādya* by Brahmagupta (Ibid P508). It is not a lyric either, for it is not supposed to be sung - although he admits the *Uttaramegha* which contains the romanticism essential to lyric poetry, may be called a lyric, but certainly not *Pūrvamegha*. According to him, the *Meghadūta* is a *Mahā -mahā-Kāvya*-of which genre, no other poem exists; it is a novel creation, nothing like any established style of poetry. For here the poet has created something unique—a land where the laws of the real world do not apply, where the people are the creations of fancy, their society, their rules, their laws - all are new, nothing at all like the people in their mundane existences know about (see *Meghadūta*, HR. Vol. II, pp 506-546). One may or may not agree wholly with his analysis, but one cannot help but wonder at the insight and appreciation which appear innate in him. All this comes forth in simple, straightforward, spoken language of the common people. This is what is most remarkable about Haraprasad Sastri's expositions.

Haraprasad wrote a number of essays to bring out the inner truth of the *Abhijñānaśakuntalam*, considered the supreme outcome of Kālidāsa's genius. In essays such as *'Komale kaṭhor*, *'Kaṇver komal mūrti'*, *'Kaṇver kaṭhor mūrti'*, *'Śakuntalāy nāṭyakalā'*, *'Śakuntalarmā'*, *'Durvāsār śāp'*, *'Śakuntalāy hinduani'* etc., he stresses on the poet's multi-faceted genius. His essay entitled *'Durvāsār śāp'* lays emphasis on Kāldāsa's novelty of thought in adding an innovation in the form of the curse of Durvāsā. This curse has brought about a sudden separation between a couple, who were united as the result of an impulse. The curse is really a punishment for transgression of duty. Śakuntalā is punished because she did not do her duty to a guest, Duṣyanta because he lied to the Vidūṣaka that he had no interest in Śakuntalā (*Durvāsār śāp*, ibid vol. I). Both these are punishable offences. Their separation brings out all the is good and noble in them—this is the purpose of interpolating the curse. This may appear an over-simplification but it set a trend—one that Rabindranath himseif followed in his essays on ancient India —that the act of Duṣyanta in the *Mahābhārata* in repudiating his wife was a crime, and Kālidāsa needed the cover of a curse in order to ennoble his character, and that one cannot, when living in society, hold oneself aloof from it, and must accept responsibility for one's own actions. Haraprasad also etched out with great sensitivity the character of Kaṇva - on one hand as a kind-hearted father to Śakuntalā, and on the other, a strict disciplinarian. He likewise pointed out the innate difference in the characters of Śakuntalā's two friends - Anasūyā grave and affectionate, Priyaṃvadā playful and mischievous - that influenced Rabindranath's portrayal of these two maidens in his own essay *'Kāvyer upekṣitā'*.

Haraprasad also displayed rare insight in some characters really neglected

by commentators - Menakā in *Abhijñānaśakuntalam*, although nowhere in the play does she make an appearance (*Śakuntalār mā*, Ibid Vol. I). Irāvatī, the jealous queen of King Agnimitra in *Mālavikāgnimitra* (*Irāvatī*, Ibid), and the other neglected queens of the various kings, e.g. Dhāriṇī in the same play, Auśīnarī in *Vikramorvaśīya* and Vasumatī and Haṁsapadikā in *Abhijñānaśakuntalam* (*Ek ek rājār tin tin rāṇi* - Ibid). One must remember that like Menakā, Vasumatī and Haṁsapadikā are never seen onstage, though Haṁsapadikā is heard singing. From the few touches of Kālidāsa, Haraprasad has found suggestions aplenty to made these characters three-dimensional and eminently believable. This requires the eyes of a true *sahṛdaya* which Haraprasad undoubtedly was.

In many ways Haraprasad offered insight into the method of looking at literary works. He was pained at the cavalier tretment meted out to Kālidāsa's *Raghuvaṁśa*. In his discussion of this poem in his two essays, *Raghuvaṁśa* and *Raghuvaṁśer gānthuni* (HR. Vol. I), he deals with the comments of earlier pundits that *Raghuvaṁśa* is not a poem, and nothing that should be read (*raghurapi kāvyaṁ, tadapi ca pāṭhyam*), and those of his contemporaries like Bankimchandra who claimed that this poem was one of the earliest of Kālidāsa's works, and is a mere exercise (*Buḍā bayaser kathā, Vaṅgadarśan, Vaiśākha 1284*), as well as Balendranath who described the poem as a series of pictures - "a number of pretty pictures in frames"(*Kālidāser citrākarī pratibhā, Sādhanā Bhādra - Āśvina*, 1299). Haraprasad dismisses all these claims, and brings out the unity of plot in this artificial epic. He says that the *Raghuvaṁśa* was obviously the fruit of a mature genius and intellect, written by Kālidāsa in the fullness of his age. According to the rules of ancient *alaṁkāraśātra, a mahākāvya* should have a hero of *udātta* character (*caturodāttanāyakam—Kāvyadarśa*, I/15). This 'hero' (*nāyaka*) may mean a hero and a heroine, or a number or series of heroes. Thus, technically, this poem satisfies the criterion of a *mahākāvya*. But does it truly conform to the character of a *mahākāvya*? Haraprasad asserts that it does. In a true *mahākāvya*, there must be a unity of action to hold the entire work together. He finds this unity in the excellence of the qualities of all the kings in the Ikṣvāku dynasty. From Dilīpa, to Raghu, to Aja, to Daśaratha, this excellence is to be observed. In Rāma, it reaches its supreme culmination, then begins its downward path, through Kuśa, Atithi, until it reaches its nadir in Agnivarṇa - the great dynasty disintegrates, and after Agnivarṇa's dissipated life and untimely death, the ministers strive to run a depleted kingdom with the pregnant queen of the deceased Agnivarṇa at its helm. This is an extremely modern interpretation of this work, which is relevant even today.

For a traditional pundit Haraprasad had an amazingly modern and unbiased vision. One of the major literary issues he dealt with is the issue of obscenity - an issue which is very much alive even today. As we are aware, the question of obscenity in art and literature was and is a very ticklish one.

CENTRAL LIBRARY

No two persons can hold the same view on what is obscene and what is not. Haraprasad tackled this question head on in his *'Parvatīr praṇay'* (HR, Vol. I). He says, it is necessary to deal first with the allegation that Kālidāsa is obscene. He raises here three questions: is it true that Kālidāsa is obscence? Is it true that reading his works raises evil ideas in people, and abnormal sensual cravings? It is true that he has merely indulged in bawdy humour on unsuitable occasions? (Ibid p. 520). Haraprasad answers 'no' to all. He says Kālidāsa is a great poet; there is nothing on earth he has not described, no beautiful object that has missed his eye. The union between man and woman is the most beautiful of all these beautiful objects, so Kālidāsa has described this as well. He has included sexual acts where that has been necessary for literary purposes, but never out of place. He has never indulged in the kind of exhibitionism that is the characteristic of other poetry, such as the *Naiṣadhacarita*. Wherever Kālidāsa has has had to depict sexual acts (*Kāmakalā*), he has done so with such balance and restraint that it can never become offensive or embarrassing to the reader (Ibid P520). This is especially evident in the love of Pārvatī for Śiva, as depicted in the *Kumārasambhava*. In this poem, Haraprasad says, love is entirely spiritual. This is why Kāma, the god of love, was burnt to ashes at the very beginnig of the poem. This love does not depend on the senses, but on an all-consuming desire to surrender one's all. This selfless love is a great penance (*tapasyā*). While one may not agree with all of Haraprasad's assertions, one cannot but admire the novel viewpoint, which is wonderful in a man of his time and background.

Our present dissertation deals wholly with Haraprasad Saśtri in his relation to Sanskrit literature alone, so there is on scope to go into the other aspects of his works. But even in this respect, mention must be made of his voluminous work *'Bhāratmahilā'*, where he goes into the condition and position of women in ancient India, so far as may be gathered from texts beginning from the Dharmaśāstras down to literary works. Here too, he has attempted a sensitive analysis of literature. Here, as well as in his other works, he displays a sympathetic attitude towards women in general, and has very positive views on women's education, their choice of their own partners, prevention of widow burning, even sanctioning widow- remarriage - all with the help of ancient authorities.

Among all these scholarly works, Haraprasad also tried his hand at writing fiction. His two so-called historical novels, *'Vālmīkir jay'* and *'Kāñcanamālā'*, are cases in point. The former deals with the ancient world, depending chiefly on the epics for its material, while the subject of the latter is derived from the *Divyāvadāna* and the *Bodhisattvāvadānakalpalatā*. While neither is a really excellent literary work, what is commendable in them is the author's attempt to bring ancient India close to the reader.

In this short essay, it is not possible to make a proper assessment of this multifaceted personality. From a different focus, his contributions in the field of Indian history are immense. His work on epigraphy and

manuscriptology needs an entire book to itself. We are not dealing with these points here. It would however, be an incomplete survey if we did not mention his contribution to the Indian stage. Suniti Kumar says that he brought about a silent revolution in India, in the field of dramatic acting. He tried on many occasions to imitate the clothes and jewellery of the characters in plays regarding ancient India, for the sake of authenticity. He did this with the help of old sculptures etc., a trend that was followed on the Bengali stage, and later, all over India. Haraprasad had even presented several boxes of costumes to the University Institute after the staging of Kālidāsa's *Mālavikagnimitra*. This was another step in his numerous attempts to popularise ancient Indian culture.

It is unfortunate that a scholar of the calibre of Haraprasad Sastri has been pushed into oblivion for so many years. Apart from his zeal in deciphering history, he was a never-drying fountain of knowledge, and this knowledge came easily to him because of his innate sensitivity. One may even say that he is one of the leading critics of India, of all time. Apart from his power of appreciation, he had the rare capacity for communication - of reaching out, of giving out what he had grasped, of making it easy to conceptualise. Rabindranath said of Haraprasad Sastri, that it is possible to acquire knowledge through effort, but it is the function of the intellect to make it appear simple to oneself and others (Ibid Introduction). This is why we must never forget Haraprasad Sastri - the scholar, the writer, the historian, and above all, the *sahṛdaya*.

CENTRAL LIBRARY

MM HARAPRASĀDA ŚĀSTRĪ AND SANSKRITIC LEARNING

Karunasindhu Das

The name of Mahāmahopādhyāya Haraprasāda Śāstrī occurs very prominently in any reference to manuscripts for oriental learning. Manuscriptology as a discipline of serious academic pursuit entails a pool of theoretical formulations arrived at, attested to and developed in course of continuous practical exercises at both admimistrative and academic levels relating to manuscripts. It involves field survey and report thereof, collection of mss from private individuals and institutional sources, management of mss including arrangement of preservation and conservation facilities at appropriate places, handlisting and identification of individual mss, cataloguing in both tabular and descriptive forms, studies on scripts adopted, their history and evolution, locating different copies of a text for comparison and ascertaining their genealogical relationship, transcription and collation of the copies of mss with an attempt at arriving at the original reading in case of variations with use of critical apparatus, lower and higher criticism and presenting a critical edition in print or so in fine for the reading public. A shortcut method or a makeshift arrangement yields no tangible result here for any lacunae at any stage of handling mss may prove disastrous in the long run for the world of scholarship. None but a dedicated soul of high academic standing and zealous perseverance, therefore, can attain the height of a successful manuscriptologist in the real sense of the term. History of oriental research for the last two centuries or so has seen stalwarts in this field who could harvest quite substantially by decoding ancient wisdom from manuscript sources. Haraprasāda Śāstrī's name reigns supreme here in this that he experienced every step to approaching and handling of manuscripts right from field survey to critical edition and publication of the text in print.

No doubt, MM Śāstrī's association with the Asiatic Society at Kolkata as a member in 1885 marked the beginning of his chequered career of Indological research. But even before that he must have developed keen interest in this field of study taking cue from Pt Iswar Chandra Vidyasagar's painstaking enterprises in bringing out critical edition of such Sanskrit texts as *Raghuvaṁśa* (1853), *Kirātārjunīya* (1853), *Śiśupālavadha* (1857), *Kumārasambhava* (1861), *Kādambarī* (1862), *Meghadūta* (1869), *Uttaracarita* (1870) *Abhijñānaśakuntala* (1871) *Harṣacarita* (1883) and *Śarvadarśanasaṁgraha* (1853-58). The young Śāstrī made his debut as a junior associate of Rajendra Lala Mitra of The Asiatic Society who had been engrossed with cataloguing of Buddhist mss collected from Nepal. Ten volumes of the said work by Sri Mitra were published during 1870-80. The Society entrusted Haraprasāda with the task of collecting mss in 1891 and elected him next year the Joint Philological Secretary with the charge of

CENTRAL LIBRARY

editing Sanskrit texts under Bibliotheca Indica Series. He visited Nepal for four times in 1897-99, 1907 and 1921 in search of mss. He also toured different parts of India with the same mission. All this resulted in a good harvest of collection of no less than eight thousand mss for the Society. Śāstrīji accordingly gave as many as six reports on his tours viz.

(1) Report on the Search of Sanskrit Manuscripts for 1895-1900 A.D.).

(2) Report on the Search of Sankrit Manuscripts for 1901-1902 to 1905-06 (1905 A.D.),

(3) Report on the Search of Manuscripts for 1906-07 to 1910-11 (1911 A.D.),

(4) Preliminary Report on the operation in search of Mss of Bardic Chronicles (1913 A.D.),

(5) Report on a tour in Western India in Search of Mss of Bardic Chronicles,

(6) Notes on Palm Leaf Manuscripts in the library of H. E. the Maharaja of Nepal (1897 A.D.) and

(7) Catalogue of Palm Leaf and selected Paper Mss belonging to the Darbar Library of Nepal (2 Volumes) - (1905-1915).

As for cataloguing of Mss, Haraprasāda took over the overall charge thereof after the sad demise of Rajendra Lala and completed Part II of Volume X and added an index volume to this series followed by four subsequent volumes. Besides, six volumes of Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss in the Government collections came out in print during his lifetime. Eight more volumes came out subsequent to his death in 1931. The most redeeming feature of the volumes of Descriptive catalogue prepared by him is this that they provided us with a model catalogue which had significant bearing on structuring the format of cataloguing at a later age. Śāstrīji enriched the volumes of catalogue by authoring an elaborate preface to each volume. His preface to volume VI which deals with grammar & lexicon and rhetorics is but a thought-provoking dissertation of 339 printed pages on history and development of Sanskrit grammar & lexicon and rhetorics in several schools. Description of individual mss covers all necessary information, technical and academic.

Extensive tour and search of mss led Śāstrīji to discovering some very important Sanskrit texts which helped substantially in rebuilding ancient history of our land and people. An anthology of verses which he found and named *Kavīndra-vacana-samuccaya*, for example, was edited by F. W. Thomas (1912) and published under Bibliotheca Indica Series (No. 208). The complete text, when recovered subsequtly and edited by Professor Gokhale and Dr. D. D. Koshambi in 1957 under the caption viz. *Subhāṣitaratnakoṣa*, revealed that the same was compiled by one Vidyākara or Vidyādhara, a resident of Jagaddal Mahavihar in North Bengal in 10th-11th century A.D.

Buddhasvāmin's *Bṛhatkathāślokasaṁgraha* also saw the light of the day when it was located by Śāstrīji and edited by Sri Renou in French. His other discoveries include *Kālacakrayāna*, along with a commentary thereon, *Kṣaṇabhaṅgasiddhi, Apohasiddhi, Anvayavajra, Vajrāvalī, Hevajraratna, Kuṭṭanīmata* etc. all in old Bengali script testifying to the millennium-old history of the script.

Haraprasāda edited many of the texts he procured in ms form, under Bibliotheca Indica Series of the Asiatic Society or otherwise. They include *Saundarananda* by Aśvaghoṣa (B.I. 192), *Rāmacarita* by Sandhyākaranandin, *Vallālacarita* by Ānandabhaṭṭa (B. I. 164), *Catuḥśatikā* by Āryadeva, *Bṛhaddharmapurāṇa, Bṛhatsvayambhūpurāṇa, Śaunakaśāstra* etc. Under the caption viz. Six Buddhist Nyāya Tracts (B. I. 185) *Apohasiddhi, Kṣaṇabhaṅgasiddhi and Kṣaṇabhaṅga-siddhi Vyatirekātmikā by* Ratnakīrti, *Avayavinirākaraṇa and Sāmānya-dūṣaṇa-dik- prasāritā* by Paṇḍita Asoka and *Antarvyāptisamarthana* by Ratnākaraśānti were edited by him. As editor of Ratnakīrti's works he went to the extent of sending photographs of ms to Dr. Poussin of Ghent, Mr Thomas of the India Office and Professor Th. de Scherbatski-Karpovka of St Petersrburg 'who would help me from Tibetan and Chinese translations'. But it was found that no Tibetan or Chinese translation existed. Even then he was thankful to them in general and Dr. Poussin in particular 'for his invaluable advice and suggestions made' The Buddhist authors of the ninth and the tenth century A.D. fascinated him. He also edited Vidyāpati's *Kīrtilatā* and located Jyotirīśvara Ṭhākur's *Varṇaratnākara*, both in Maithili. Besides, *Kāśīdāsī Mahābhārat, (ādiparvan), Dharmamaṅgala, Bauddha Gān o Dohā*, Rāmāi Pandit's *Śūnyapurāṇa* are some other texts edited by him.

Śāstrīji was a prolific writer as well. He contributed a number of articles right from the one entitled *Bhāratamahilā* (1282 B.S.) to 'Bangadarsan' edited by Bankimchandra Chattopadhyay. Bankim and Ramdas Sen had helped him shaping his mindset as a devoted researcher of history and culture of India before he became an associate of R.L. Mitra at the Asiatic Society. He contributed no less than fifty articles to Society's Journal on various aspects of oriental learning. His articles in Bengali published in 'Nārāyaṇa' edited by Chittaranjan Das and so on took up such topics as Kālidāsa, Jayadeva, Caṇḍīdāsa, Vidyāpati, Bengali Script, Dhoyī's *Pavanadūta*, Sanskrit Schloars viz. Bāṇeśvara Vidyālaṅkāra, Kāśīnātha Vidyānivāsa, Ratnākaraśānti, Bṛhaspati Rāyamukuṭa, Bharatamllika, Rāmamāṇikya Vidyālaṅkāra etc. That all this paved the way to understanding our intellectual culture in a better way need not be overemphasied. It is with the same in view that he dealt with the role of Sanskrit in modern India in his presidential address at the Lahore session of All India Oriental Conference in 1928 and authored two books viz. The Educative Influence of Sanskrit (1916), Bird's eye View of Sanskrit Literature (1917), and an article viz. Lokāyata, in University Bulletin No. 1, Dacca (1925).

His organisational and addministrative capabilities led him to stewarding Sanskrit College, Kolkata, Bangiya Sahitya Parisad and the Asiatic Society with definite marks of remarkable success. It is he who introduced post-graduate studies in Sanskrit at the Sanskrit College in 1896. He was a widely respected personality whom Bankimchandra, the nineteenth century stalwart referred to as a reliable friend and academic compatriot in one of his articles on Oriental lore. The obituary notes at his sad demise in 1931 in Vol. XIV of the Sanskrit Sahitya Parisad Patrika, Kolkata by Pañcānana Tarkaratna etc. speak a lot of the nation's appreciation of his outstanding contributions to oriental learning and research. In any further academic ventures towards culture studies in the proper sense of the term, Haraprasāda Śāstrī's name shall stand as the beacon to lead to the path of success. Ganganath Jha once called him 'the real father of Oriental Research in Northern India'. The entire world of oriental scholarship now henefits from his guiding strides.

Reference :

1. Haraprasāda Śāstrī Racanā Saṁgraha, Tṛtīya Khaṇḍa, West Bengal State Book Board, First Edition 1984, Reprint 2001.
2. Baṁkim Racanāsaṁgraha, Prabandhakhaṇḍa, Parts I-II, Sākṣaratā Prakāśan, 1973.
3. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Collections of The Asiatic Society of Bengal, Volumes I- VI.
4. Svadeśīya Bhārat-Vidyā Sādhak- Gauranga Gopal Sengupta, Sāhitya Saṁsad, First Edition, 1994.

নৈহাটীর মূল বাড়িতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিফলক

CENTRAL LIBRARY

রথীন মিত্র অঙ্কিত শাস্ত্রীবাড়ি

Haraprasad Shastri, famous Sanskrit scholar was called "the father of Oriental research in northern India" by Mahamahopadhyay Ganganath Jha. Haraprasad lost his father at an early age and completed his education against great odds. In spite of adverse circumstances he was the only student to secure a first class in MA from the Sanskrit College in 1877. With this distinction he also received the honorary title of 'Shastri'. Starting as a teacher at Hare School in his distinguished career he served at various times at the Lucknow Canning College. Presidency College, Calcutta, Sanskrit College and the Dhaka University.

A pillar of the Asiatic Society, Haraprasad took up in earnest the work of collection, compilation and preservation of old manuscripts. He travelled all over north India and to Nepal in search of ancient Sanskrit 'puthis'. One of his most famous discoveries were the Charyabada manuscripts which he later edited and published with a lengthy preface. He wrote several treatises on ancient Indian society, culture and religion based on the source material he had collected.

Haraprasad has been called a pioneer in the field of research into ancient literature and culture and those involved in the reconstruction of the ancient Indian history shall remain indebted to him. The sketch above is his ancestral home at Naihati.

PRESENTED BY THE TELEGRAPH, COLOUR MAGAZINE, 15 JUNE 1986.

CENTRAL LIBRARY

ABOUT THE CONTRIBUTORS

1. Late. Prof. Dipak Ghosh	:	Professor, Department of Sanskrit, University of Calcutta, Kolkata.
2. Prof. Sukomal Choudhuri	:	Ex-Principal, Govt. Sanskrit College, Kolkata.
3. Prof. Bela Bhattacharya	:	University Professor of Pali, Department of Pali, University of Calcutta, Kolkata.
4. Dr. Asha Das	:	Ex-Reader, and Head, Department of Pali, University of Calcutta, Kolkata.
5. Prof. Binayendra Nath Choudhuri	:	Prof. B. M. Barua, Research Professor in Pali and Buddhism, The Asiatic Society, Kolkata.
6. Dr. Satyajit Choudhury	:	Director, Bankim Bhavan Gaveshana Kendra, Naihati; Editor, Haraprasad Shastri Rachana Sangraha.
7. Dr. Jinabodhi Bhikkhu	:	Associate Professor, Department of Oriental Language, Chittagong University, Chittagong, Bangladesh.
8. Dr. Shipra Rakshit Dastidar	:	Associate Professor, Department of Bengali, Chittagong University, Chittagong, Bangladesh.
9. Prof. Sumita Chakraborty	:	Professor, Department of Bengali, Ex-Dean, Faculty of Arts, Burdwan University, Burdwan.
10. Dr. Kabita Chanda	:	Reader, Department of Bengali, Presidency College, Kolkata.
11. Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya	:	Reader, Department of English, B.B. College, Asansol.
12. Prof. Satyabati Giri	:	Professor, Department of Bengali, Jadavpur University, Jadavpur, Kolkata.
13. Prof. Nirmal Das	:	Ex-Professor, Department of Bengali, Rabindra Bharati University, Kolkata.

14. Prof. Manirujjaman : Professor, Department of Bengali, Chittagong University, Chittagong, Bangladesh.

15. Dr. Manikuntala Halder (De) : Reader, Department of Pali, University of Calcutta, Kolkata.

16. Prof. Sitanath Acharya Shastri : Professor, Department of Sanskrit, University of Calcutta, Kolkata.

17. Prof. Biswanath Banerjee : President, The Asiatic Society, Kolkata. Ex-Professor, Department of Sanskrit, Pali and Prakrit Visva-Bharati, Santiniketan, Bolpur, Birbhum.

18. Prof. Suniti Kumar Pathak : Ex-Professor, Alexander Csoma De Körös Asiatic Society, Kolkata.

19. Prof. Dipak Kumar Barua : Ex-University Professor and Head of the Department of Pali, University of Calcutta, Ex-Director, Nava-Nalanda Mahavihara, Bihar.

20. Prof. Satyaranjan Banerjee : Ex-Professor, Department of Linguistics, University of Calcutta, Kolkata.

21. Prof. Devaprasad Guha : Ex-Professor, Department of Pali, Rangoon University, Myanmar.

22. Prof. Bhabatosh Datta : Ex-Rabindra Adhyapak, Visva-Bharati, Santiniketan, Bolpur, Birbhum.

23. Late Dr. Narendra Kumar Das : Ex-Reader and Head, Department of Indo-Tibetan Studies, Visva-Bharati, Santiniketan, Bolpur, Birbhum.

24. Prof. Vijaya Goswami : Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University, Kolkata.

25. Prof. Karunasindhu Das : Professor and Ex-Dean, Department of Sanskrit, Rabindra Bharati University, Kolkata.